অমর নাথের
অমর কাহিনী

কানাইলাল চক্রবর্তী

মালা পাবলিকেশনস্
৫১, কালীনাথ মুন্সী লেন, কলিকাতা-৩৬

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী বনমালা বর্ধন
৫১, কালীনাথ মুন্সী লেন,
কলিকাতা-৩৬

প্রচ্ছদ : শ্রীস্বপন রায়চৌধুরী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
শ্রীমতী শিখা কর

ব্লক : সন্তোষী প্রসেস
৯, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা [illegible]

প্রাপ্তিস্থান : রূপম
৪, নিমাই বোস লেন, কলিকাতা [illegible]

মুদ্রাকর :
জি. এণ্ড পি. প্রিণ্টার
শ্রীমতীদয়ারাণী পাল
৩৭, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পরমারাধ্য জনক-জননী

স্মরণে—

শুরু করিব বলিলেই শুরু করা যায় না। মেয়ের বিয়েই, সন্তানের মুখে ভাতই বলুন, নাটক, যাত্রা, যাহাই বলুন। শুরুর আগে থাকে প্রস্তুতি, আবার শেষের পরও যেমন থাকে রেশ।

প্রথমে যদিও চিন্তায় ছিল অমরনাথ ভ্রমণের উপর যদি আদৌ লিখি তবে লেখার শুরু করিব পহেলগাঁও হইতে যাত্রার বিবরণ দিয়া, আর শেষও করিব পহেলগাঁও পৌছা পর্য্যন্ত, অনেকটা পর্যটন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভাষায় 'পহেলগাঁও টু পহেলগাঁও'।

এই চিন্তার একমাত্র কারণ কোন কোন ভ্রমণ কাহিনীতে ভ্রমণ বিষয়ক বিবরণ হইতে অন্য অনর্থক বিষয়সমূহ, যথা ভ্রমণ শুরুর আগে মাসিমা কি বলিয়াছিলেন বা পটলা কি আব্দার করিয়াছিল, কিংবা কি করিয়া কত নিষ্ঠার সহিত বাসার নিকটে রিক্সা আরোহণ করিয়া রাস্তার পার্শ্ববর্তী দৃশ্যসমূহ অবলোকন করিতে করিতে রেল ষ্টেশনে পৌছিলাম এবং ট্রেন আসার পূর্ব পর্য্যন্ত ষ্টেশনের বর্ণনা বিভিন্ন যাত্রীর ঠিকুজী-কুষ্ঠির আলোচনা, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, যাহারা ষ্টেশনে বিদায় জানাইতে আসিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের বর্ণনা ও মানসিক অবস্থা বিশ্লেষন বলিতে বুঝিতে হইবে, প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের বিদায় জানাইতে আসিয়া ষ্টেশনের পরিবেশে, প্রথমে আনন্দিত, তারপর বিদায় জানানোর কারণে কর্তব্য পালন জনিত সন্তুষ্টি ও বিদায়ক্ষণে মুখে বিষাদের ছায়া। এই সমস্ত বর্ণনায় সাধারণ পাঠকের মনে প্রতিক্রিয়া হয় আমি জানি। পাঠক হিসাবে আমি একজন সাধারণ পাঠক, ভ্রমণ কাহিনীর নামে এই সমস্ত প্যানপেনানি অসহ্য লাগে। তথাকথিত ভ্রমণ কাহিনীগুলিতে মূল স্থানের বর্ণনার পূর্বেও থাকে ট্রেনের বিস্তারিত বর্ণনা। এক কথায় বিরক্তিকর, তাই আমার ইচ্ছা ছিল ঐ 'পহেলগাঁও টু পহেলগাঁও। কিন্তু 'শুরুর আগে প্রস্তুতি' এই আপ্তবাক্যের মর্যাদা রাখিতে এবং ভ্রমণ কাহিনীর নামে সাহিত্যের প্যানপেনানি স্মরণ রাখিয়া শ্যাম ও কুল দুইদিক বজায় রাখিয়া, ভ্রমণ বিশেষতঃ তীর্থ ভ্রমণে বাহির হওয়া কতখানি পুরুষকার আর কতখানিই বা দৈব নির্ভর, এই ধারণা দেওয়ার জন্যও বটে শুরুর আগে প্রস্তুতির কিছুটা দেওয়া দরকার। আবার শেষ এর পর অর্থাৎ অমরনাথ হইয়া পহেলগাঁও ফেরার পরও কিছু বক্তব্য থাকিবে।

১৯৮০ সালের ৮ই আগষ্ট অমরনাথের উদ্দেশ্যে আগরতলা হইতে বিমানে

[illegible] প্রকাশনা হয় এবং গোছে, [illegible] বিকাল পর্যন্ত এমন কোন চিন্তা [illegible] মনে উদিত হয় নাই। [illegible] ত্রিপুরা। তখন আগরতলায় রাত্রিকালীন সান্ধ্য-আইনজারী রহিয়াছে।

তখন প্রত্যহ বিকালে বড়দের বিরক্তি উৎপাদন ও ছোটদের উৎসাহিত করিতে করিতে পুলিশের গাড়ী হইতে মাইকে ঘোষণাটি দেওয়া হইত, ছোটরা পুলিশের আগে আগে বলিত, "একটি বিশেষ ঘোষণা, একটি বিশেষ ঘোষণা। জনসাধারণের অবাধ চলাচলে জনজীবনের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় এবং জীবন ও সম্পত্তিহানীর সম্ভাবনা থাকায় পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ভারতীয় ফৌজদারী কার্য বিধির ১৪৪ ধারাবলে কয়েকটি অঞ্চলে আজ রাত ১ ঘটিকা হইতে আগামী কাল সকাল ৬ ঘটিকা পর্যন্ত কার্ফু জারী করেছেন। এসব অঞ্চলগুলি হল, সমগ্র আগরতলা পৌর এলাকা, বড়দোয়ালী, ও. এন. জি. সি. এবং জুটমিল কমপ্লেক্স এলাকাসহ বাধারঘাট, অরুন্ধতীনগর, অভয়নগর, লিচু বাগান, সেভেন্টি নাইন টিলা, ইন্দ্রনগর, চন্দ্রপুর এবং জগৎপুর, যে সমস্ত অঞ্চলে কার্ফু ঘোষণা করা হইয়াছে সে সমস্ত অঞ্চলের জনসাধারণের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। এইসব অঞ্চলের কোন ব্যক্তি বাইরে যেতে হলে ডি. এম., এ. ডি. এম. বা সাব ডিভিসানাল ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিতে হইবে।

রেডিওতে সংবাদ প্রচারের একটি নিজস্ব ধারা আছে। স্থানীয় বা সর্বভারতীয় সংবাদ, একই কথা। প্রচারিত সংবাদের শেষ অংশে থাকে 'খেলার-খবর'। দাঙ্গার কারণে খেলাধূলা বহুদিন বন্ধ ছিল। অতএব স্থানীয় সংবাদে খেলাধূলার খবর থাকার কোন প্রশ্ন আসে না। বেতার কর্তৃপক্ষ যেন চিত্তসুখে সংবাদের শেষ অংশে কার্ফুর খবর প্রচার করিত। আমার অভিজ্ঞতায় বলে না এমন কোন বাড়ী দেখিয়াছি, যেখানে কার্ফুর সংবাদ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিরক্তির সহিত 'নব' ঘুরাইয়া রেডিও বন্ধ করিয়া দেয় নাই।

যাক, যে কথা বলিতেছিলাম, কি মনে করিয়া সেদিন অর্থাৎ ৪ঠা আগষ্ট সন্ধ্যায় শান্তিদার সঙ্গে দেখা করিতে যাই। অস্ত্রোপচারের পর শান্তিদা খুব একটা ভাল হন নাই। বাড়ী হইতে বড় একটা বাহির হইতেন না। আমি মাঝে মধ্যে যাইতাম, কৈলাস মানস সরোবর, মণিমহেশ, কেদার বদ্রী, গঙ্গোত্রী যমুনেত্রী ভ্রমণ অভিজ্ঞ শান্তিদা শুধু সার্থক প্রেরণাদাতা বা অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী। শান্তিদার সঙ্গে সময় কাটানোর কথাটির অর্থ, এক-একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করা। শান্তিদার সম্বন্ধে যতই বলা হউক না কেন তাহা কখনও বেশী হইতে পারে না। আমি কোথায়ও যাওয়ার পূর্বে

পরামর্শের মূর্ত প্রতীক।

অমরনাথের পথে শান্তিদার প্রত্যেকটি উপদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অভিজ্ঞতা প্রসূত ও দরদী উপদেশ যে কত ফলদায়ী তাহা অমরনাথ ভ্রমণের সময় প্রতি মুহূর্তে অনুভব করিয়াছি। পাঠক যদি মনে করেন, আমি প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী 'শান্তিদা শান্তিদা' করিতেছি, তবু আমি নিঃসন্দেহ, পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।

অমরনাথ ভ্রমণ করিয়া বেলা ৩টা/সাড়ে ৩টায় পহেলগাঁও ফিরি। শরীর যতখানি পরিশ্রান্ত হইতে পারে ততখানিই পরিশ্রান্ত। অমরনাথ দর্শন শেষে অক্ষত শরীরে পহেলগাঁও ফিরিয়া আসিয়াছি, শুনিলেও আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শুভার্থীগণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবেন এরূপ মনে করিয়া শরীর চলুক আর নাই চলুক, সেই আক্ষরিক অর্থে ধুলাপায়ে সোজা পোষ্ট অফিসে চলিয়া আসি এবং কয়েকটি চিঠি আগরতলায় লিখি। পরিষ্কার মনে আছে, প্রথম চিঠিতে লিখি শান্তিদাকে।

আগরতলায় ফিরিয়া শান্তিদার খবর লইতে হইল না, শুনিলাম তিনি জি. বি. হাসপাতালে কেবিনে আছেন। জি. বি. হাসপাতালে গেলাম। শান্তিদা মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, অচেতন, সেলাইন চলিতেছে। অবস্থা বেশ কয়েকদিন যাবৎই সংকটজনক। যে কোন সময়ই তিনি মৃত্যুর কোলে চলিয়া পড়িতে পারেন। শোনা এক কথা, আর দেখা অন্য কথা। শান্তিদার অবস্থা দেখিয়া আমার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হয় নাই। চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছি। বড় ভাই শ্রীযুক্ত তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত কতক্ষণ আমাকে কি যেন বলিলেন। শুনিতেছি ঠিকই কিন্তু হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না, যত নিকটের লোকই হউক না, কেহ মৃত্যু পথযাত্রীর সঙ্গে থাকিয়া যে সবসময় সেবা-শুশ্রূষা করে, সংকটজনক পরিস্থিতিতেও তাহার এক ধরণের স্বাভাবিক ভাব আসিয়া যায়। তড়িৎদার সেই অবস্থা। আমার অবস্থা ঠিক বিপরীত। খানিকক্ষণ পর তড়িৎদা হাসিমুখে জানাইলেন, 'যেই দিন শান্তির মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ আরম্ভ হয় এবং অচেতন হইয়া পড়ে তার তিন দিন আগে অমরনাথ দর্শন শেষে পহেলগাঁও হইতে লেখা তোমার চিঠি পায়। এবং আনন্দে চিৎকার করিয়া আমাকে ডাকিয়া চিঠিটির আগাগোড়া পড়িয়া শোনায়।' শান্তিদার আনন্দ অনেকটা তিনিই যেন আর একবার অমরনাথ দর্শন করিয়াছেন এরূপ। পহেলগাঁও হইতে শান্তিদাকে লেখা চিঠির কাহিনী এইখানেই শেষ নয়। আমার আগরতলা আসার কয়েক দিন পর জি. বি. হাসপাতালের সেই কেবিনেই শান্তিদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শান্তিদার শ্রাদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যায় তাঁহাদের বাড়ীতে

সেজ কাকার (শান্তিদার) বিছানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে গিয়া পাহাড়গাঁও হইতে লেখা আমার চিঠিটি পায়। আরও জানায়, আমার লেখা চিঠিই সেজ কাকার জীবিত অবস্থায় পাওয়া শেষ চিঠি। সে আরও কি যেন বলিতে চাহিয়াছিলেন, শোকে প্রথমে গলার স্বর আটকাইয়া যায়, তারপর ক্ষণিকক্ষণ নির্বাক। মুখ ঘুরাইয়া অশ্রু গোপনের ব্যর্থ চেষ্টা করিল। পরিস্থিতি যারপরনাই বিষাদময় হইয়া উঠিল। আমি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সেই স্থান ত্যাগ করিলাম।

এইরূপ পরিস্থিতিতে যদি প্রয়োজনের চেয়েও বেশীবার শান্তিদার নাম লই ব শান্তিদা সম্বন্ধে কিছু বলিতে গিয়া আবেগের আচ্ছন্ন হই তবে নিজেকে দোষ দিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, আমার মত পরিস্থিতিতে পড়িলে স্বাভাবিক ভাব বজায় রাখিতে সকলেই ব্যর্থ হইবেন।

মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। ৪ঠা আগষ্ট সন্ধ্যায় শান্তিদার সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তিনি অন্যান্য বার গেলে যেইরূপ আনন্দিত হইতেন ততখানি আনন্দের সহিত আমাকে সাদর আহ্বানে নিকটে বসাইলেন। তখনও ত্রিপুরার পরিস্থিতি যথেষ্ট খারাপ। রাত্রি ৯টা হইতে সকাল ৬টা পর্যন্ত সান্ধ্য-আইন জারী রহিয়াছে। স্বভাবতই আমাদের আলোচনাও ত্রিপুরার বুকে এই অস্বাভাবিক অকল্পনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপর ছিল। দাঙ্গার কারণ সম্বন্ধে, কিংবা সরকারের ভূমিকা, স্থানীয় ও সর্বভারতীয় পত্র-পত্রিকায় এই দাঙ্গার বিবরণ, দাঙ্গায় ত্রিপুরার সাময়িক ও স্থায়ী ক্ষতি কি কি বা কোন রাজনৈতিক দল কতখনি ক্ষতিগ্রস্ত, কাহারই বা কতখানি লাভ, ইত্যাদি বিষয় নিজেদের মতামত দিতেছিলাম। যথা মৃতের সংখ্যা পাঁচ-ছয় শত না দশ বার হাজার? ত্রিপুরার নদীসমূহ দিয়া বাংলাদেশে কতগুলি মৃতদেহ ভাসিয়া গিয়াছে? বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিভাগ কি যে সমস্ত নদীর উৎস ত্রিপুরায় ঐ সমস্ত নদীর জল ব্যবহার করিতে সে দেশের নদীতীরবর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীদিগকে নিষেধ করিয়াছেন, না "পানি ফুটাইয়া ব্যবহার করুন" বলিতেছেন ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর তর্কতর্কি চলিতেছিল! তর্কতর্কির বা আলোচনার নিজস্ব একটি তাল বা ঢং থাকে। হঠাৎ যেন শান্তিদা আলোচনার ঐ তাল কাটিয়া বা ঢং বদল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

: তোমার স্কুল ত বন্ধ চলিতেছে?

: হ্যাঁ, আমার সংক্ষিপ্ত জবাব।

: আরও কিছু দিন বন্ধ থাকিবে?

: হয়ত, এবার-ও আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম কা

সন্দেহ হইতে লাগিল, এইখানেই প্রশ্নের শেষ নয়। শান্তিদার কিছু একটা মতলব আছে। অপেক্ষা করা বিধেয়। জানি, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে না। তিনি নিজে হইতেই বলিবেন। বাস্তবে তাহাই ঘটিল। মিনিটখানেক আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া জানিতে চাহিলেন,

: এখন শ্রাবন মাস না?

শান্তিদার কথার গঠনটি ছিল প্রশ্নবোধক।

ভিতরে কোন প্রশ্ন ছিল না, অন্তত আমার বিবেচনায়। তাই আমি কোন উত্তর না দিয়া শান্তিদার মুখের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

পুলিশ-দারোগা যে স্বরে অপরাধীর স্বীকৃতি আদায় করার জন্য প্রশ্ন করেন অনেকটা সেই স্বরে তিনি বলিলেন;

: তুমি কি মনে কর তোমার জীবনে কোন দিন শ্রাবন মাসে স্কুল বন্ধ পাইব?

আমি ধীবে ধীরে নেতিবাচক ভংগীতে মাথা নাড়িলাম। আমি তখনও সমানে শান্তিদাব মনের ভাবটি আঁচ কবার জন্য চেষ্টা করিয়া যাইতেছি।

: তবে?

"মর যন্ত্রণা, তবে কি?" মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম।

: "তুমি একটা কাজ কর। কালই প্লেনে রওয়ানা হও। শ্রাবন মাসে স্কুল বন্ধ, তোমার পক্ষে একটা মস্ত সুযোগ ত বটে।" শান্তিদার উল্টা-পাল্টা কথায়, তখন তাঁব মনোভাব আঁচ কবা ত দূরের কথা, সকলেরই সহিত অথৈ জলে হাবুডুবু খাইতেছি।

: এই শব্দ কয়টি কি শান্তিদার অনুরোধ না আদেশ তাহা ভগবান বা বাবা অমরনাথ জানেন। আমি শুধু মনে মনে বেশ কয়েকবার "অমরনাথ, অমরনাথ, অ-ম-র-নাথ, অ-ম-র-না-থ" জপিলাম।

অবাক হইয়া যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিলাম, এই সোজা কথাটা এতদিন মনে আসে নাই কেন। স্কুল ছুটি হইলেই বাহির হই। এবার এতদিন যাবৎ স্কুল বন্ধ। আমি এখানে কি করিতেছি।

জ্যৈষ্ঠের শুরুতে গ্রীষ্মের বন্ধ আরম্ভ হইয়াছে। দাঙ্গার কারণে বন্ধের দিনগুলি বাড়িতেছে। স্কুলে স্কুলে শরণার্থী, জ্যৈষ্ঠ গেল, আষাঢ় গেল, শ্রাবণেরও অর্ধেকের বেশী অতিক্রান্ত। মাত্র তিন দিন আগে স্কুলে গিয়াছিলাম। স্কুলের কিছু অংশ আধা-সামরিক বাহিনীর দখলে; বাকী অংশে প্রচুর শরণার্থী। কোন অবস্থাতেই খুব তাড়াতাড়ি স্কুল খোলা সম্ভব হইবে না।

দাঙ্গা দুর্গত অঞ্চলে সরকারের স্কুল কলেজ বন্ধ রাখা কাজের ধারা ছিল, একসঙ্গে ১৫ দিন ১৫ দিন করিয়া ছুটি বাড়ানো। তখনকার চালু সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আমার কর্মক্ষেত্র, সেকেরকোট হাইস্কুল ১০ই আগষ্ট পর্যন্ত বন্ধ ছিল। সরকার যদি আর এক ক্ষেপ ছুটি বাড়ান তবে ২৫ তারিখ পর্যন্ত বাড়াইবেন সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলাম।

আমি ছুটি সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম। বাবা অমরনাথের কৃপায় কি সবটা ছুটিই পরে পরে যাইবে, না কিছুটা নিজের অর্জ্জিত ছুটি হইতে খরচ করিতে হইবে।

ছুটি সম্বন্ধে কোন আলোচনাই শান্তিদার সঙ্গে করা গেল না। এ বিষয়ে তাঁর মতামত, যতটা ছুটি পাওয়া যাইবে তাহাতে না কুলাইলে নিজের অর্জিত ছুটি ভোগ করিবে। শান্তিদার সোজা কথা,

: তুমি এখন যাও, বাসায় গিয়া প্রস্তুত হও, কালকের প্লেনে ফ্লাই কর।

"তুমি এখন যাও", বলার পর আর কাহারও নিকট বসা যায় না। আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে, "আর শোন" বলিয়া হাত দিয়া আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। কি কি পোশাক লইতে হইবে তাহার বিস্তারিত ফিরিস্তি দিলেন। মাংকি ক্যাপ সম্বন্ধে বারে বারে সাবধান করিলেন, ভুলেও মাংকি ক্যাপ পরিয়া কান গলা ঢাকিয়া ঘুমাইবে না।

মাফলারের ব্যবহার সম্বন্ধেও কিছু উপদেশ দিলেন. "হিমালয়ের উপরে যত ঠাণ্ডাই হউক যথাসম্ভব পিছনের এই ঘাড়ের অংশটা" তিনি হাত দিয়া নিজের শরীরের ঐ অংশটুকু হাতাইতে হাতাইতে বলিলেন, "যথাসম্ভব খোলা রাখিবে।"

: বলেন কি? শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে না?

: না না বেশী ঠাণ্ডা লাগিলে অবশ্যই মাফলার জড়াইবে। যথাসম্ভব কম মাফলার জড়াইবে. এই আর কি? তুমি ত গরমেও খর মরুভূমিতে ছিলে? নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছ, সে দেশে গরমেও লোকেরা পাগড়ী ত পরেই—পেছন দিকে দেড় হাত আন্দাজ কাপড় বাহির হইয়া থাকে। ঐ কাপড়ে তাহারা ঘাড়ের পিছন দিক ঢাকিয়া রাখে।

ঠিক মনে পড়িল তাহাদের পাগড়ী ঐরূপই বটে। তবে পিছনের দেড় হাতটাক কাপড় প্রখর রৌদ্র তাপ হইতে ঘাড়-ঢাকার জন্য তাহা জানা ছিল না। এবং এই ঘাড় ঢাকা যে এত প্রয়োজনীর তাহাই ব' কে জানিত।"

পোষাক আষাক সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়ার পর চলিয়া আসার ইচ্ছায় বলিলাম, "ঘাড় কাটা" কথাটার অর্থ এতদিনে যেন পরিষ্কার হইল। তীব্র শীতে

যথাসম্ভব খোলা রাখিতে হইবে আর প্রচণ্ড গরমে সেই ঘাড়ই যথাসম্ভব ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

কতক্ষণ প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া শান্তিদা বলিলেন, "ঠিক আছে, তুমি এখন যাও, বাসায় গিয়া…ইত্যাদি একই বক্তব্য।

আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে "আর শোন"—বলিয়া হাত দিয়া আমাকে আবার বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

: তুমি ত কেদার বদ্রীর কিছুটা পথ হাঁটিয়া গিয়াছ?

: না, বদ্রীনারায়ণ ত গাড়ীতেই যাওয়া যায়। কেদারের পথে শোন প্রয়াগ পর্য্যন্ত এখন গাড়ী যায়। তবে আমরা সীতাপুরে ছিলাম। সীতাপুর হইতে হাঁটিয়া প্রথম রাত্রি গৌরীকুণ্ড। পরদিন কেদার। ফিরা পথে কেদার হইতে এক হাঁটায় গৌরীকুণ্ড শোন প্রয়াগ হইয়া সোজা সীতাপুরে আসি।

আমার এত কথার উত্তরে শান্তিদা অল্প কয়েক কথায় জানাইলেন,

: তুমি ভাগ্যবান। মহাপ্রস্থানের পথ দেখিয়াছ। যেদিন কেদার পর্য্যন্ত গাড়ী চলাচল করিবে সেদিন তীর্থ যাত্রীরা কি যে হারাইবে তাহা তাহারা নিজেরাও কোনদিন জানিবে না, বুঝিতেও পারিবে না।

এক এক তীর্থস্থানের এক একটি নিজস্ব মহিমা আছে। হিমালয়ের তীর্থসমূহের নিজেদের নিজস্ব মহিমায় মহিমান্বিত। হয় ত ভারতের সমতলভূমিতে অবস্থিত তীর্থস্থান সমূহের মহিমা হইতে হিমালয়ের তীর্থ সমূহের কোন কোনটির মহিমা বেশী, কোনটির হয় ত কম। কিন্তু তীর্থ পথের মহিমা হিমালয়ে যে রূপটি সে রূপটি আর কোথাও নাই। এই গাড়ী চলাচলটা হিমালয়ের তীর্থ পথের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে তীর্থযাত্রীকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিতেছে। হিমালয়েই তীর্থস্থান ও তীর্থ পথের মহিমা সম্যকরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, অবিচ্ছেদ্য।

হিমালয়ের তীর্থ পথের উচ্ছ্বাসিত বর্ণণা করিতে করিতে জানাইলেন, বর্তমান অবশ্য বানতাল নামক স্থান হইতে একদিনেই অমরনাথ দর্শন করিয়া বানতাল ফিরা যায়। শ্রীনগর হইতে বানতাল গাড়ীতে যাতায়াত করা যায়।

বানতাল হইয়া অমরনাথ সম্বন্ধে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দেখিয়াছিলাম। বানতাল রাস্তার খুব একটা বিস্তারিত বর্ণনা ঐ প্রবন্ধে ছিল না।

শান্তিদা যদিও পহেলগাঁও, চন্দনবাড়ী, শেষনালের রাস্তা সম্বন্ধে জোর দিয়া আমাকে কিছু বলেন নাই তবু তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন আমি পহেলগাঁও হইয়াই যাইব। আমি যে শান্তিদার কথামত অবশ্যই অমরনাথে যাইতেছি এ সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না।

শান্তিদার সাফ কথা, পহেলগাঁও পর্যন্ত তোমাকে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তুমি নিজে নিজেই অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবে। হিমালয়ের অন্যান্য স্থানে অর্থাৎ কেদারবদ্রী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কৈলাস মানস সরোবরের পথে পথে ভোরে কি সকালের দিকে আকাশ পরিষ্কার থাকে। যতই বেলা বাড়িতে থাকে ততই আকাশ খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িতে থাকে। বিকালের দিকে বৃষ্টিপাত, তুষারপাতের সম্ভাবনা প্রবল। অতএব ভোর হইতেই হাঁটা আরম্ভ করিবে। হিমালয়ের এই সাধারণ নিয়মটুকুও বাবা অমরনাথ স্বয়ং হিমালয়ে থাকিয়া মানিতে নারাজ। অমরনাথের পথে কোন্ সময় যে বৃষ্টি বা তুষারপাত আরম্ভ হইবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। শিব ঠাকুরের আপন দেশ ত। আইন কানুন সর্বনেশে হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। তবু ভোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিবে এবং যেখানে রাত্রিবাস করিবে দুপুরের মধ্যে সেখানে পৌঁছিতে চেষ্টা করিও। কোন সময় জোরে হাঁটিবে না, এমন কি পথের সঙ্গীর খাতিরেও না, আবার নিজের গতির চেয়ে আস্তেও হাঁটিও না। হাঁটার সময় নিজস্ব গতি বজায় রাখিতে চেষ্টা করিও। প্রত্যেকের হাঁটার একটা নিজস্ব গতি থাকে, সে গতিতে চলিলে সবচেয়ে কম পরিশ্রান্ত হয়।

এ সমস্ত উপদেশ দেওয়ার সময় শান্তিদা কোন সময় বসা বা কোন সময় আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। কথা বলিতে বলিতেই উঠিয়া বিছানার নিকটে রাখা একটি আলমারী হইতে একটি এলবাম আনিয়া অমরনাথ পথের বিভিন্ন স্থানের আলোকচিত্র দেখাইতেছিলেন। চন্দনবাড়ী, শেষনাগ, পঞ্চতরণী এবং গুহার ফটো। প্রত্যেকটি ফটো দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল সেই স্থানের ধারা বিবরণী। গুহার ফটো দেখাইয়া (পরে বুঝিয়াছি দূর হইতে তোলা গুহা মুখের ফটো) বলিলেন, গুহায় আমি কোন কবুতর দেখি নাই। কবুতরের কথা শুনিয়াছিলাম। তুষারলিঙ্গ দেখিয়া বাহির হওয়ার মুখে ২টি কবুতরকে উড়িতে দেখিয়াছি। কবুতর দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গের যাত্রীদের "বাবা অমরনাথ কি জয়" বলিয়া সে কি চিৎকার! সে কি উচ্ছাস! শান্তিদার ভ্রমণের সঙ্গীদের উচ্ছাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা করিতে না পারিলেও শান্তিদা যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে সম্পূর্ণ উচ্ছাসিত সে সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। চোখে মুখে আনন্দ ঝরিয়া পড়িতেছে। গুহামুখ যখন আর মাইল দেড়েক বাকী, শেষ পাহাড়টি অতিক্রম করা হইয়াছে। আকাশ ভাল থাকিলে ঐ স্থান হইতেই গুহা মুখ দেখা যায়। শান্তিদার বর্ণনার সাথে মিলাইয়া আমি ঐ স্থানে গিয়া বুঝিলাম, যে স্থানে পঞ্চতরণী হইতে গুহার পথে, বানতাল হইতে অমরনাথ গুহার যাওয়ার পথটির মিলন হইয়াছে

আরেকটু বিস্তারিত বা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলে উল্টা দিক হইতে অর্থাৎ অমরনাথ হইতে ফিরার পথে প্রথম দেড় মাইল একই রাস্তা। তারপর বাঁ-দিকে বানতালের রাস্তা নামিয়া গিয়াছে—ডানদিকে পঞ্চতরণী বা পহেলগাঁও এর রাস্তা। ঐ দেড় মাইল দূরত্বে অবস্থিত স্থানটির নিজস্ব কোন নাম নাই, একমাত্র এইস্থান হইতেই প্রথম গুহামুখ দেখা যায়, এবং সে স্থান হইতে গুহামুখ পর্যন্ত দীর্ঘ (পাঠক, শুধু দীর্ঘ নয়, অতি দীর্ঘ) দেড় মাইল পথের প্রায় সবটাই বরফের উপর দিয়া যাইতে হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, পথের শেষ পাহাড়, সে স্থান হইতে বেশ খানিকটা নীচে নামিতে হয় সবসময় সমপরিমাণ বরফ বা একরূপ আবহাওয়া থাকে না। আমি যেদিন গিয়াছিলাম সেদিন আবহাওয়া ছিল যার পর নাই খারাপ। যদি আদৌ রাস্তা পদবাচ্যের যোগ্য হয় তবে ঐ রাস্তা মারাত্মক রকমের পিচ্ছিল। ঘোড়া যাত্রী বহন করিবে কি? ঘোড়াকেই সাবধানে ধরিয়া নামানো হইতেছে। মানুষের সক্রিয় ও আন্তরিক সহায়তা সত্ত্বেও কোন কোন ঘোড়া পিছলাইয়া পড়িতেছে। রাস্তার অবস্থা এত খারাপ। আমি বা আমার সহযাত্রীদের কেহই শুধুমাত্র নিচে লোহার টোপ লাগানো লাঠির সাহায্যে নিচে নামিতে পারিতেছিলাম না। স্থানীয় অর্থাৎ পহেলগাঁও অঞ্চলের কুলি ও ঘোড়াওয়ালারা আমাদের প্রত্যেককে সেই পাহাড়ের মাথায় দুইদিকে পা ছড়াইয়া বসাইয়া পিছন দিকে এক একটি রামধাক্কা দিতেছে আর আমরা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে একের পর এক বসিয়া বসিয়া স্কী করার ঢংএ অপূর্ব গতিতে নিচে নামিয়া আসিয়া আমরা প্রথমে দেখি লাঠিটি ঠিক আছে কিনা, তারপর হাত পা গুলি, সর্বশেষ কোন রকমে দাঁড়াইয়া আগে যাঁহারা বসিয়া বসিয়া স্কী করিয়া নামিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া এখনও যাঁহারা নামিতে বাকী, সেই পাহাড়ের মাথায় দাঁড়ানো রহিয়াছেন তাঁহাদের দিকে অনুকম্পামিশ্রিত দৃষ্টিপাত করিয়া খানিকক্ষণ বরফের চাঁইয়ের উপর বসিয়া অপেক্ষা করি।" এই পথটুকুর বর্ণনা এত জীবন্ত হইয়াছিল যেন আমার চক্ষের সম্মুখে সব ঘটনা ঘটিতেছে এরূপ বোধ হইয়াছিল। এই ঘটনার বর্ণনা দিতে দিতে শান্তিদা যতই আনন্দিত হউন যত হাসিই হাসুন না কেন আমার আত্মারাম খাঁচায় ছিল না। মনে হয় সেদিন অতি নিপুণভাবে মনোভাব গোপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

এই স্থানের বর্ণনা দিতে দিতে শান্তিদা একবার উঠিয়া কি যেন হাতে লইয়া আসিয়া আবার বিছানার উপর বসিলেন। ঘড়ি দেখিলাম। রাত পৌনে আটটা, নয়টা হইতে কার্ফু। স্বভাবতঃই এবার আসর ভাঙ্গার উদ্যোগ ছিল

আমার তরফ হইতে। বাসায় পৌছিতে হইলে অন্তত দেড় মাইল যাইতে হইবে। টাউন বাসের আশা নাই। রিক্সাও তথৈবচ। যে রিক্সাওয়ালার যে দিকে বাড়ী একমাত্র সেইদিকে যাওয়ার রিক্সা পাওয়া যায়। কপাল ভাল থাকিলে মটর ষ্ট্যাণ্ড হইতে রামগরের রিক্সা পাইলেও পাইতে পারি।

আমি চেয়ার ছাড়ার উদ্যোগ করিতেই "আরে শোন" বলিয়া আমাকে হাত দিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। একটি কোয়ার্টার সাইজ ফটো বাহির করিয়া বলিলেন, "এই শেষনাগ হ্রদের ছবি" স্বভাবতঃই কাফ্‌'র উৎকণ্ঠা গোপন রাখিয়া শেষনাগের উপর আলোচনা শুরু করিলাম। ছোট ফটোটি দেখাইয়া বলিলেন "এই অংশটায় হ্রদের জল, এই হ্রদের জল স্বচ্ছ বা স্ফটিক স্বচ্ছ বলিলে কিছুই বুঝানো যায় না, জলের রং ও ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কেহ হয়ত দেখিলে সবুজ, কেহ হয় নীল। একই ব্যক্তি হয়ত অমরনাথ যাওয়ার পথে দেখিল নীল আবার অমরনাথ হইতে ফেরা পথে দেখিল জলের রং সবুজ। জানো, আসলে ঐ শেষনাগের জলের রং নির্ভর করে আকাশের অবস্থার উপর। যদি পরিষ্কার নীল আকাশ হয় তবে জলের রং ও হয় নীল। আবার মেঘমুক্ত আকাশ হইলে জলের রং সবুজের মত হইয়া থাকে। ঘনমেঘে আকাশ আচ্ছন্ন থাকিলে জলের রং সবুজ হইয়া যায়।" যে জিনিষটা শান্তিদাকে সবচেয়ে অবাক করিয়াছে তাহা শুধু শান্তিদাকে কেন, এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী সবাইকে অবাক করিবে। শান্তিদা যখন শেষনাগ হ্রদ দেখিতেছিলেন তখন দিনের বেলা। আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার। মেঘের ছিটাফোটাও নাই। হ্রদে গাঢ নীল জল। আকাশের একদিকে একটি মেঘের উদয় হইল। হ্রদের এক কোনার জলও সবুজ রং এর হইয়া গেল। ঐ ঘন কালো মেঘটি আস্তে আস্তে বড হইতে হইতে অর্ধেক আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। জলের ঐ সবুজ রংও ঐ মেঘের সাথে সমান ভালে আস্তে আস্তে বড হইতে হইতে অর্ধেক হ্রদে বিস্তার লাভ করিল। অর্ধেক আকাশ কাল মেঘে ঢাকা আর অর্ধেক আকাশ একদম নির্মেঘ এরূপ অবস্থায় অনেকক্ষণ ছিল।

হ্রদের জলও সমান তালে অর্ধেক সবুজ অর্ধেক নীল ছিল। যখন সবুজ রং নীল রংকে গ্রাস করিতেছিল তখন মনে হইতেছিল যেন কেহ কোন সূতা দিয়া এই দুই রংকে আলগা করিয়া রাখিয়াছে। এরূপ অবস্থায় কতক্ষণ থাকার পর মেঘ আগাইতেছে। ঐ মেঘটির হয়ত তখনকার মত 'ষ্টক পজিসান' ভাল ছিল না। এবার আগাইবার সাথে সাথে যেই দিক হইতে মেঘ আকাশে আসিয়াছে আকাশের সেই দিকটি পরিষ্কার হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে

মেঘটি শেষনাগের আকাশ পার হইয়া গেল। মেঘ আগাইয়া যাইবার সাথে সাথে প্রথম যেদিকে জলের রং হইতে সবুজ হইয়াছিল সেই দিকেই প্রথম সবুজ হইতে আবার নীল হইল। এবারও মনে হয় যেন দুইটি শিশু হ্রদের দুই পারে থাকিয়া একই সুতা ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং তাহাদের ধরা সুতার একদম সঙ্গে সঙ্গে নীল রংও আগাইতেছে।

নিজের মনের সঙ্গে মিলাইলাম। কোজাগরি বা শারদ পূর্ণিমায় তাজমহল দেখিয়াছি। সেদিন আগ্রা উৎসবের মেজাজ থাকে। পূর্ব বন্দোবস্ত না থাকিলে ঐদিন আগ্রা যাইয়া হোটেলে স্থান পাওয়া প্রায় অসম্ভব। শারদ পূর্ণিমায় তাজমহল দেখা। পাথরকে কাঁচের মত দেখায়। স্থানীয় লোকেরা বলে; "পাত্থর-কি-চক্‌মকি"। উপরের যে পাথরটিকে অল্প কিছুক্ষণ আগেও পাথরই দেখিয়া গিয়াছিলাম এখন তাজকে এক চক্কর লাগাইয়া দেখিলাম কোথায় সেই পাথর! তাহার বদলে যেন একটি কাঁচের টুকরা বসানো রহিয়াছে। বেশ জুত করিয়া ঐ পাথরটির বা কাঁচটির একটু দূরে বসিলাম! দেখিতে দেখিতে প্রথম কাঁচটির পরের কাঁচটিও কাঁচ হইয়া গেল এরূপ তিন চারটি পাথর কাঁচ হওয়ার পর প্রথম পাথরটি যেটি সবপ্রথম কাঁচের ন্যায় হইয়াছিল কোন সময় যেন আবার পাথর হইয়া গেল। এবার ঐ একটু দূর হইতে কাছে আসিয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। না, পাথর পাথরই। এরূপ ভাবে আকাশে পূর্ণিমা চাঁদের অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তাজের বিভিন্ন স্থানের পাথর রূপ বদলায় আবার পূর্ব রূপ ফিরিয়া পায়। সেই রাত্রিতে তাজমহলে বিরাট মেলা যেন। লক্ষাধিক মানুষ সর্বক্ষণ তাজমহলের বিরাট চত্বরে থাকে। ঐ রাত্রে তাছে যাতায়াত করে বেশ কয়েক হাজার গাড়ী। আমি অনেকক্ষণ তাজে থাকিয়া রাত্র তিনটা সাড়ে তিনটায় একাকী রিক্সায় ছিপিটোলার হোটেলে ফিরিতেছিলাম!

১৯৭৪ সালের ঘটনা। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, হোটেল হইতে বাহির হওয়ার সময় সব টাকাই সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। তিন তলায় একক থাকার ব্যবস্থা বিশিষ্ট একটি কোঠায় ছিলাম। বিদেশে কি বিশ্বাস? হয়ত আসিয়া দেখিব আমার ঘর ফাঁক। হোটেলওয়ালা কৈফিয়ৎ দিবে আমার কর্মচারী নীচের তলায় অপিস ঘরে ঘুমাইতেছিল। কোন্ যাত্রী আপনার ঘরে ঢুকিয়া আপনাকে পাতলা করিয়াছে আমি কি জানি? বিদেশে টাকা পয়সা হারাইয়া থানা পুলিশ করা ও অন্যের অনুগ্রহে দেশে ফিরা কাহারো কাম্য হইতে পারে না। আমার ও হয় নাই। তাই 'যা থাকে বরাতে' এরূপ

মনোভাবে চালিত হইয়া সমস্ত টাকা পয়সা সঙ্গে লইয়া রাত আটটা নাগাদ খাওয়া দাওয়া করিয়া রিক্সায় তাজে আসিয়াছিলাম। হোটেল কর্মচারী রিক্সা ঠিক করিয়া দিয়াছিল। ভাড়া আড়াই টাকা। শেষ রাতে তাজ হইতে ফিরার সময় রিক্সা আড্ডায় গিয়া রিক্সা ঠিক করার সময় রিক্সাওয়ালা পাঁচ টাকা ভাড়া চাহিল। আমি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলাম। জামার বুক পকেট হইতে সমস্ত কাগজ পত্র নামাইয়া, রিক্সাওয়ালাকে যেন কত অনিচ্ছার সঙ্গে দেখাইতে দেখাইতে কাগজের ভাঁজ হইতে মাত্র তিনটি টাকা পাইলাম। আবার একই অভিনয় করিয়া প্যান্টের ডান দিকে পকেট হাত দিলাম। এবার বাহির হইল কিছু খুচরা পয়সা কতক্ষণ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ঐ খুচরা পয়সা গুনিয়া রক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে সাড়ে তিন টাকায় যাইতে রাজি কি না। সে রাজি হয় নাই। আমাকে কিছুটা চিন্তান্বিত দেখাইল। হঠাৎ যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে এরূপ আনন্দের সহিত বলিলাম .

: দেখ তোমাকে পাঁচ টাকাই দিব। তবে হোটেলের সামনে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে। সঙ্গের লোকদিগকে জাগাইয়া উঠাইয়া টাকা লইতে হইবে। হয় ত তোমার পাঁচ-দশ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিতে হইতে পারে।

: বইঠিয়ে জী, রিক্সাওয়ালা মাথা নাড়িয়া রিক্সার বসার আসন দেখাইয়া দিল।

সে রাতে নিজের নিরাপত্তার প্রশ্নটা এরূপে অনেকখানি মেরামত করিয়া দুশ্চিন্তা মুক্ত হইয়া খোলা মনে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় কুয়াশার খেলা দেখিতে দেখিতে তাজ হইতে ছিপিটোলার হোটেলে ফিরিয়া ছিলাম।

এই অবস্থায় যাহা হয়। রিক্সাওয়ালার সঙ্গে রাজ্যের গল্প জুড়িয়া দিলাম। মন দুশ্চিন্তা মুক্ত ছিল বলিয়াই হয় ত রিক্সাওয়ালার মনের অনেকখানি ভিতরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

দীর্ঘ আলাপের বাহুল্য অংশ বাদ দিয়া যে অংশটা উল্লেখযোগ্য তাহা নিম্নরূপ। বাবুদের বিস্তা টাকা পয়সা আছে সত্য তবে বুদ্ধি সুদ্ধির উপর তার ঘোর সন্দেহ। একই ত পাথর। চাঁদের আলোয় না হয় কিছুক্ষণ চকমক্ করিল। তার জন্য এত টাকা খরচ করিয়া, এত কষ্ট করার কোন মানে হয় ? ইত্যাদি ইত্যাদি ...... ।

শারদ পূর্ণিমার চাঁদ আমার চিন্তার আসার কারণ যেরূপ আস্তে আস্তে একটার পর আর একটা দৃশ্যও কাঁচের পাথরগুলি আবার পাথর হইয়া যায় সেইরূপ শান্তিদাও শেষনাগ হ্রদের সবুজ জলকে নীল দেখিয়াছিলেন।

পাহাড়ের মাথায় সাদা অংশগুলি জমানো বরফ। এই দেখ, লম্বালম্বিভাবে পাহাড়ের চূড়া হইতে পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত বরফের লাইন, বেশ আঁকা বাঁকা। দূর হইতে দেখিতে অনেকটা সাপের মত। মাথায়, এই কারণেও ইহাকে শেষনাগ হ্রদ বলে।

কার্ফুর উৎকণ্ঠায় ঘন ঘন হাত ঘড়ি দেখিতেছিলাম। এই উৎকণ্ঠার মধ্যেও শেষনাগ সম্বন্ধে আলোচনা তখনই শেষ করিতে পারিলাম না। শেষনাগ আমার অনেকদিনের স্বপ্ন। মনে মনে ভাবিতাম, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতাম, "হে শঙ্কর, শারীরিক কারণে যদি সম্পূর্ণ অমরনাথের পথ যাইতে অক্ষম হই তবে অন্তত যেন শেষনাগ পর্যন্ত যাইতে পারি।"

অমরনাথ নয় শেষনাগ, শেষনাগ আমাকে অনেক বেশী আকর্ষণ করিত। ছোটর দাবী সব সময়ই আমার মনে অনেক বেশী দাগ কাটে। কেদারনাথ বদরীনারায়ণ ধাম দর্শন করিয়াছি। পথে যথারীতি দেবপ্রয়াগ, রুদ্র প্রয়াগ, গুপ্তকাশী, শোনপ্রয়াগ, গৌরীকুণ্ড কিংবা কর্ণপ্রয়াগ, পিপুলকোটি, পাণ্ডুকেশর। কিন্তু আমার মন সবচেয়ে বেশী দাগ কাটিয়াছে বদরীনারায়ণ মন্দির হইতে মাইল খানেক উপরে অবস্থিত ব্রহ্মকপাল, পিতৃতীর্থ ব্রহ্মকপাল, অবশ্য দর্শন করার পর। আর শেষনাগ, অমরনাথ দর্শন করার অনেক আগে হইতেই কিংবদন্তির কারণে শেষনাগের আকর্ষণ ছিল বিশেষতঃ অয়ারলেসের কর্মী অমরেন্দ্র রক্ষিতের নিকট হইতে কাহিনী শুনার পর সে আকর্ষণ আরও বাড়ে। সে ১৯৭৯ সালে পহেলগাঁও শেষনাগের পথে অমরনাথ গিয়াছে। শেষনাগের জলে শত শত যাত্রীর সাথে সেও শেষনাগ দর্শন করিয়াছে, শিবের গলায় জড়ানো সে সাপ সচরাচর আমরা পাথর ইত্যাদির তৈরী শিবমূর্তিকে বা ছবিতে দেখি, সেই সাপটিকে সে জীবন্ত অবস্থায় শেষনাগের হ্রদে পঞ্চমুণ্ড সহ বিচরণ করিতে দেখিয়াছে। শুধু সে একাই এই দুর্লভ দর্শনের অধিকারী নয়, তাহার সঙ্গে শত শত যাত্রী এই অপূর্ব সর্প দর্শনে অভিভূত হইয়া অতি উচ্চকণ্ঠে 'জয় বাবা অমরনাথের জয়' ধ্বনিতে শেষনাগের আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিয়াছে। শ্রীরক্ষিতের বর্ণিত শেষনাগ হ্রদে বিচরণশীল সেই সাপের কাহিনী শান্তিদাকে শুনাইয়া তাঁহার শেষনাগ অভিজ্ঞতা জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করি।

: দেখ, সত্যি কথা বলিতে কি, আমি প্রচুর লোকের মুখে শুনিয়াছি এই হ্রদের জল শেষনাগ থাকেন। যদিও ঐ নাগ দর্শনের অভিজ্ঞতা আমার হয় নাই, তবু তোমায় বলিতে কি, এই শেষনাগ হ্রদের নাগ সম্বন্ধে আমি একজনের

। শুনিয়াছি, যাঁহাকে আমি বিশ্বাস করি। তবে ঐ ভদ্রলোকেরও নিজের অভিজ্ঞতা প্রসূত নয়, তাঁহার শোনা কথা তবে তিনি ঐ কাহিনী শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন যে সেখানে নাগ আছে। তাঁহার প্রতি আমার গভীর আস্থা থাকায়, তাঁহার বিশ্বাস আমার বিশ্বাস উৎপাদন যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। বিশ্বাস করা না করা তোমার অভিরুচি। আমি ঘটনাটি বলিতেছি, তোমার নিকট বিশ্বাস-যোগ্য বিবেচিত হইলে বিশ্বাস করিও, তোমার বিশ্বাস না হইলে তোমাকে কোনরূপ অনুযোগ দিব না।

"প্রায় বছর পনেরো আগে দশ বারজন সৈনিকের একটি দল ঐ পথ দিয়া অমরনাথ যাত্রায় যেন যাইতেছিল। শেষনাগ নামক যে এক হ্রদ আছে তাহাকে ঐ সৈনিক দলের কাহারও জানা ছিল না। হিমালয়ের পথে যাহা স্বাভাবিক অর্থাৎ নদীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হওয়া, ঐ সৈনিকদল সেরূপভাবেই অর্থাৎ নদীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। পথে অনুকূল পরিবেশ দেখিয়া তাঁবু খাটাইয়া রাত্রি যাপন করেন। এইরূপভাবে অগ্রসর হইতে হইতে একটি বড় হ্রদ দেখিয়া ও থাকার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ঐ হ্রদের পারেই তাঁবু খাটাইয়া রাত্রিযাপন করেন। সকালে হঠাৎ জলে এক অস্বাভাবিক আলোড়ন দেখিয়া একজন অন্য সকলের দৃষ্টি ঐ আলোড়নের দিকে আকৃষ্ট করেন। ক্রমে ক্রমে সেই আলোড়ন এমন। ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে যে ঐ সৈনিকেরাও পারে থাকা নিরাপদ মনে করেন নাই। সবাই পাহাড়েই উপরে চলিয়া আসেন। ঐ স্থান হইতে দেখেন এক বিশাল লম্বা এবং চারজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড় হইয়া দাঁড়াইলে যতখানি ব্যাসের সৃষ্টি হয় প্রায় ততখানি ব্যাস বিশিষ্ট সাপ যেন আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছে। এরূপ বিশাল ভয়ঙ্কর জীবের ধারণাই তাঁহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে না। ঐ দল পহেলগাঁও আসিয়া প্রথম হিমালয়ের মুখ দেখেন।"

"পহেলগাঁও এ তাঁহারা কাহারো কাহারো নিকট নিজেদের সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন! যাঁহারাই এই কাহিনী শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঐ সৈনিকদলকে একই কথা বলিয়াছেন, আপনারা ভাগ্যবান? আপনারা শেষনাগ হ্রদের পারে ছিলেন। আপনারা দর্শন করিয়াছেন। পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত বহু পুণ্যের ফলে ঐ দর্শন সম্ভব হইয়াছে।"

এই কাহিনী শান্তিদার শোন। বিশ্বাস করা না করার দায়িত্ব আমার। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী। পাঁচ মাথাওয়ালা সাপ সে শত শত যাত্রীর সঙ্গে দেখিয়াছে। আর আমি? আমার অবস্থা, সুকান্তের ভাষায়—

'দস্যুর ভয়, তার চেয়ে ভয় কখন সূর্য উঠে।' করুণভাবে বলিলাম, শান্তিদা 'আটটা কুড়ি', এখনও রওয়ানা না হইলে নির্ঘাৎ হাজত বাস। নয়টায় কার্ফু।

এইবার শান্তিদা আর ধরিয়া রাখেন নাই। আমিও উঠিলাম। সেদিন কে জানিত এই কথা কয়টিই শান্তিদার সঙ্গে আমার শেষ বাক্যালাপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আজ ৫ই আগষ্ট, মঙ্গলবার। অমরনাথ যাওয়া সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছিতে না পারিয়া সন্ধ্যার দিকে বন্ধুবর অমল মজুমদারের সঙ্গে আলোচনা করিয়া যাহা হউক একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে চেষ্টা করি। অমলবা যেন পূর্ব হইতে কতই না প্রস্তুত ছিলেন এরূপভাবে বলিলেন 'বেশ চলুন, আমি ও রাণী যাইব।'

কেদার-বদরী ভ্রমন অভিজ্ঞ এই দম্পতিকে হিমালয়ের পথে ভ্রমন সঙ্গী হিসাবে পাওয়া খুবই আনন্দের ও ভাগ্যের কথা। অমলবাবুর সঙ্গে আলাপের পরই, মনের কোনে যে ক্ষুদ্র অংশে অমরনাথ যাওয়া না যাওয়ার যে মেঘ জমিয়াছিল তাহা একদম পরিস্কার হইয়া গেল। আমি নিঃসন্দেহ, অমলবাবুর অমরনাথ যাওয়ার কোনরূপ পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিল না। যদি তাঁহার মনে সুদূরতম কোনেও এইরূপ কোন চিন্তা থাকিত তবে যে ব্যক্তি প্রথম জানিতে পারিত সে ব্যক্তি আমি।

পরদির বুধবার। সকাল হইতেই শ্রাবণের ধারা চলিতেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন কাজ হয় নাই। বৃহস্পতিবার রক্ষিতকে জানাইলাম, এবার, এই কাল পরশুর মধ্যে, অমরনাথ যাইতেছি। রক্ষিতের সে কি আনন্দ। কি উল্লাস। যাত্রা পথের প্রত্যেক স্থানেরও নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা আর একবার দিল।

: "দাদা" শিশুর আবদারের সুরে বলিল, আমার জন্য অমরনাথ যাত্রা পথে যে লাঠিটি ব্যবহার করিবেন সেই লাঠিটি আনিয়া দিবেন। বাসায় ঠাকুরের আসনের সঙ্গে রাখিব। আর, আপনার পায়ে ধরি, বৈষ্ণু দেবীর গুহা অবশ্যই দেখিয়া আসিবেন।

শ্রীনগরে বা পহেলগাঁও এ যে কোথায় কোথায় থাকার পক্ষে সুবিধা তাহা খুঁটিনাটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাহার নিকট হইতে জানিয়া লইতেছিলাম।

আমাকে সাহায্য করার জন্য সে এতই উদ্‌গ্রীব ছিল যে, আমি তখন বলিলে সে অসংকোচে গায়ের জামাটিও খুলিয়া দিয়া তৃপ্তি পায়। রক্ষিতের উপদেশে ও অনুরোধে আমি একজোড়া ফুলসাইজ উলের মোজা তাহার নিকট হইতে লইলাম। রক্ষিতের মোজা। এক মুখে এই মোজার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। পাঠক, আপাততঃ এইটুকু জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকুন, যদি অমরনাথ হইতে ফিরা পথে শেষনাগ বা চন্দনবাড়িতে আমি রক্ষিতের দেখা পাইতাম কিংবা পহেলগাঁও ফিরার সঙ্গে সঙ্গে, তবে প্রথমে যেথা মাত্র একবিন্দু সময় নষ্ট না করিয়া, একচড়ে আমি তাহার মুণ্ডু ঘুরাইয়া দিতাম। ঐ মোজার কারণেই। ফিরার আগে রক্ষিতের মোজা জোড়াকে যথাযোগ্য মর্য্যাদার সহিত সৎকার করিতে পারিয়াছি, এইটুকুই আমার শেষ সান্ত্বনা। সময়ে মোজা সৎকার কাহিনী অবশ্যই ব্যক্ত করিব।

বন্ধুবর গভর্ণমেণ্ট এডভোকেট শ্রীপ্রফুল্ল মজুমদারকে সোজা জানাইলাম, "অমরনাথ যাইতেছি"।

: কবে? হঠাৎ? আগে বলেন নাই কেন? এখন কোর্ট খোলা। যথার্থ এডভোকেট। প্রথমেই একরাশ কৈফিয়ৎ তলব। আগে না জানানোর জন্য অনুযোগ দিলেন। এই সুযোগ গ্রহন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। আমার আমি ও সস্ত্রীক অমলবাবু যাইতেছি শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। জম্মু, শ্রীনগর, পহেলগাঁও এর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বলিলেন। আমাকে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের পর্যটন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত একটি গাইড-বুক দিলেন। আরও কি কি সাহায্য করিতে পারেন, জানিতে চাহিলেন। আলাপ সংক্ষেপ করিয়া গাইড-বুকটি লইয়া বাসায় ফিরিলেন।

সকাল ১০টা বাজিতে না বাজিতেই শিক্ষা অধিকর্তার অফিস ছুটিলাম। যদি খবর লইয়া জানিতে পারি আরও একাক্ষেপ অর্থাৎ পনরো দিন ছুটি বাড়ানো হইয়াছে, তবে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে রওয়ানা হইতে পারি। শিক্ষা অধিকারের জনৈক দায়িত্বশীল কর্মচারীকে তাঁহার চেম্বারের বাহিরে দেখিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলাম, "ভিতরে আসুন। বিশেষ কথা আছে।" ভদ্রলোক চেম্বার হইতে বাহির হইয়া কোথায় যেন যাইতেছিলেন। আমার কথা বলার ধরণেই কি না

কে জানে, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে আসিয়া বিস্ময়ে জানিতে চাহিলেন, কি ব্যাপার?

: আপনারা কি আর এক দফা ছুটি বাড়াইবেন।

: আপনার প্রয়োজন? বাড়িলে জানিতে পারিবেন।

: অমরনাথে যাওয়ার ইচ্ছা। আপনি যদি বলেন ছুটি বাড়ার শতকরা পাঁচ শতাংশও আশা আছে তবে না হয় বাকী পচানব্বই শতাংশ ঝুকি আমি বহন করিলাম।

: অমরনাথ? অমরনাথে যাইবেন আপনি? এবার? হাঁ, হাঁ, শ্রাবণী পূর্ণিমাতেই ত? ইস্, জানেন, আমি না, পহেলগাঁও পর্য্যন্ত গিয়াছি!

পহেলগাঁও তেই কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য! পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বরফ।

এই ভাবে বেশ কিছুক্ষন পহেলগাঁও তথা কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনার পর বলিলেন,

: যাক, যেই জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন সেই সম্বন্ধে বলি। আপনি জানিতে চান ছুটি বাড়ানোর সম্ভবনা অন্ততঃ পাঁচ-শতাংশ আছে কিনা? বেশ জানিয়া রাখুন, আমার ধারণা এই সম্ভাবনা ঐ পাঁচ শতাংশের চেয়ে অনেক বেশী।

আমি আর বেশী বাক্য ব্যয় করি নাই। বিদায় লইয়া সোজা ব্যাঙ্ক আসি। আমার তাড়া ছিল। দাঙ্গার কারণে ব্যাঙ্ক কার্যকালের সময় কমাইয়া সকাল ১০টা হইতে দুপুর ১২টা পর্য্যন্ত করিয়াছিল। ইউকো ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইয়া ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে আসিয়া কিছু টাকার 'ট্রেভেলার্স চেক' কিনিয়া বেশ খুসি খুসি মনে বাসায় ফিরিলাম।

বিকালের দিকে অমলবাবুর বাসায় গিয়া তাঁহারা কতখানি প্রস্তুত হইয়াছেন জানিতে চাই। কি একটা বৈষয়িক প্রয়োজনে তিনি কয়েকদিন পর রওয়ানা হইতেছেন বলিলেন। বারে বারে বলিলেন,

: আমাদের জন্য একদিনও অপেক্ষা করিবেন না। অমরনাথ গুহায় যাওয়ার 'টার্গেট ডেট' কিন্তু ঠিক রাখিবেন। শুক্লা-অষ্টমী। আপনি এখনই রওয়ানা দিন। পত্রিকায় দেখিলাম কুণ্ডু স্পেশাল ১৯ তারিখে অমরনাথের দল যাত্রা করাইবে। কলিকাতায় আপনার প্রথম কাজ ঐ দলের জন্য এখনও লোক নেয় তবে আমাদের নাম বুক করিয়া তাঁহাদের অফিস হইতেই সোজা টেলিগ্রাম করিবেন। আমি টি. এম. ও. করিয়া টাকা পাঠাইব।

অমরনাথ গুহায় শ্রাবণী পূর্ণিমায় না গিয়া আরও আগে তুষার লিঙ্গ দর্শন করার

অষ্টমী দিন লিঙ্গ দর্শনের ব্যবস্থা পত্র শাস্তিদার, আমাদের নিকট ধ্রুব।

দুপুরের পর একে একে আমার সমস্ত জিনিষপত্র গুছাইলাম। সৈনিক পিঠে বহন করার জন্য যে ধরনের কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করেন তাহাকেও ইংরেজিতে 'হেভারস্যাক' বললেও ভারতীয় নাম 'পিঠ্‌ঠু' আমার প্রিয়। পিঠ্‌ঠু, এয়ার ব্যাগ, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, এই আমার সবকিছু।

চোখে কি যেন হইয়াছে। কয়েকদিন যাবৎ অল্প অল্প জ্বালা করে। অবস্থা সহনীয়। তাই আর চিকিৎসার খুব একটা গা করি নাই! কিন্তু এখন চোখের কথা খেয়াল হইতেই চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শ্রীমৃণাল ভৌমিকের বাসায় গেলাম।

প্রচুর রুগী। অনেক্ষণ অপেক্ষা পর আমার সময় আসিল। বলিলাম,

: অন্য সময় হইলে এই সামান্য ব্যাপারে আসিতাম না। 'লোকুলা' দিয়া কাজ সারিতাম। কিন্তু বরফের দেশে যাইতেছি।

অমরনাথের নাম শুনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নূতন উদ্যমে আমার চক্ষু পরীক্ষা করিলেন। আগে আসিলে ভাল হইত বলিলেন। যাহা হউক, ব্যবস্থা পত্র দিয়া, অমরনাথ যাত্রীর নিকট হইতে, আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও, ভিজিট ত নিলেনই না উপরন্তু কিছু স্যাম্পল ঔষধ জোর করিয়া দিয়া ছিলেন।

ডাঃ মৃণাল ভৌমিকের কৃষ্ণনগর বাসা হইতে দ্রুত পা চালাইয়া ডাঃ পি কে চৌধুরীর জয়নগরের বাসায় চেম্বারে আসি। রাত্র সোয়া আটটা। রিক্সা পাওয়া ভার। দ্রুত পা না চালাইয়াই বা করি কি? ডাঃ চৌধুরীর বাড়ী হইতে আমার বাড়ী বেশ কাছে। কার্ফুর সতর্কীকরণ সাইরেন বাজিলে ও বাসায় দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত সাইরেন বাজার আগেই পৌছিতে পারিব। রাত সাড়ে আটটা। পথ বেশ নির্জন হইয়া আসিতেছে। কার্ফুর ভয়ে ডাঃ চৌধুরীর চেম্বারেও এখন আর রোগী নাই। অল্পকথায় হিমালয়ের বরফ অঞ্চলে শরীরে কি কি অসুবিধা হইতে পারে। রাস্তায় সামান্য অসুখে বিসুখে কি কি ট্যাবলেট লওয়া দরকার ইত্যাদি জানিতে চাহিলাম।

—মহাই, আপনি ঘুরবেন কেদারবদ্রী, আর আমি আপনাকে উপদেশ দিব কি কি শারীরিক অসুবিধা হয়? আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন! হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে কতক্ষণ আলোচনা করিয়া বেশ কয়েকটি ট্যাবলেটের নাম লিখিয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিয়া অমরনাথের অভিজ্ঞতা শুনাইব। এইরূপ কথা দেওয়ার পর ডঃ চৌধুরীর চেম্বার হইতে উঠিতে পারি।

সেদিন ৭ই আগষ্ট রাতে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে যাই। আর বাকী শুধু প্লেনের টিকিট। কাল জোগা যাইবে।

ছাড়া গতি নাই। শুধু পয়সার শ্রাদ্ধই না, আরও বড় অসুবিধা চাহিদা মত প্লেনে স্থান পাওয়া যায় না সাধারণ সময়েই প্লেনে স্থান পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে হয় আর বিশেষ অবস্থায় যথা পূজার সময় বা গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হইলে ত কথাই নাই। এক মাস দেড় মাস আগে গিয়াও শুনিতে হয় টিকিট নাই। আবার বর্ষাকাল ছাড়া বৎসরের অন্যান্য সময়ে বোয়িং বিমান চলাচল করে। বর্ষায় ফকার ফ্রেণ্ডশীপ বিমান। বোয়িং এর যাত্রী বহন ক্ষমতা প্রায় তিনটি ফকার ফ্রেণ্ডশীপের যাত্রী বহন ক্ষমতার সমান। স্বাভাবিক সময়েই যাত্রীর চাপ থাকে, বর্ষায় বাড়ে। বর্ষায় সচরাচর দশ পনেরো দিনের আগে টিকিট পাওয়া যায় না। এবার ত্রিপুরায় দাঙ্গা। রাজ্যের মোটঅধিবাসীর শতকরা প্রায় ষোল জন শরনার্থী শিবিরে। সব শরনার্থীর আর্থিক অবস্থা একরূপ নয়। যদিও খুবই অল্পসংখ্যক তবু কেহ কেহ নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় বাহিরে যাইতেছে। পরিবারের সবার যাওয়া সম্ভব না হইলে, সম্ভব ক্ষেত্রে বাড়ীর একটি ছেলেকেও নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় পশ্চিমবাংলায় বা অন্যত্র পাঠাইয়া দিতেছে।

এদিকে আসামে লাগাতার গোলমাল। গৌহাটির রাস্তাও নিরাপদ নয়। তাই তখন শিলচর করিমগঞ্জের লোকেরাও নিরাপত্তার খাতিরে গৌহাটি হইয়া কলিকাতা যাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী টাকা খরচ করিয়াও আগরতলা হইয়া প্লেনে কলিকাতা যাতায়াত করিত। আর নিরাপত্তার খাতিরে যে সমস্ত ত্রিপুরাবাসী সাময়িকভাবে ত্রিপুরা ছাড়িয়াছিল তাহারা ত গৌহাটি হইয়া কলিকাতা যাওয়ার কথা চিন্তাতেও আনিতে পারে নাই। শুধুমাত্র এখানকার জনসাধারণই নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বাহিরে যাওয়ার প্রয়াস চালাইত না। ত্রিপুরার বাহিরে বসবাসকারী মানুষ ত্রিপুরায় বসবাসকারী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে সাময়িক সময়ের জন্য হইলেও ত্রিপুরা ছাড়ার আহ্বান জানাইত! আমার ঐ সময়ে পাওয়া একটি চিঠি ত্রিপুরার বাহিরে অবস্থানকারী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের উৎকণ্ঠা সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিবে। শ্যাম সুন্দর শর্মা। নৈনীর (এলাহাবাদ) অধিবাসী। অবাঙ্গালী। জুলাই মাসের মাঝামাঝি শ্যামবাবুর চিঠি পাই।

"আমরা অত্যন্ত চিন্তিত। আপনাদের দেশের দুর্ঘটনা সংবাদ পত্র মারফৎ অবগত হয়ে বাবা ও মা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ওখানে আপনাদের অসুবিধা হলে এখানে সত্বর চলে আসুন, কোন দ্বিধা না করে। আপনি এবং পরিবারের সকলে কি অবস্থায় আছেন পত্র পাওয়া মাত্র পত্র দিয়া আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করুন।" চিঠিটির বয়ান হুবহু তুলিয়া দিলাম। চিঠিটি কোন বাঙ্গালীর দ্বারা লেখানো। মানবতার মূল্যবান দলিল হিসাবে চিঠি আজও আমার নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে।

এই শ্যামবাবুর সঙ্গে আমার পরিচিতির পরিধিই বা কতটুকু? ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী এলাহবাদ কুম্ভমেলায় যাই এবং কল্পবাস করি। সঙ্গমের পাড়ে তাঁবুতে কিংবা খড়ের তৈয়ারী নেহাত ছোট ছোট ঘরে থাকিয়া ব্রহ্মমুহূর্তে যাহারা সঙ্গমে স্নান করেন আর সারাদিন সাধুসঙ্গ, সংগ্রহ পাঠ ইত্যাদিকে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন তাঁহারাই কল্পবাসী। চরাচর কল্পবাসীগণ কুম্ভমেলায় মাসখানেক থাকেন। কল্পবাস সম্বন্ধে কুম্ভমেলাতে আমি যে পর্যন্ত বুঝিয়াছি। কুম্ভমেলায় গিয়া দেখিলাম বা জানিলাম আমরা ও কল্পবাসী। এই কল্পবাস সম্বন্ধে আমি পূর্বে কিছু জানিতাম না, কাহারও নিকট কিছু শুনিও নাই। কুম্ভমেলায় অনুভব করিলাম কল্পবাসীর ও যথেষ্ট মর্যাদা। সাধুসন্তের পরই মর্যাদায় কল্পবাসীর স্থান। এমন কল্পবাসীর সঙ্গেও আলাপ হইয়াছে যাহাদের বাড়ী এলাহবাদ শহরেই। বাড়ীর বৃদ্ধ বৃদ্ধা দুজন কল্পবাস করিতেছেন। প্রায় তিন হাত লম্বা দুই হাত পাস ও আড়াই হাত উচ্চতা বিশিষ্ট ঘর। ঘরের বেড়া বলুন, দরজা বলুন আর চাল বলুন সবই গমের খড়ে তৈয়ারী। ঘরের মেঝেতে বিছানো ঐ গমের খড়। একথা হলপ করিয়া বলার উপায় নাই পুত্রবধূর সৎপরামর্শই বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর কল্পবাস জনিত পুণ্য অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির উৎস কিনা। যাহা হউক সেইবার কুম্ভমেলায় আমরা ছয়জন গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গীরা কেহই হাবাগোবা ত নয়ই কাহারও ভ্রমণের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তবু আমার অভিজ্ঞতা বেশী বলিয়াই হয়ত বা এই ছয়জনের দলের নেতৃত্ব আমার উপর ছিল। দুপুর নাগাদ এলাহাবাদ ষ্টেশনে ট্রেন হইতে নামি। কিন্তু ষ্টেশনে নামিয়া হতবাক্‌। এ কোন্ এলাহাবাদ? এ কোন্ ষ্টেশন? একবার প্ল্যাটফর্মের এদিক হইতে সেদিক হাঁটিলাম। এলাহবাদ কতবার যাতায়াত করিয়াছি। কিছুই মিলিতেছে না। আমার মুখ নিশ্চয় চিন্তায় ছাপ পড়িয়াছিল। কুম্ভমেলা, ভীড়, প্রাণ সংশয়, এমতাবস্থায় রেলষ্টেশনে আসিতে না আসিতেই যদি দলনেতার মুখ দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে তবে নেতার উপর নির্ভরশীল অন্যদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এমন সংকটজনক অবস্থাতে দূর হইতে অবাঙ্গালী উচ্চারণে সু-উচ্চ আহ্বান শুনিতে পাই—কহ্নু বাবু ও ও।

—ব্যস্! স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। সঙ্গের প্রত্যেকের মুখে হাসি। আমি শ্রীমঙ্গল শর্মাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম, মঙ্গল শর্মা আমাকে। দীর্ঘ আলিঙ্গনের পর সঙ্গীদের সাথে পরিচিত করাইয়া দিলাম। মঙ্গল শর্মা পরিচয় করাইলেন—"শ্যামা, আমার ছেলে। এখানে বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়ের কারখানায় কাজ করে। ছেলেকে বললাম আজ কাহ্নুবাবু আসবেন বেটা দফতরে যাবি না।"

আমার প্রথমেই প্রশ্ন এ কোন এলাহবাদ? এখানে ত কখন ও আসি নাই।

—এ সিটি ষ্টেশন। জংশনে যাতায়াত করিয়াছেন ত। দুর্ভোগ শুধু আপনাদেরই হয় নাই। আমরাও সমান দুর্ভোগ ভুগিয়াছি। আপনি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন এলাহবাদ ষ্টেশনে যেই সিঁড়ি দিয়া দোতলায় রিটায়ারিং রুমে যাইতে হয়, সেই সিঁড়ির নীচে, সেখানে হজযাত্রার সময়, হজযাত্রীদের সুবিধার জন্য সাময়িক ভাবে অপিস খোলে, সেইখানে অপেক্ষা করিতে। আমরা বাপ বেটা বেশ আগে হইতেই আসিয়া আপনার নির্দিশিত স্থানে অপেক্ষা করিতে থাকি। আপনার দেওয়া সময়ে স্টেশনে কোন ট্রেন আসে নাই। ভাগ্যিস্ ট্রেনের নাম্বার দিয়াছিলেন। পুছ-তাছ অফিসে ট্রেনের খবর লইতে গিয়া জানিতে পারি, ঐ ট্রেন এলাহবাদ জংশনে না আসিয়া এলাহবাদ সিটি হইয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি বাপ বেটা সিটি ষ্টেশনে আসি। এখানে আসিয়া খবর পাই ট্রেন এখনও আসে নাই। শুনিয়া খুসি মনে অপেক্ষা করিতেছিলাম। এলাহবাদ কুম্ভমেলায় সময় ছেলের নৈনীর বাড়ীতে থাকিয়া কুম্ভমেলা দেখার জন্য বিচিত্র পরিস্থিতিতে বিচিত্র পরিবেশে মঙ্গলশর্মা ও তাঁহার তখনকার সঙ্গীরা আমাকে সাদর আহ্বান জানান। অনেকটা তাঁহাদের অগ্রাহকে মর্যাদা দেওয়ার জন্যই প্রায় অন্ধকারে একটি ছোট কাগজ ট্রেনের ভিতর মঙ্গলশর্মার দেওয়া শ্যামসুন্দরের ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। যখন লিখি তখন আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, এ লেখা কোনদিন আদৌ পড়া যাইবে কিনা। আলোর অভাবে কি লিখিতেছি পড়া যাইতেছিল না। উপরন্তু ট্রেনের ঝাঁকুনি ত ছিলই। ঐ ট্রেনে আমার সঙ্গে ছিল ২৩/১৩ উমাকান্ত দত্ত রোড্, দমদম ক্যান্টনমেণ্ট এর বাসিন্দা শ্রীমতী জয়ন্তী সিন্হা, তাঁর দিদি ও ভগ্নিপতী নেপাল দাস। মঙ্গলশর্মা ও তাঁর দলের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তাঁহারা গোল গোল চোখ করিয়া বারে বারে আমাকে দেখিতে থাকেন। প্রচণ্ড অভিমানে জয়ন্তীদি বলেন,—তীর্থভাই আপনি ত কিছু বলেন নাই। অভিমানে তাঁর বাকরুদ্ধ হইয়া যায়। ঘটনা শুনিয়া নেপাল বাবু উচ্ছ্বসিত। এমন ঘটনা যে আমার দ্বারা সম্ভব এ ধারণা নাকি তিনি আমাকে দেখার পর হইতেই পোষণ করিতে ছিলেন।

উপযুক্ত ক্ষেত্র পান নাই বলিয়া এতদিন ব্যক্ত করেন নাই। এখন ক্ষেত্র প্রস্তুত, তিনিও জানাইলেন। জানাইয়া রাখা ভাল জয়ন্তিদি আমাকে তীর্থভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

আত্মপ্রসংশা নয়, সত্যের খাতিরেই বলিতেছি, আমার ব্যবহার রুক্ষ এরূপ অপবাদ শুনি নাই। কিন্তু সেদিন ব্যবহার করিয়াছিলাম, ভগবান জানেন।

হৃষীকেশ ষ্টেশনে শেষ ট্রেন ধরার জন্য প্রচুর যাত্রী। আমি, জয়ন্তিদি, সস্ত্রীক নেপালবাবুও ঐ অপেক্ষামান যাত্রাদলে ছিলাম। ট্রেন সম্যকরূপে ষ্টেশনে

প্রবেশের পূর্বেই, বহুলোক সম্ভব অসম্ভব সমস্ত পথে কামরার ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিজের বসার জায়গা ও যার যার জায়গা রাখিতেছে। আমিও কোন-রূপে প্রবেশ করিয়া নিজের ও জয়ন্তিদি, নেপালবাবুদের জন্য বসার জায়গা রাখিয়াছিলাম। ট্রেন হৃষীকেশ ষ্টেশনে আসিয়া অনেকক্ষণ থাকিয়া হরিদ্বারে রওয়ানা হয়। প্রথমে যত পশুশক্তির সাহায্যেই হউক না কেন একবার জায়গা দখল করিয়া বসিলে ঐ স্থানে কি এক অলিখিত নিয়মে দখলকারীর অধিকার জন্মিয়া যায়। একবার দখলের পর কামরার বাহিরে গিয়া বা অন্যত্র গিয়া ফিরিয়া আসিয়া যদি কেহ নিজের জায়গাটি বেদখল দেখে তবে কথাতেই কাজ হয়, অর্থাৎ বলিতে হয়, এ আমার জায়গা, দখলকারী মানিয়া লয়, সহ-যাত্রীরাও বলেন হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ভদ্রলোকের জায়গা। এই দখলীস্বত্বকে পশুশক্তিস্বত্ব, গুণ্ডাস্বত্ব বা মস্তানস্বত্ব যাহাই বলুন। যখন দেখিলাম আমার এমন দখলীস্বত্বে কষ্টার্জিত আসনে লম্বা ঘোমটা টানিয়া এক মোটাসোটা বয়স্কা মহিলা বসিয়া আছেন, তখন তাঁহাকে আসনছাড়া করার জন্য আমার অঙ্গভঙ্গিসহ বক্তব্য প্রকাশ ভঙ্গি ভদ্রতার ধারে কাছেও ছিল না। বিপরীত দিকে বসা জনৈক বিহারী নিজের আসন ছাড়িয়া বলে,

: আপনি এ আসনে বসুন।

আমার কিরূপ যেন জেদ চাপিয়া যায়।

: না, এ আমার স্থান। এই স্থানই চাই। বসিতে হয় উনি আপনার আসনে বসুন।

শুধু কথাতেই অভদ্রতা ছিল না। আমি ঐ ভদ্রমহিলার হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইব এরূপ ভাব দেখাই। পূর্বের বিহারী লোকটি এবার নীচে বসিয়া আস্তে আস্তে ঐ মহিলার পা হইতে কাপড় উঠাইয়া হাঁটু পর্যন্ত দেখাইয়া আমার সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করিল। দেখিলাম, একটি পা অসম্ভব মোটা। পরিষ্কার গায়ের রং-এর জন্য মোটা পা টি বেশ লালচে। হঠাৎ আমার মাথায় বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

: আরে তুমি! তুমি আজ! জীবিত!

আবেগে আরও কত কি বলিতে বলিতে ঐ মহিলাকে জড়াইয়া ধরি। মহিলা আসনে বসা, আমি অতি নিকটে দাঁড়ানো। ঐ লম্বা ঘোমটা দেওয়া মোটাসোটা বিহারী মহিলা দু'হাতে বেষ্টন করিয়া আমার পেটে নিজের মাথাটি রাখিয়া চুপ করিয়া আছেন।

সেই বিহারী থ বনিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমার সঙ্গী জয়ন্তিদি, নেপাল-

বাবু তাঁদের অবস্থাও তথৈবচ। কামরার অন্যান্য যাত্রী, যাহারা একটা মজা দেখার জন্য এতক্ষণ মানসিক প্রস্তুতি লইয়াছিল, তাহারাও চুপ করিয়া ঘটনার নূতন গতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। হরিদ্বারের শেষ ট্রেন। গ্রীষ্মকাল। প্রতি কামরায় শ-সোয়াশ লোক উপযুক্ত পরিমাণ কোলাহল।

ভদ্রমহিলা আমাকে ধরা অবস্থায় মাথা কিছুটা উঠাইয়া নিম্নস্বরে নিকটে দাঁড়ানো সেই বিহারী লোকটিকে দোভাষী ভাষায় কি যেন বলিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিহারী দোভাষী ভাষায় উচ্চস্বরে, উচ্চস্বরে কি রীতিমত চিৎকার করিয়া, কি যেন বলিতে বলিতে পাগলগতিতে কামরার এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল। সমানে চিৎকার করিতে করিতে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কাহাদিগকে যেন ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বহু বিহারী লোক কামরায় জড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ পর এবার ভদ্র মহিলা আমাকে ছাড়িয়া নিম্নস্বরে ঐ বিহারীদের বয়স্ক একজনকে আমার সম্বন্ধে কি যেন বলিল। এবার তাহাদের আলাপের কিছু কিছু বুঝিলাম। যখন মহিলা কথা বলিতেছিলেন, তখন মহিলার মুখের দিকে তাকাইয়া, আবার যখন পুরুষটি কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া, কথার সঙ্গে সঙ্গে আমিও এ মুখ হইতে ওমুখ দৃষ্টি ফিরাইতে ফিরাইতে অল্প অল্প হাসিতেছিলাম।

এবার ঐ পুরুষ ভদ্রলোকটি নিজের পরিচয় দিলেন,

: আমি মঙ্গল শর্মা।

: ওহো, আপনিই মঙ্গল শর্মা?

এখন আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া মঙ্গল শর্মা বেশ ভাল বাংলায় সকলে বুঝাইল, একমাত্র আমার কৃপাতেই আজ সে স্ত্রীসহ দেশে ফিরিতে পারিতেছে। আমি মানুষ নই, নরদেহধারী দেবতা। যেই সময়ে যেই অবস্থায় আমি তাঁহার স্ত্রীকে বাঁচাইয়াছি। এমনটি দেখা ত দূরের কথা কেহ কখনও শুনেও নাই; ইত্যাদি আমার প্রশংসাসূচক বিস্তারিত লম্বা ফিরিস্তি।

কিন্তু আমি জানি, আমি কতটুকু কি করিয়াছি। ঐ প্রশংসার প্রায় সবটা ফাঁকিতে অর্জিত। জয়ন্তী দি ঘটনাটি না শোনানোর জন্য যতই অভিমান করুক না কেন, আমি কতটা অপরাধ বোধ হইতে ঘটনাটি গোপন করিয়াছিলাম। আমার যেন কি করিয়া ধারণা হইয়া গিয়াছিল, ঐ মহিলার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। তাই কাহারো মৃত্যুর জন্য দায়ী হইয়া অন্যকে কি বলার থাকিতে পারে? আমি ত সেদিন একেবারে সোজা সীতাপুরে না আসিয়া গৌরীকুণ্ড কি জঙ্গলচটি বা রামওয়াড় চটিতে থাকিয়া ভদ্রমহিলাকে বাঁচানোর একটা চেষ্টা

করিতে পারিতাম। আহা, মহিলাটি কি আছে, না ঐখানে, যেখানে কাঁদাইয়া আসিয়াছি, সেখানেই মরিয়া বসিয়া রহিয়াছে? এরূপ চিন্তায় দিন-রাত আচ্ছন্ন থাকিতাম। ঘুমাইতে গেলে বসা অবস্থায় মহিলার ছবি কল্পনানেত্রে ভাসিয়া উঠিত। দিনেও কয়েকবার একই চিত্র মানসপটে উদিত হইত।

ঘটনাটি বুঝাইতে গেলে প্রথমে কেদারের পথের শেষ অংশের রোজনামচা দিতে হয়।

কেদার হইতে তিন কিলোমিটার দূরে গরুড় চটি, গরুড় চটি হইতে তিন কিমি রামওয়াজ চটি, রামওয়াজ চটি হইতে তিন কিমি জঙ্গল চটি, জঙ্গল চটি হইতে চার কিমি গৌরীকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড হইতে সাত কিমি শোনপ্রয়াগ, শোনপ্রয়াগ হইতে দুই কিমি সীতাপুর। আমি যেদিন কেদার হইতে সীতাপুরে আসি সেদিন প্রকৃতি যারপর নাই অসহযোগিতা করিয়াছিল। যদিও রাস্তায় উৎরাই বেশী পরিশ্রম চড়াই ভাঙ্গার চেয়ে অনেক কম তবু বৃষ্টির জন্য রাস্তা পিচ্ছল ছিল। খুব সাবধানে ভর করিয়া আস্তে আস্তে চলিতে হইতেছিল। কেদার হইতে গরুড় চটি প্রায় সমতল। রাস্তায় স্থানে স্থানে বেশ বড় বড় বরফের চাঁই, পিচ্ছিল ত বটেই, তার উপর সমানে বৃষ্টি পড়িতেছিল। গরুড়চটি হইতে শোনপ্রয়াগ পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা, এত পিচ্ছল যে কি বলিব, উৎরাই বেশী। পিচ্ছল উৎরাইয়ে নামা চড়াই ভাঙ্গার চেয়ে অনেক অনেক বেশী কঠিন। ক্ষণিকে অমন যোগিতার জন্যও চরম মূল্য দিতে হইতে পারে। অনেক নীচে প্রচণ্ড আওয়াজ করিতে করিতে খরস্রোতা মন্দাকিনী প্রবহমানা। মন্দাকিনীকে কেন স্বর্গের নদী বলে এমত অবস্থায় স্পষ্ট বুঝা যায়। পা পিছলাইয়া বা ঘোড়ার ধাক্কায় যেকোন উপায়েই হউক একবার নদীতে পড়িতে পারিলেই হইল, অবশ্য নিজের দেখিতে হইবে না, অন্যরা দেখিবে সশরীরে স্বর্গলাভ বলিতে কি বুঝায়। গরুড় চটি হইতে রামওয়াজ চটির পথ বেশ উৎরাই, উৎরাই যত বেশী; পিচ্ছলও তত বেশী, বিপদও তত বেশী।

এই পথের উপরই এক মহিলা বসিয়া বসিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছেন। মুখ রামওয়াজ চটির দিকে। বসার ধরন বা দিক দেখিয়া বুঝিলাম আমারই মত কেদার হইতে ফিরিতেছেন এবং যথারীতি বৃষ্টিতে ভিজিতেছেন। এইখানে, এই সংকীর্ণ পথের মাঝে বসা অস্বাভাবিক। রাস্তায় চলাচলকারী ঘোড়া হইতে যে কোন সময় বিপদ হইতে পারে। মহিলার নিকট দাঁড়ানো একটি লোক। মহিলা মোটা সোটা গড়নের, হাতে আঁকা উল্কি, কাপড় পরার ধরন বলিতেছে অবাঙ্গালী। ঐ দাঁড়ানো লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, হাঁটা ত দূরের কথা, মহিলা এমন কি দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারিতেছেন না। এখানে বসিয়া থাকিলে মৃত্যু

অবশ্যম্ভাবী। মহিলাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কোন লাভ হয় নাই। এইবার 'জয় বাবা কেদারনাথ' বলিয়া পিছন দিক হইতে আমার দুই হাত মহিলার দুই বগলের নীচে দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় করাইলাম। প্রাণপণ শক্তি বলিতেছি একারণে পিচ্ছল পথে কোন ভারী জিনিষ তোলা বা বহন করা কত কষ্টকর একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যকে বুঝানো যাইবে না। আর এই পথে শুধু কষ্টকর নয় পা পিছলাইলে মৃত্যু অবধারিত। মহিলা বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারেন নাই, আবার বসিয়া পড়িয়াছেন। আমি কতক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। চিন্তা করিতে লাগিলাম, কি করা যায়। আবার 'জয় বাবা কেদারনাথ' বলিয়া মহিলাকে পিঠে লইয়া অল্প কয়েক কদম পা চালাইয়া বুঝিলাম এমনভাবে পরবর্তী চটিতে পৌছান অসম্ভব। দু'জনই মৃত্যুবরণ করিব। পাহাড়ের ঢাল কাটিয়া দেড় দুই হাত চওড়া রাস্তা। মহিলাকে রাস্তার যে দিকে পাহাড় সেদিকে, কুলীরা যেভাবে বড় বড় বস্তা টানে সেভাবে টানিয়া একটি বড় পাথরের নীচে বসাইলাম। বৃষ্টি ও সঙ্গের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস হইতে কিছুটা রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে, এরূপ ভাবিয়া সঙ্গে দাঁড়ানো পুরুষটির নিকট হইতে জানিতে পারিলাম মহিলা দলের সঙ্গে কেদার-বদ্রী তীর্থ দর্শনে আসিয়াছেন। স্বামী মঙ্গলচন্দ্র শর্মা, গিড়িডি বিহারের লোক দলে অনেক লোক আছে, সবাই নীচে নামিয়া গিয়াছে। সেও সেই দলেরই লোক। মহিলার সঙ্গে দলের সবার পিছন পিছন আসিতেছিল; এখন এই বিপত্তি।

হিন্দীতে বলিলাম, "দেখুন, আপনি এই মহিলাকে ছাড়িয়া যাইবেন না। বাবা কেদারনাথের রাস্তায় একটা না একটা ব্যবস্থা হইয়া যাইবে," এই কথা কয়টি বলিয়া আর দেরী করি নাই। নীচের দিকে হাঁটা শুরু করিলাম। যে লোক এতক্ষণ আমাকে এতটুকু সাহায্য করে নাই, পরন্তু দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিয়াছে, সেই লোকই আমার চলার সাথে সাথে চিৎকার করিয়া বলিতেছে, "এই, এই, একি করিতেছ? আমাদিগকে একা ফেলিয়া যাইতেছ, তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই? আরও কত কি? আমি হাঁটা থামানো ত দূরের কথা, চলার বেগ আরও বাড়াইয়া দিলাম। মন্দাকিনীর গর্জনও বৃষ্টির শব্দের জন্য বেশীক্ষণ লোকটার কথা আমার কানে আসে নাই। দ্রুত হাঁটিয়া রামওয়াজ চটিতে আসি। চটির প্রত্যেকটি দোকানে বলি, "যদি গিড়িডির কোন লোক পান তবে অবশ্যই বলিবেন, মঙ্গল শর্মার স্ত্রী পরমেশ্বরী দেবী পা ভাঙ্গিয়া মাইলখানেক উপরে আছেন। ডাণ্ডি-সহ গিয়া যেন মহিলাকে আনে। শুধু প্রত্যেক দোকানদারকেই নয়, দোকানে বসা প্রায় প্রত্যেক যাত্রীকে এই অনুরোধ করিয়া জঙ্গল চটির দিকে রওয়ানা দিই। জঙ্গল চটির পথে আমারই মত যাঁহারা কেদার হইতে নামিতেছিলেন তাঁহাদের

যাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলাম তাঁহাদিগকে বলি, গিড়িডির মঙ্গল শর্মার ধর্মপত্নী পরমেশ্বরী দেবী পা ভাঙ্গিয়া গরুড়চটি ও রামওয়াজ চটির মাঝামাঝি স্থানে আছেন, যেন দাণ্ডি লইয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার জঙ্গল চটির প্রত্যেক দোকানদারকে ও যতটা সম্ভব দোকানে চা পানরত বা বিশ্রামরত কেদার যাত্রীকে একই অনুরোধ করি। একই কাজ করি জঙ্গলটি হইতে গৌরীকুণ্ডের পথে পথে ও গৌরীকুণ্ডের দোকানে দোকানে। এইভাবে সীতাপুরে আসি।

আমি পরমেশ্বরী দেবীর আর কোন খোঁজখবর পাই নাই। সেদিন গিড়িডির লোকেরা তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিল কিনা আমার জানার কোন সুবিধা ছিল না। পরদিন সীতাপুরে সূর্য্যকরোজ্জ্বল সকালে ঝরঝরা শরীরে নত হইতে লাগিল, যদি মহিলার মৃত্যু হয় তবে আমার দায়িত্বও কাহারো চেয়ে কম নয়! আমি কেন সীতাপুরে আসিতে গেলাম? গৌরীকুণ্ডে থাকিয়া মহিলাকে উদ্ধার করার একটা চেষ্টা করা অন্তত উচিৎ ছিল। এই দায়িত্ব এড়ানোর জন্য একটা অপরাধ বোধ দিনে দিনে আমার মনে বাড়িতে থাকে। যতই দিন যাইতেছে ততই, আহা জীবিত অবস্থায় যদি ভদ্রমহিলাকে একবার দেখিতাম, এরূপ একটি আকাঙ্ক্ষা মনে তীব্রতর হইতে থাকে।

দেবভূমি হিমালয়ে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আমার খুব একটা আহামরি গোছের নয়। কিন্তু এই স্বল্প অভিজ্ঞতাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়াছে যে, যদি এ দেবভূমিতে কাহারো কোন ইচ্ছা অন্তর, অন্তস্তল হইতে উদিত হয় তবে সেই ইচ্ছা অবশ্যই পূরিত হইবে। আমার এই বিশ্বাস এত দৃঢ় যে সহস্র লোকের সহস্র যুক্তিতেও তাঁর এতটুকু হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে না। আমার এ পবিত্র বিশ্বাসকে আমি তর্কের বিষয়বস্তু করিতেও রাজি নই। এ সম্বন্ধে আমার কথাই শেষ কথা কেহ স্বীকার করুন আর নাই করুন, আমি নির্বিকার।

আমার অন্তর হইতে চাওয়ার ফলশ্রুতি, হৃষীকেশ ষ্টেশনে পরমেশ্বরী দেবীকে জীবিত অবস্থায় দেখা। পরমেশ্বরী দেবীর মাধ্যমে মঙ্গল শর্মার সঙ্গে আলাপ। হৃষীকেশ ছাড়িয়া দুইটি ষ্টেশন পার হওয়ার পর বিহারীদের আবেগ অনেকখানি কমিবার পর কুম্ভমেলার সময় তাহাদের নৈনী বাসাতে থাকার নিমন্ত্রণ, এবং প্রত্যেক বিহারীর সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য পীড়াপীড়ি।

কুম্ভমেলায় মঙ্গল শর্মার মাধ্যমে ছেলে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে পরিচয়। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া ত্রিপুরার গোলমালের জন্য পরিবারসহ তাঁহাদের নিকট গিয়া থাকার সাদর আহ্বান। আর যাদের ভাই, বোন, পিতা কিংবা পুত্র ত্রিপুরার বাহিরে আছেন তাঁহারা নিজেদের আত্মীয় স্বজনকে ত্রিপুরা হইতে সরাইয়া লইয়া

যাইতে কতরকম চেষ্টাই করিতেছেন। ফলে বিমানের টিকিট মিলানো ভাগ্যের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। টিকিটের জন্য চাপের ত্রিবেণী সঙ্গম যেন, প্রথমতঃ কমসীটের ককার ফ্রেণ্ডশীপ বলিয়া চাপ দ্বিতীয়তঃ আসামে গোলমাল বলিয়া শিলচর করিমগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের আগরতলা হইয়া কলিকাতা যাতায়াতের জন্য চাপ। তৃতীয়তঃ ত্রিপুরার গোলমালের জন্য যাত্রীসংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত চাপ।

ফাষ্টফ্লাইটের ভীড় পরিষ্কার হউক চিন্তা করিয়া আমি সেদিন ৮ই আগষ্ট শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটায় এয়ার লাইন্স্ অফিসে যাই। এয়ার লাইন্সের যে কয়জন কর্মচারী কাজ করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বাদলদাকে দেখিয়া বুকে কিঞ্চিৎ জলের ও বলের সঞ্চার হয়। বাদলদার মুখ বরাবর একটি চেয়ার দখল করিয়া আমি চুপচাপ বসিয়া থাকি। আমার ডানদিকে বাঁদিকে বহুলোক বাদলদার সঙ্গে যে যার কাজ সারিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমি কিছু বলি না চুপচাপ আছি। প্রায় সাড়ে নয়টা নাগাদ টিকিট্ কাউন্টার ফাঁকা হইলে বাদলদা বলিলেন—

—তুমি? তুমি কি চাও?

—টিকিট। কলিকাতার।

বাদলদা বাঁ দিক হইতে একটি ঢাউসমাপের খাতা লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন—কবের?

—আজকের। সেকেণ্ডফ্লাইট।

একথা শুনার শুনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ ঢাউসমাপের খাতাটি সশব্দে বন্ধ করিয়া আমার মাথা খারাপ, না তিনি কানে গোলমাল শুনিতেছেন এরূপ মুখভাব করিয়া আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন।

—আজকে? সেকেণ্ডফ্লাইট? না? আজ ত দূরের কথা, আগামী সাতদিনে কোন ফ্লাইটে কোন টিকিট নাই। আর সেকেণ্ড ফ্লাইটের চাহিদা সবচেয়ে বেশী, অতএব সেকেণ্ড ফ্লাইটে পনেরো দিনের মধ্যেও টিকিটের আশা করিতে পারে না।

বিনীত ভাবে বেশ রস করিতে করিতে বলিলাম—আপনি টিকিট দিবেন। আমি টাকা দিব। ব্যাস। আমি ওকে টিকিট চাহিতেছি না। আপনি টিকিট দিন আমি চান্স নিব। আজ সেকেণ্ড ফ্লাইট, নাইট ফ্লাইট আবার কাল মর্নিং, সেকেণ্ড, নাইট যখন যাওয়া সম্ভব হয় যাইব। আপনি রিকোয়েষ্ট টিকিট দিন। এবার যেন বাদলদার কিছুটা করুণা হইল। সেই ঢাউসখাতাটি খুলিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিলেন "অলরেডি ওয়েটিং লিষ্ট এ দশজনের নাম বুক করা আছে। ২।৮

জনের চান্স হইলেও হইতে পারে। সেকেণ্ড ফ্লাইটে প্রায় সবাই যায়। খালি প্রায় থাকে না।"

"আমি ওয়েটিং লিষ্টের এগার নম্বরে থাকিলে আপনার আপত্তি নাই তো?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি যা ইচ্ছা হয় কর।" বলিতে বলিতে তিনি আমাকে টিকিট দিলেন।

সেদিন এয়ার লাইন্সের গাড়ীতে করিয়া বিমান বন্দরে যাই। গাড়ী হইতে নামিয়া মূল দালানে প্রবেশ করিতে না করিতেই শুনিতে পাই এয়ার লাইন্সের কর্মী বন্ধুবর দীপক দেবশর্মা চিৎকার করিয়া কাহাকে যেন বলিতেছে আর সবাইকে চান্স দিলেও কানাই চক্রবর্তীকে দেওয়া যাইবে না। বুঝিলাম সবই সেকেণ্ড ফ্লাইটেই যাইতেছি। পরে শুনিয়াছি এগারোটা, এগারোটাই সীট খালি ছিল। এই টিকিট সংকটের দিনে এগারজন যাত্রী কেন যাত্রা বাতিল করিয়া আমাদের কলিকাতা যাওয়ার পথ সুগম করিয়াছিল কে বলিবে? তীর্থযাত্রা পুরুষকার না দৈব নির্ভর?

পরের দিন ৯ই আগষ্ট সকালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে রিজার্ভেশন চার্ট দেখিয়া আর দেরী করি করি নাই সোজা "ফেয়ার্লি প্যালেস।" শিয়ালদহ চার্টে দেখিলাম ২১শে আগষ্ট পর্যন্ত ৭১ আপ জম্মু তাওয়াইয়ে টিকিট নাই। হিমগিরির টিকিট আগষ্ট মাসেই নাই।

ফেয়ার্লি প্যালেসে লম্বা লাইনে ক্রমে ক্রমে কাউণ্টারের নিকটে আসিয়া হিমগিরির টিকিট চাহিলাম। কাউণ্টার হইতে বলিল, চান্স লইতে পারেন। পরে খাতাপত্র দেখিয়া জানাইল, চান্স এ নাম রাখা আর সম্ভব নয়। পঁচাত্তর জনের নাম বুক হইয়া আছে। বলিলাম—"দেখুন টিকিট আমি ঠিকই পাইব। কেদারনাথে যাওয়ার সময়ও এই ফেয়ার্লি প্যালেস হইতেই বলিয়াছিল টিকিট নাই, পরে খাতাপত্র দেখিয়া বাহির হয় টু-টায়ারে শুধু সীটিং একটি আসন আছে। ডুন-এ প্রথম রাত বসিয়া কাটাই, পরের রাতে স্লিপিং বার্থ পাই। আর এবার অমরনাথ যাইতেছি থ্রি টায়ারে টিকিট পাইব না, এ একটা কথা? আচ্ছা, আপনাদের কোটা কখন ছাড়ে তখন না হয় চান্স নেব।

—আপনি অমরনাথের তুষার লিঙ্গ দর্শন করিতে যাইতেছেন? একটা? কাল বারটার মধ্যে আসুন। একটা টিকিট কোন উপায়ে ম্যানেজ হইয়া যাইবে।

বেশ খুশি মনে চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে একটি পর্যটন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আসি। অমলবাবুর নাম তাহাদের দলে লেখানো গেল না। কথায় কথায় ফেয়ার্লি প্যালেসে টিকিট সম্বন্ধে যে কথা হইয়াছে তাহা জানাইয়া নিজকে আরও নিশ্চিত করার জন্য রেলের বুকিং এজেণ্টদের কাহারও ঠিকানা তাহাদের জানা থাকিলে আমাকে দিতে অনুরোধ করিলাম।

—আপনি একা, আর কথা যখন দিয়াছে তখন টিকিট অবশ্যই পাইবেন। তবে বারটায় না গেলেও চলবে। তাঁদের অফিসে কোন কোটায় কত টিকিট অবিক্রীত আছে তাহা বারটা নাগাদ আসে। সার্টিং হইয়া কাউণ্টারে আসিতে আসিতে দুইটার পর। আপনার দুইটা আড়াইটার পর গেলেও চলবে।

না জানিয়া পরের উপকার করিতে গেলেও বিপদ হয়। আমার ভালর জন্যই ভদ্রলোক ঐরূপ বলিয়াছিলেন। বারটার মধ্যে ফেয়ার্লি প্যালেসে গিয়া অহেতুক দুই ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে যেন না হয় তার জন্যই ভদ্রলোক আমাকে বলিয়াছিলেন। আমিও পরদিন ১০ই আগষ্ট রবিবার দুইটা দশ নাগাদ ফেয়ার্লি প্যালেসে পৌঁছিয়া বেকুব বনিয়া যাই। সামনের দরজা বন্ধ। কাঁচে মাথা ঠেকাইয়া চক্ষের দুই দিকে হাত দিয়া আলো আটকাইয়া ভিতরে দেখি তখন লাইনে লোক দাঁড়ানো। এক জনের পর আর একজন টিকিট কিনিতেছে। বাহিরের সিঁড়ির একপাশে পা ছড়াইয়া বসিয়া উর্দ্দিপরা এক দারোয়ান আপন মনে খৈনী বানাইতেছে। তাহাকেই অনুরোধ করিলাম,—দেখাজী! আমার সঙ্গে হিমগিরি কাউণ্টারের বাবুর আলাপ আছে। আমার টিকিট রাখিবে বলিয়াছে। একটু দরজাটা খোল। আমি ভিতরে যাই।

"আপকো বলা হায় না, টিকিট রাখেঙ্গে? তব জরুর রাখেগা, ফিকর মৎ কি কি জিয়ে। কাল সুব্বা দশমে আখানা? আপকা টিকিট জরুর মিল যায়গা।" আর একটি কথাও ব্যয় না করিয়া সে বাঁহাতে রক্ষিত সদ্য তৈয়ারী সেই মহামূল্যবান খৈনীতে ডান হাতের তিনটি মাত্র আঙ্গুল দিয়া অতি আদরের সহিত আস্তে আস্তে চাপর দিতে লাগিল।

সাবাস্ বেটা ফেয়ার্লি প্যালেসের দারোয়ান। রাস্তা ঘাটে কত ধাপ্পা দিয়া সফল হইয়াছি। কিন্তু এখানে এক্কিলা বেটারে শা লাগাইতেই পারিলাম না।

পরদিন ১১ই আগষ্ট সোমবার সকালে ফেয়ার্লি প্যালেসে গিয়া জম্মু তাওয়াইয়ের লাইনে দাঁড়াই। হিমগিরি কাউণ্টারে অফিসের কোন লোক নাই—লাইনও নাই। যখন আমি কাউণ্টারের সামনে আসিলাম। একই কথা—পনেরো তারিখ পর্যন্ত টিকিট নাই। অমরনাথ বলিয়া এই বুকিং কেরাণীকেও নরম করিলাম।

—আপনার একটা মাত্র টিকিট? কাল যেতে পারবেন? একটা থ্রি টায়ারে আছে।

জম্মু-তাওয়াইয়ের টিকিটই আমি মনে মনে চাহিতেছিলাম। হিমগিরি একটা "সুপার ফাষ্ট" দুর্বলতা মাত্র। আমি এয়ার পোর্ট হোটেলের উল্টা দিকে মতিলাল কলোনীতে দিদির বাড়ীতে থাকি। সেখান হইতে হিমগিরি ধরিতে হইলে আগের

রাত হইতে হাওড়ায় থাকিতে হইত। সে তুলনায় শিয়ালদহ দুপুর হইতে ট্রেন ধরা আমার পক্ষে অনেক সুবিধা জনক।

১২ই আগষ্ট মঙ্গলবার দুপুরে শিয়ালদহ হইতে জম্মু তাওয়াইতে অমরনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করি। ১৪ই আগষ্ট বুধবার সকাল দশটায় প্রায় চার ঘণ্টা লেট্ করিয়া ফিফটি ওয়ান আপ তাওয়াই ষ্টেশনে পৌঁছে। পথে উত্তরপ্রদেশে রেল লাইনের দুইদিকে জল, শুধু জল দেখিয়াছি। কোন কোন স্থানে শুধুমাত্র রেল লাইনটি জলের উপর। একবার ত লাইনের উপর দিয়া বন্যার জল বহিয়া যাইতেছ, তার উপর দিয়া আমাদের ট্রেন প্রায় শূন্য মাইল গতিতে ঐ জলে ডোবানো অংশটি অতিক্রম করিয়াছে। সন্ধ্যার পর মোরাদাবাদ ষ্টেশন অতিক্রম করি। ষ্টেশনে কোন বৈদ্যুতিক আলো নাই, যাহারা তরিতরকারি বিক্রয় করে তাহাদের জালানো মোম, আলোর একমাত্র উৎস। আমার লোডসেডিং অভ্যস্ত চোখে তখন আদৌ কিছু অস্বাভাবিক লাগে নাই। মোরাদাবাদ হইতে কামরায় উঠেন সদ্য বিবাহিত এক মুসলমান দম্পতি। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম মোরাদাবাদ জলিতেছে—দাঙ্গা, আগুন, গুলি, মৃত্যু। আমার সঙ্গে ঐ দম্পতির খুব ভাব জমিয়াছে। পরস্পর পরিচয় বিনিময় করিলাম। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। পোষাক আসাক, কথাবার্তা, চালচলন, ভদ্র মহিলার মেহন্দি রাঙ্গানো হাত জানাইয়া দিতেছিল তাহারা সদ্য বিবাহিত। ভদ্র মহিলা আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। ভদ্রলোক ঔষধ কোম্পানির ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি। প্রবাদমতে, বিবাহের দ্বিতীয় বর্ষ হইতে স্ত্রী কথা কয়। কিন্তু এ মহিলা, সুযোগ পাইলে কথা বলে এমন নহে, সুযোগ সৃষ্টি করিয়া বা বিনা সুযোগেই কথা আরম্ভ করিতে পারদর্শিনী। আমাকে জানাইলেন, কাশ্মীরে মধুচন্দ্রিমা যাপন করিতে যাইতেছেন। জম্মু হইতে শ্রীনগরে প্লেনে যাইবেন। যে কথাটি আমাকে সবচেয়ে বেশী অবাক করিয়াছে, যে কথাটি পাঠককে শুনানোর জন্য এই দম্পতি কাহিনীর অবতারণা তাহা নিম্নরূপ—

"আজ মাত্র চার পাঁচ দিন হয় আমাদের বিবাহ হইয়াছে।" ভদ্রমহিলা উবাচ।

আমরা তাওয়াই শুনিয়া অভ্যস্ত, তাওয়াই বলিয়া অভ্যস্ত। ট্রেন হইতে নামিয়া দেখিলাম 'তবী', তাওয়াই নয় তবী, স্থানীয় মানুষ কিন্তু তবী বলে। পূর্বে ধারণা ছিল ট্রেন জম্মু পর্যন্ত যায়, এখন দেখিতেছি তাওয়াই বা তবী পর্যন্ত। তবী হইতে জম্মু তিন কিলোমিটার। টাঙ্গা, অটোরিক্সা, বাস ইত্যাদি যান তবী-জম্মু পথে সব সময় পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

আমার আবার আরেক স্বভাব। ট্রেন হইতে নামিয়াই ভীড়ে ধাক্কা-ধাক্কি করিতে করিতে তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের বাহির হইয়া, প্রচণ্ড দরাদরি করিয়া, ধরা যাক্ আড়াই টাকায় রিক্সা ভাড়া দিয়া হোটেলে উঠার চোয়, ট্রেন হইতে নামিয়া কিছুটা বিশ্রাম করিয়া চোখে মুখে ঘাড়ে জল দিয়া শরীর ঠাণ্ডা করিয়া, এক কাপ চা খাইয়া বেশ ধীরে ধীরে ফাঁকা ষ্টেশন চত্বরে আসিয়া একই দূরত্ব, প্রায় বিনা দরাদরিতে, টাকা, পাঁচসিকা রিক্সা ভাড়ায় হোটেলে আসিতে পছন্দ করি। ট্রেনের অন্য যাত্রীরা যখন পরি কি মরি করিয়া জম্মু কিংবা সোজা শ্রীনগরের বাস ধরার জন্য বিরাট ষ্টেশন চত্বরে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দিপনার সহিত পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা এবং হৈ চৈ করার ব্যাপারে পারস্পরিক আন্তরিক সহযোগিতা করিতেছে তখন আমি আমার স্বভাব অনুযায়ী ষ্টেশনের মধ্যে চা সহযোগে বিশ্রামরত। আমার কোন তাড়া, কোন উদ্বেগ, নাই। ষ্টেশনে দালানে দোতলায় রিটায়ারিং রুমের বিরাট বন্দোবস্ত দেখিয়া ঠিক করিলাম রুম কিংবা ডর্মেটোরিতে শয্যা পাইলে এখানেই থাকি। অনুসন্ধানে জানিলাম, না রুম না ডর্মেটরি কোথাও কিছু খালি নাই, সব লোকে ভর্তি কিংবা পূর্ব হইতেই বুক করা। ঠিক আছে, এখন থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হয়। আমি মাত্র পঞ্চাশ পয়সায় শেয়ার ভটভটীয়ায় তবী ষ্টেশন হইতে জম্মু বাসাড্ডায় আসি। বাসড্ডা হইতে রঘুনাথ মন্দির ধর্মশালা।

অমরনাথ যাইতেছি। একা। একদম নির্ভয় ছিলাম বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। লোক বসতি ছাড়াইয়া বরফের রাজ্যে পাঁচ দিনের হাঁটা পথ। কেদার যাত্রা সে তুলনায় কত ভাল ছিল। তিন দিনের পথ— যাইতে দুই দিন, আসিতে এক দিন। আর এবার যাইতে তিন দিন, আসিতে দুই দিন। সেই সময় সঙ্গে প্রচুর লোক, কুণ্ডু স্পেশালের দল, দলের সহিত ডাক্তার, থাকা খাওয়ার চিন্তা ম্যানেজার মুখার্জীর। সেই কুণ্ডু স্পেশালের ছত্রচ্ছায়ায় নিরাপদ আমি সেবারই সীতাপুর হইতে হাঁটা পথে যাত্রা করার আগে সহ যাত্রিদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম,—দেখুন মশায়, দোহাই আপনাদের, যদি কেদারে মারা পড়ি তবে আমাকে পুড়াইবেন না বা ভাসাইবেন না। রাস্তা হইতে একটু দূরে ফেলিয়া দিবেন। ছয় মাস বরফের নিচে থাকিবে, বাকী ছয় মাস বরফের উপর।

আপনাদের কাছে কেদারে উঠার আগে আমার এইটুকু মাত্র অনুরোধ। পরে দেখিয়াছি কেদারে শব সংকার বলিতে বুঝায় মৃতের মুখে একটু আগুন দিয়া দেহটিকে টানিয়া মন্দাকিনীর জলে ফেলিয়া দেওয়া। এত লাকড়ী কোথায়? যে মৃতদেহ পুড়াইবে?

যদিও— "পুড়া, গাতা ভাসা,
সবই আমার খাসা।"

—এই মন্ত্রে আমি দীক্ষিত, তবু সেইবার কেদার যাত্রার আগে, আগুনে পুড়ানো, মাটিতে সমাধি, বা নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া তিনটি পথই বাতিল করিয়া পার্শীদের মত মৃতদেহ রাখিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। পার্শীদের মৃতদেহ সমাধি স্থানে রাখিতে না রাখিতেই শকুনে শেষ করে। কেদারে সুবিধা আছে, শকুন, কাক, শৃগাল কিছুই নাই। যতদিন বরফের নীচে আমার মৃতদেহ থাকিবে ততদিন ফ্রীজে রাখার চেয়েও দেহ টাটকা থাকিবে। আর যে সময় বরফ গলিয়া দেহটি উপরে আসিবে তখন ও শূন্য ডিগ্রিতে কোনরূপ বিকৃত আসিবে না। তোফা থাকিব বা আমার দেহটি তোফা থাকিবে।

এক গ্রামে এক স্বচ্ছল বিধবা মহিলার একটি স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ছেলে ছিল। বয়স হইলে ঐ ছেলের বন্ধু-বান্ধব তাহাকে উস্কাইয়া বিবাহে রাজি করায়। বন্ধুরা বিবাহের যাবতীয় কাজ করিয়া দিবে এরূপ অভয় ছেলেটিকে দিয়াছিল। কার্য্যকালে দেখা গেল, বিবাহের নামে ছেলের বাড়ীতে বেলায় বেলায় ভোজনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে করিতেই তাহারা এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে যে তাহাদের দ্বারা আর অন্য কোন কাজ করা হইয়া উঠে না। যত পরিশ্রম সবই যাইতেছে ঐ বিধবা মহিলার উপর দিয়া। বিবাহের সমস্ত ঝামেলাও তিনিই বহন করিতে-ছিলেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে বুদ্ধি পরামর্শের জন্য ছেলেকে ঐ গ্রামেরই এক বাড়ীতে পাঠায়। ছেলে মা এর নির্দ্দেশ মত ঐ বাড়ীর কর্ত্তাকে মা এর ঝামেলা, বন্ধু-বান্ধবের কাণ্ড কারখানা সব বিস্তারিত বলিয়া, শেষে নিজের বুদ্ধি খরচ করিয়া বলে,—এখন ত দেখা যাইতেছে, জেঠামশায়, আমার বিয়েটা আমাকেই করিতে হইবে। "হ্যা বাবা," বেশ আশ্বাসের সুরে গ্রাম সম্পর্কের জেঠা বলেন "অবস্থা দেখিয়া ত বেশ মনে হইতেছে, তোমার বিয়ে তোমাকেই করতে হবে।"

অমরনাথের পথে আমার অবস্থাও ঐ ছেলেটির মত—আমার হাঁটা আমাকেই হাঁটিতে হইবে। পথে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইবে, অসুখ-বিসুখে নিজের যত্ন নিজেকেই লইতে হইবে, কোথায় গেলে, এমন কি প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে গেলেও নিজের মালের দায়িত্ব নিজেকেই বহন করিতে হইবে।

ভাঁসার মধ্যে একমাত্র পথে মারা গেলে নিজের সৎকার নিজেকে করিতে হইবে না। এমন চমৎকার ভরসা থাকা সত্ত্বেও সাহস আপনা হইতে খাটো হইয়া আসে। তখন জম্মু বাসাড্ডায় দাঁড়াইয়া চিন্তা করি—দলছাড়া এ পথ একা পাড়ি দিতে যাওয়া বোকামি। আমার ও কোন না কোন দলের সঙ্গে যাওয়া উচিৎ, আরও চিন্তা করিলাম, যেই দলের সঙ্গে যাইব সেই দলের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি মিলিত হওয়া যায় ততই মঙ্গল। জম্মু, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মনোমত দল পাইতেছি ততদিন হোটেলে না উঠিয়া ধর্মশালায়, ধর্মশালায় থাকিব। কেন না হোটেল হইতে ধর্মশালায় তীর্থযাত্রী দলের সাক্ষাৎ পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। যেমন—চিন্তা—তেমন সিদ্ধান্ত। আমি জম্মুতে রঘুনাথ মন্দির সংলগ্ন ধর্মশালায় উঠিলাম।

আমার দল বাছাই—পর্ব ও কম অদ্ভুত নয়। নিজে বাঙ্গালী হইয়াও বঙ্গবাসীকে সযত্নে এড়াইয়া চলি। আমার দুর্ভাগ্য বাহিরে যত বাঙ্গালীর সঙ্গ আলাপ হইয়াছে তাহাদের কেহ কেহ অত্যন্ত চালবাজ। জ্ঞানে কম আওয়াজ ছাড়ে বেশী। যে বিষয়ের উপর আলোচনা হইতেছে সেই বিষয়ে বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকিলেও কোন কোন বঙ্গ সন্তান আওয়াজ ছাড়িতে এতটুকু দ্বিধা করে না। একদম নির্ভেজাল আওয়াজ ছাড়িতেছে, ধরা পড়িলে ও বঙ্গসন্তান তিলমাত্র লজ্জিত হয় না। ১৯৫৮ সালের রাজগীরের একটি ঘটনা আমি আজ ও মন হইতে মুছিতে পারি নাই। সন্ধ্যার পর রাজগীরের তপ্তকুণ্ডে স্নান করার প্রশস্ত সময়। এই কুণ্ডের জলে স্নান করিলে যে কোন চর্মরোগ ভাল হয়। এমন কি কুষ্ঠরোগীও ভাল থাকে, অর্থাৎ ঘা আর বাড়ে না। এ কারণে দিনের বেলা যত চর্মরোগী ও কুষ্ঠ রোগীতে প্রধান কুণ্ডটি ভর্ত্তি থাকে। তাঁহাদের সঙ্গে একই সময়ে একই কুণ্ডে স্নান করিতে হয়। কুণ্ডের উপর চারটি পথে গরম জল আসিতেছে। সেখানে আগে শরীরকে গরমে অভ্যস্ত করিয়া কুণ্ডে আসিতে হয়। না হইলে কুণ্ডে থাকা যায় না, কুণ্ডের জল এত গরম। দিনের বেলা যেই চারটি ধারায় গরম জল আসিতেছে তাহার প্রত্যেকটি জলধারার নীচে ও ভীড় থাকে। সন্ধ্যার পর লোক থাকে না বলিলেই হয়। এখন কিরূপ লোক হয় বলিতে পারি না। আমি ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা বলিতেছি। অন্যান্য দিনের মত সেদিন সন্ধ্যায় আমরা তিনজন কুণ্ডে স্নান করিতে যাই। দেখি চারজন লোক চারটি জলধারার নীচে বসিয়া স্নান করিতেছে ও পরস্পর 'ছ' 'ছ' করিয়া আলাপ করিতেছে। নেহাৎ মজা করার জন্য সঙ্গের অন্য দুইজনকে কথা বলিতে বারণ করিলাম এবং সবাই জামা গেঞ্জিও ছাড়িয়া স্নানে প্রস্তুত হইলাম। এবার আমি অতি সাধারণ গ্রাম্য লোকের ন্যায় কৃত্রিম ভয় মিশ্রিত স্বরে হিন্দিতে প্রথম ব্যক্তিকে

অল্প স্নান করার জন্য একটু স্থান দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। বলা ভাল, ঐ চারটি জলধারার প্রত্যেকটিতেই স্বচ্ছন্দে তিন চারজন একসঙ্গে স্নান করিতে পারে। দিনের বেলায় এক একটিতে এক সঙ্গে দশ পনের জনকেও স্নান করিতে দেখিয়াছি।

আমাকে নিকটে আসিতে দেখিয়াই প্রথম ব্যক্তি সবটা জলধারা দখল করিয়া বসিয়াছে। আমার অনুরোধ শুনার পর জানাইল, এখানে নয়, ওখানে বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিল। আমি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট যাই, একই স্বরে একই অনুরোধ রাখি এবং একই ফল পাই অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয়কে দেখায়, চতুর্থকে। চতুর্থ প্রথমকে। আর উহাদের সে কি হাসি! তাহারা আমার নিরীহভাবকে যথেষ্ট উপভোগ করিয়াছে। খালি গায়ে ডিসেম্বরের ঠাণ্ডায় মজা আর বেশীক্ষণ মজা রহিল না। আর একবার ভিন্ন স্বরে প্রত্যেককে অনুরোধ করিলাম এবং এই সুযোগে প্রত্যেককে নিকট হতে দেখিলাম। বক্সিং-এ আমার দখল ছিল। নিকট হইতে দেখিতেছিলাম কাহাকেও দ্বিতীয় ঘুষি দেওয়ার আদৌ প্রয়োজন হইবে কিনা। মারামারি ব্যাপারে আমার নিজের উপর গভীর আস্থা ছিল। নিঃসন্দেহ হইলাম দ্বিতীয় ঘুষির প্রয়োজন হইবে না। এবার আমরা নিজেদের জামা, গেঞ্জি যেইস্থানে রাখিয়াছিলাম সেইস্থানে আসিলাম। আমাদের জামা, গেঞ্জির স্তূপের নিকট তাহাদের ছাড়া জামা কাপড়ের স্তূপ। পা দিয়া তাহাদের কাপড়গুলিকে দলা পাকাই। স্নানের জন্য তাহাদের নিকট জায়গা না পাইয়া রাগে অপমানে আমার দুই কান দিয়া গরম বাতাস বাহির হইতেছিল যেন। ফুটবল লব কথার মত তাদের কাপড়ের দলাটি স্নানরত বা স্নানের ভানরত প্রথম ব্যক্তির গায়ের উপর ফেলিয়া আমার অকৃত্রিম বাঙ্গাল ভাষায় চিৎকার করিয়া বলি,—কুত্তার বাচ্চা, উঠ্। এক-টা কতা কই বি ? বাপের নাম ইত্যাদি কত না গালিগালাজ দিলাম।

কথা বলতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তাহারা কথা বলিয়াছিল। পাঠক বিশ্বাস করুন, তাহারা বলিয়াছিল, দাদা! আপনি বাঙ্গালী? আগে বলবেন ত?

আমার লজ্জা ও দুঃখের অভিজ্ঞতা হইতে আর একটি ঘটনা। ঘটনাস্থল হরিদ্বার, কনখল, হৃষীকেশ, লক্ষ্মণ ঝোলা ইত্যাদি অঞ্চল। দুই বঙ্গ সন্তান একত্রে দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে! দুর্ভাগ্য কাহাকে বলে, আমরা যেইদিন কনখল যাই সেইদিন তাহারা ও সেখানে যায়। সেইদিন হৃষীকেশ লক্ষ্মণ ঝোলায় যাই তাঁহারাও ঐ স্থানে যায়। আর গায়ে পড়িয়া উপদেশ, প্রতি কথায় কত বেশী জানে সে ভাব প্রকাশ। ইহাদেরই একজন টাটা সেন্টারে কাজ করে। কি নির্লজ্জ অহমিকা! তাহার বলার ধরণে মনে হয় এত বড় দালাল বিশ্বে আর নাই এবং

এইদালানটির মালিক সে নিজে। ১৯৭৪ সালের নভেম্বরের ঘটনা। একবার উঁহাদের মধ্যে একজন আমাকে তাহার অফিসে যাইতে অত্যন্ত কৃত্রিম অনুরোধ করে। ঐ টাটা সেণ্টারে গেলে উপর হইতে মানুষ, বাস, ট্রাম এই এতটুকু এতটুকু দেখায়। —ছে এক অভিজ্ঞতা খছায়। দেখেন নি তো কখনও।

পিত্তিজ্বলার পক্ষে শেষের কথাটিই যথেষ্ট। বুঝুন ঠেলা। প্রায় প্রতি বৎসর প্লেনে যাতায়াত করি। আর আমাকেই বলে কিনা মানুষ, ট্রাম, বাস এই এতটুকু এতটুকু দেখায়! তার ভাছায় (ভাষায়) ডাবল ডেকার পর্যন্ত এতটুকু। আমার সঙ্গী বীরচন্দ্রদার (সংসদ সদস্য, শ্রী বীরচন্দ্র দেববর্মা) মুখে মিঠি মিঠি হাসি। পিত্তিজ্বালা বাড়াইতে বীরচন্দ্রদার হাসিটিও যথেষ্ট সহায়ক।

কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। মুসৌরী এক্সপ্রেসে রাত্রে হরিদ্বার হইতে ফিরিতেছি। টিকিট বা রিজার্ভেশানের চিন্তা নাই। এম, পির সঙ্গে বাহির হইয়াছি। ভি, আই, পি বুকিং। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সেই দুই শ্রীমান।—"টিকিট টিকিট কেটেছেন? রিজার্ভেশন পেয়েছেন?"

আমার তরফ হইতে শুধু উপর নীচে দুই পার্শ্বে মাথা নাড়া। আমার কথা না বলিয়া শুধু মাথা নাড়ার ধরণ দেখিয়া তাদের ধারণা হয় আমি ঘুষ দিয়া সীট্ রিজার্ভ করিয়াছি। এখন স্বীকার করিতেছি, আমার মাথা নাড়ার ধরণটা খুব স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করার জন্য ছিল না। এমন কায়দায় মাথা নাড়াইতে ছিলাম যেন হাঁ-ও বুঝা যায় আবার না-ও বুঝা যায়। তাহাদের দিল্লী হইতে কলিকাতার রিজার্ভেশন সহ টিকিট কাটা আছে। আগামী কাল বিকালে দিল্লী হইতে রওয়ানা হইবে। আজ রাত্রের ঘুম অত্যন্ত জরুরী। স্লিপিং বার্থের জন্য ভাল পয়সা খরচ করিতে রাজি। এখন আমি অনুগ্রহ করিয়া আমার সোর্সের মাধ্যমে উহাদের একটা গতি করিলে অশেষ উপকার হয়। শ্রীমানদ্বয় এখন আর কোনরূপ জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে না। আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে! বেলুনের বাতাস শেষ। বেশ চিত্ত সুখে আছি। এমন সময় ট্রেন আসে। অবাক হওয়ার মত ঘটনা—থ্রি টায়ার বেশ ফাঁকা। কামরার কণ্ডাক্টার নীচে নামার আগেই আমি কামরায় উঠিয়া দুইটি বার্থের জন্য বলি। কণ্ডাক্টর ও এক কথায় রাজি। আমার হাতের ইশারায় তাহারা কামরায় উঠিয়া আসে। তখনই কণ্ডাক্টর তাহাদের বার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বার্থ নাম্বার দেয়। ট্রেন ছাড়ার আধ ঘণ্টা পর চলন্ত ট্রেনে এক শ্রীমান আমার নিকট আসিয়া পরামর্শ চায়—দাদা, এক রাত্রের ব্যাপার ত। আমাদের রিসিট চাই না। ৩/৪ টাকা দিলে হয় না?

কি বলিব? নিজের বার্থে মাথা ঢাকিয়া কম্বলমুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলাম।

আর একটি ছোট্ট কথোপকথন। সেদিন বাসে হৃষীকেশ ষ্টেশনে ফিরিতেছি। দেব প্রয়াগের পর হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি পরিতেছিল। যতই হৃষীকেশের দিকে আসিতেছিলাম বৃষ্টির বেগও যেন ততই বাড়িতেছিল। কি বড় বড় এক একটি বৃষ্টির ফোঁটা। বৃষ্টির ছাছ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য জানালার কাঁচ উঠাইয়া দিয়াছিলাম। মুনি-কা—রেতিতে রাস্তায় রীতি মত জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে! হৃষীকেশ ষ্টেশনে আসিয়াও বৃষ্টির জন্য ও বটে আবার রাস্তায় এক হাটু জলের জন্য ও বটে বাস হইতে নামিয়া ষ্টেশনে আসিতে পারিতে ছিলাম না। কিছুক্ষন বাসে বন্দী অবস্থায় থাকার পর দেখি বৃষ্টি প্রায় নাই, সামান্য গুড়ি গুড়ি। রেলষ্টেশনে যাইতে পারিলে ও বন্দীদশা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু রাস্তায় যে পরিমান জল জুতা, মোজা, কাপড় বাঁচানো অসম্ভব। আমাদের বাস হইতে ষ্টেশনের দূরত্ব কিছুই না, এক দৌড়ের রাস্তা মাত্র। সে সময়ের ভ্রমন সঙ্গিদের একজনের খুব "কোলকাতা, কোলকাতা, কোলকাতা, আমাদের কোলকাতা" বাতিক ছিল, আর আমাকেই শুনাইত।

এবার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাপিল। কোলকাতা, কোলকাতা ওয়ালাকে একটু বাজাইতে হয়। গলার স্বর যতখানি কোমল করা সম্ভব ততখানি কোমল করিয়া শিশু সুলভ সবলতায় জানিতে চাহিলাম—আচ্ছা দাদা, হৃষীকেশ কি আপনাদের কোলকাতা করপোরেশনের আণ্ডারে?—কেন বলুন ত? স্পষ্ট বুঝা গেল আমার কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই আঁচ করিতে না পারিয়া তিনি অত্যন্ত অবাক হইয়াছেন।

—না বলছিলাম, মাত্র কয়েক ঘণ্টাখানেক বৃষ্টি, তাতেই রাস্তায় এক হাটু জল ......। —দেখেছেন? দেখেছেন? চকবর্তী বাবু কি বলছেন?

ভদ্রলোক আমার কথা শেষ করিতে দেন নাই, কথার মধ্যেই বাধা দিয়াছেন। নিজে কি বলিতে চান তাহা ও সম্পূর্ণ বলেন নাই। কত বলিব? তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রচুর। তবে ব্যতিক্রম ও আছে। তাহাদের অনেকের সঙ্গে এখন—আমার সম্পর্ক নিজের আত্মীয়ের চাইতেও বেশী।

আবার পূর্ব কথায় ফিরিয়া আসি। রঘুনাথ মন্দির ধর্মশালার হলে স্থান পাই। সেখানে স্নান করিয়া বাহিরের হোটেল আহার করিয়া আসিয়া দেখি কোট শার্ট পরা অবাঙ্গালী ভদ্রলোক মনোযোগের সহিত নোটবুকে কি যেন টুকিতেছেন। চারিদিকে কাগজপত্র ছড়ানো। প্রয়োজন বোধে পার্শ্বে বিশ্রামরত লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন। আমি কম্বল পাতিয়া বিশ্রাম করার জন্য লম্বা হই।

আলাপ যতটুকু বুঝিলাম তাহারা একদল ভুক্ত। নিরীহ সাধারণ মানুষ। যে ভদ্রলোক নোট করিতেছেন তিনি ডাক্তার ও দলনেতা। আপাততঃ শ্রীনগর

কি কি দর্শনীয় আছে বিভিন্ন কাগজপত্র হইতে উদ্ধার করিয়া তারই একটি তালিকা প্রস্তত করিতেছেন। অমরনাথ যাত্রী। তাঁহাদের কাজ তাঁহারা করিতেছিলেন আমার বিশ্রাম আমি। ইহারই মধ্যে একবার আমার কাগজপত্র হইতে Kashmir Tourist Book টি—ঐ ডাক্তার ভদ্রলোককে আগাইয়া দেই।

—দেখুন, এই বইটি আপনার কোন সাহায্যে আসে কিনা। আমার কাছে এই বইটি ছাড়াও কাশ্মীর বিশেষত অমরনাথের উপর আর ও কাগজপত্র ছিল। সব ডাক্তারকে দিলাম।

এক ঝলক দেখিয়াই ডাক্তার ও সঙ্গের কেহ কেহ বুঝিল তাঁহাদের এত কষ্টের যোগাড় করা তথ্য সমুহ আমার দেওয়া বই সমূহের তথ্যের ধারে কাছেও আসিতে পারে না। আমি অমরনাথ যাত্রী কিনা একসঙ্গে কয়েকজন জানিতে চাহিল। আমি অমরনাথ যাত্রী শুনিয়া যার পর নাই খুশি হইল। সঙ্গে কেহ নাই, একা যাইতেছি শুনিয়া কেহ কেহ অবাক ও হইল। কবে পর্যন্ত রওয়ানা হইতেছি জিজ্ঞাসা করিলে সত্য কথাই বলিলাম।

কিছুই ঠিক করি নাই। মাত্র আজ কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। অষ্টমী দিন গুহায় যাইব এরূপ ইচ্ছা। বেশীক্ষণ আলাপ করিতে হয় নাই আমার কাজ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে জানাইলাম যে, একসঙ্গে যাইতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

—তবে অনুগ্রহ করিয়া আর দেরী করিবেন না। এখনই আগামী কালের বাসের টিকিট কাটিয়া রাখুন। দেখবেন যেন পাঁচ নম্বর বাসের টিকিট হয়। আমরা পাঁচ নম্বর বাসের টিকিট কাটিয়াছি।

আমার চলার বারা—শরীর: অদ্যম্ খলু দেশ ভ্রমণম্। শরীর বাঁচাইয়া সব কিছু। পয়সা বাঁচাইতে গিয়া শরীরের উপর চাপ দিলে হিতে বিপরীত হয়। পয়সা বাঁচা তো দূরের কথা, বিদেশ বিভূঁইয়ে অসুখ বিসুখে শুধু পয়সা নষ্ট হয় এমন নহে, অসুখে পড়িলে মনটা খুব দুর্বল হইয়া পড়ে, ভ্রমণের দফা-রফা। ঐ ডাক্তরের দলের নিকট হইতে কোন আমন্ত্রণ না পাইলে, আমি বিকাল পর্যন্ত বিশ্রাম করিয়া শরীর ঝরঝরা হইয়াছে কিনা দেখিতাম। শরীরের অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাস্, কি টুরিষ্ট বাস বা সাধারণ বাস নির্বাচন করিতাম।

এখন তাঁহাদের আগ্রহে সাধারণ বাসের টিকিট কাটিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি—ইহারই মধ্যে তাঁহারা আমার মূল্যায়ন করিয়া ফেলিয়াছে। আমি পাঁচ নম্বর বাসের টিকিট পাইয়াছি শুনিয়া সবাই স্বস্তি, পাইল। সে-রাত তাহাদের সঙ্গে একই ধর্ম-

শালায় কাটাইয়া ১৫ই আগষ্ট, শুক্রবার ভোর সাতটায় জম্মু হইতে বাসে রওয়ানা হইয়া বিকাল সাতটায় শ্রীনগরে পৌছি।

এ পথের বাস যাত্রার বর্ণনা যত সংক্ষেপ হয় ততই ভাল। এ পথের প্রকৃত বর্ণনা পাইলে অনেকেই কাশ্মীর ভ্রমণের আগে দ্বিতীয় বার চিন্তা করিবেন। দমদম এয়ার পোর্টে কাজ করেন এক ভদ্রলোক, আমার অমরনাথ হইতে ফিরিয়া পথে, মতিলাল কলোনীর দিদির বাড়ীতে, নিজের কাশ্মীর ভ্রমণের তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে করিতে দুই হাত জোড় করিয়া কপাল ঠেকাইয়াছিলেন।—আমার মিসেস রীতিমত কান্নাকাটি করিয়াছে। মিসেসের সে কত অনুনয়, প্লেনে চল বাসে নয়।—কিন্তু প্লেন ত আর মুখের কথা নয়। চাইলেই টিকিট পাওয়া যায়! খবর নিয়ে দেখি তিন মাস সামনে বুকড্। কাশ্মীর এই প্রথম, এই শেষ।

শ্রীনগর আসার আগে হইতেই ঐ দল কোন কিছু করার আগে আমার পরামর্শ নিতেছিল। তাহারা শ্রীনগর আসিয়া দলের নেতৃত্ব অনেকখানি আমার উপর ছাড়িয়া দেয়। শ্রীনগরে আসিয়া আমার পরামর্শ মত সবাই লালচকে আসি। লালচকের ধর্মশালায় দৈনিক ২৫ টাকা ভাড়ায় একটি বড় কোঠা পাওয়া যায়। কোঠাটি দেখিতে আমি, ডাক্তারবাবু ও আরও কয়েকজন ধর্মশালার ভিতরে যাই। দোতলায় রাস্তার দিকে মুখ করা সুন্দর প্রশস্ত কোঠা। আমরা ১৪ জন কেন ২৫।৩০ জন লোক স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারি। জল ও পায়খানার ব্যবস্থা দেখিয়া লালচকে ট্র্যাফিক আইল্যাণ্ডে মালামাল সহ দাঁড়ানো অন্যদের নিকট আসিয়া ডাক্তারবাবু আমাদের এই অল্প সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট দেন, অন্য সদস্যগণ ও ডাক্তারবাবুর কথায় সায় দেয়।

সুন্দর বেশ বড় কোঠা। রান্না করার সুন্দর বন্দোবস্ত। আর এ জায়গাটিও চমৎকার। নীচে নামিলেই হইল। হাতের কাছে সব দোকান বাজার থাকা খরচ মাথাপিছু দুই টাকাও পড়িবে না। অভিজ্ঞতায় বলে তদন্ত কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টই শেষ কথা নয়। তারপরও থাকে সাব কমিটি। ঐ চূড়ান্ত রিপোর্ট বিচার বিবেচনা করে কিংবা দেখি, পে-কমিশনের রসালো রিপোর্ট সেল কমিটির বিচার বিবেচনার পর সবটুকু রস নিঃশেষিত হইয়া শুধু ছিবড়া থাকে। ঐ ছিবড়াই কর্মচারীদিগকে দেওয়া হয়।

এবার ডাক্তারবাবু সহ অন্যান্যরা আমার সম্মতির জন্য আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। আমি ঐ সাব কমিটি বা সেল কমিটির মত সবাইকে নিরাশ করিলাম।

—লক্ষ্য করেছেন কি পায়খানা মাত্র দুইটি। বেশ বড় ধর্মশালা। লোকও প্রচুর। সকালে লম্বা লাইন পড়িয়া যাইবে।

সকালের এই ব্যাপারটি আমার একটি সমস্যা। আমি ত্রিপুরার লোক, ত্রিপুরায় আমার জন্মকর্ম। শুধুমাত্র ত্রিপুরার বড়মুড়া, সুবলসিং বা গজালিয়াতেই মাটির নীচে গ্যাস পাওয়া যায় নাই, এখানকার শতকরা আশি জনের পেটেই গ্যাস। গ্যাসের নীচে যেমন পেট্রোলিয়ামের স্তর থাকে, অনুরূপভাবে কাহারও কাহারও পেট শুধু গ্যাসই নয় তারপরও থাকে আলসার।

দমদমে নিউ কোয়ার্টারসে একটি আড্ডায় আমার যাতায়াত আছে। সেইখানকার বাসিন্দাগণ মূলত এয়ার পোর্ট চাকুরিয়া। কার্য উপলক্ষে তাহাদিগকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে থাকিতে হয়। তাহাদের আলাপের একটি বড় অংশ আন্দামান, ভুবনেশ্বর, গৌহাটি, বাগডোগরা কুম্ভিরগ্রাম, আগড়তলা ইত্যাদি। গরমের দিনে সন্ধ্যার পর কোয়ার্টারের সামনে ফুরফুরে হাওয়ায় ইজিচেয়ারে অর্ধশোয়া অর্ধবসা অবস্থায় গল্পগুজব করিতে খুব ভাল লগে।

লোড সেডিং অভিশাপ মুক্ত অঞ্চল। কিন্তু ঘোড়া দেখিলে বর্তমান যুগেও মানুষ খোঁড়া হয় কিনা কিংবা নাপিত দেখিলে নখ উঠে কিনা জানি না, আমাকে পাইলেই হইল। যত দেশ বিদেশের ভ্রমণের কথা আরম্ভ হয়। দুই দিনেই টের পাইলাম আমার নিকট হইতে কোন স্থানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা শুনা তাদের লক্ষ্য নয়, আমাকে উপলক্ষ করিয়া যে যার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা শুনাইতে চায়, আমার নিকট প্রত্যাশা শুধু সম্মতি, একটু ইতিবাচক মাথা নাড়া।

—আপনি ত দেখেছেন, আপনিই বলুন—বিবি কি মকবরা, তাজ থেকে ফেল্‌না? পানী চাক্কির মাছ! পানী চাক্কির জল! কি করে আসে বলুন ত?

—দৌলতাবাদের ফোর্টে, সেই অন্ধকার দিয়ে পাস করেছেন ত নিশ্চয়। নাকের সামনে হাত আনলে ও আঙ্গুল দেখা যায় না। দিনের বেলায় এত অন্ধকার যে কি করে হয়?

—যত কথাই বলুন, পণ্ডিচেরীর সমুদ্রোপকূল! ভূ-ভারতে তার কোন জবাব হয় না? আপনি কি বলেন?

—আপনারা ত রামেশ্বর রামেশ্বর করেন। সেই সমুদ্রের উপরে ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আনন্দেই কাৎ হয়ে আছেন। সে আর কতটুকু সময়? আপনি ত গিয়েছেন? সেই ভোরে দ্বারকা হইতে বাসে রওয়ানা হয়ে বিকালে সোমনাথ। আরব সাগরের তীরে তীরে রাস্তা। কোন কোন সময় ত সমুদ্রের উপর দিয়েই বাস যায়, আর সে কত দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী। কয়েকশ' রামেশ্বর হবে না?

কে কাহার উপরে থাকিবে তাহারই চেষ্টা। আমি মাঝে মধ্যে মাথা নাড়িয়া বক্তাকে সমর্থন করি। উৎসাহ যোগাই। তবে খুব হুঁশিয়ার থাকি আমার মাথা নাড়া যেন কাহাকেও আঘাত না করে।

চাকুরীর খাতিরে তাঁহাদের অনেককেই আগরতলা থাকিতে হইয়াছে। আগরতলা সম্বন্ধে তাহাদের চালু কথা।

রেখে আস দাঁত।
নিয়ে যাও বাত॥

তাঁহাদের ভাষায়, আগরতলার জলে নাকি দাঁতের বারটা বাজিয়া যায়। কিছুদিন থাকিলে বাতে আক্রমণ করে। কোষ্ঠকাঠিন্য অবশ্যম্ভাবী। একবেলা জল পেটে পড়িলেই হইল, পরদিন সকালে আপনা হইতেই টের পাওয়া যায় যে আগরতলায় আসিয়াছি।

সকালের প্রাকৃতিক ব্যাপারটা লইয়া আমিও চিন্তামুক্ত নই।

—চলুন, আর একটা দেখি না? দেখতে দোষ কি?

এবার দলের মহিলারা আমার সমর্থনে আগাইয়া আসিলেন।

লালচব—বর্ষাচকের মাঝামাঝি জায়গায় হোটেলের "হল" অনেক দরাদরির পর ৬০ টাকা হইতে নামাইয়া ৪৫ টাকা প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ভাড়ায় ঠিক করিয়া ফিরিলাম। হোটেল ছাড়ার সময় ঐ ৪৫ টাকার উপর আবার শতকরা ১০ টাকা কর বাবদ দিতে হইয়াছিল।

পরদিন ১৬ই আগষ্ট, শনিবার। অন্যান্য দিনের মতই এইদিনটিকেও স্বাভাবিক মনে হইয়াছে। শ্রীনগরে আসিয়া এদিক ওদিকে বেডাবো না, না এ হয় না। তবে মূল উ.দশ্য অমরনাথ। আগে অমরনাথ পরে অন্য কথা। আমার এ নীরস চক্ষেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করার যতখানি ক্ষমতা আছে সবটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াও ভূস্বর্গ-কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে অবশ্যই চেষ্টা করিব। কিন্তু আগে প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া লই।

গত সন্ধ্যায় লালচকে পাঁচ ছয় জন লোক তাহাদের বিচিত্র পোষাকের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এমনিতে ধুতি-পাঞ্জাবী গায়ে কিছু মাথায় কি বিচিত্র মুকুট। মুকুটের বেশ কিছু অংশ ধাতু নির্মিত। অদ্ভুৎ গঠন। তাব উপর ময়ূরের পাখ। কানে বিচিত্র দুল। সবকিছু মিলাইয়া যুগপৎ দৃষ্টি আকর্ষণ ও কৌতুহল সৃষ্টি করে। সে কৌতুহল পূর্ণভাবেই মিটিয়াছিল। দেবত্মা হিমালয়ে কোন আন্তরিক ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না।

আজ সকালে ব্যাঙ্ক খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষচক্রের ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার শাখা:তে "ট্রাভেলার্স চেক" ভাঙ্গাইতে যাই। বেশ বড় একটি দালানের দোতালায় এককোণে ব্যাঙ্কের শাখা অবস্থিত। ব্যাঙ্কের পিছনে এ কি? এত সাধু সন্ন্যাসী। সবটা প্রাঙ্গন সুন্দর সাজানো। কোন কোন সাধু মহাত্মার চালচলনে বুঝা যায় দারুন ব্যস্ততা। দালানের দোতলা হইতে সাধু সন্তের কাজ কারবার অনেকখানি

লক্ষ্য করিয়াছি। ব্যাঙ্কের কাজ শেষ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক গিয়াছি। তখন কিছু বুঝিতে পারি নাই।

পরে বুঝিয়াছি, যার জন্য অমরনাথ যাওয়া তার অনেকখানি এখানে ছিল। শুধু তুষারলিঙ্গই নয় বাবা "অমরনাথের ছড়ি" ও ভক্তের সমান ভক্তিতে পূজা প্রণামী পায়। ভক্ত তুষারলিঙ্গ দর্শনে নিজকে যতখানি ভাগ্যবান মনে করেন, ছড়ি দর্শনে ও ততখানি ভাগ্যবানই মনে করেন, সেদিন দুপুরে বাসে আমরা অমরনাথের পথে পহেলগাম রওয়ানা হই, আর ছড়ি ও আনুষ্ঠানিক ভাবে তিন, সাড়ে তিন হাজার সন্ন্যাসী ও পনরো বিশ হাজার গৃহি ভক্তসহ পদযাত্রা আরম্ভ করেন। দুপুরে শ্রীনগরের বাটামূল বাসআড্ডা হইতে বাসে উঠিয়া বিকালে পহেলগাঁও পৌছি, এবং শিখ গুরুদ্বারার ধর্মশালায় উঠি। পথে অনন্তনাগ ও মার্তণ্ড নামক স্থান দুইটি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। মার্তণ্ডে সূর্যমন্দির আছে। মার্তণ্ড ঋষির আশ্রম, শুনিয়াছি, দানিকেন এই মার্তণ্ডে আসিয়া গ্রহান্তরের মানুষ পৃথিবীর কোথায় কোথায় প্রথম অবতরণ করে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। দানিকেনের নাকি বিশ্বাস গ্রহান্তরের মানুষ মহাকাশ যান সহ এইখানেই অবতরণ করে।

"পহেলগাম" কি করিয়া পহেলগাঁও হইয়া গেল আমার জানা নাই। এখানে সব দোকান হোটেলের সাইবোর্ডে লেখা আছে—'পাহালগ্রাম' (**Pahalgam**) সরকারী কি বেসরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত পুঁথিপত্রেও লেখা হয় **Pahalgam**.

পাহালগাম খুব ছোট জায়গা। একটি মাত্র বড় সড়ক। পূর্ব অবস্থিত উত্তরের পর্বতগুলির শীর্ষদেশে বরফ। বরফের অনেকগুলি রেখা নীচের দিকে আঁকিয়া বাঁকিয়া নামিয়া আসিয়াছে। বরফ দেখিলেও মনে একটা আনন্দ হয়! রাস্তাই সমান্তরাল, কিন্তু রাস্তা হইতে অনেক নীচে দিয়া উত্তর হইতে সোজা দক্ষিণে স্ফটিক—স্বচ্ছ হিমশীতল জল সহ সবেগে লীডার নদী বহিয়া যাইতেছে। রাস্তার দুইদিকে হোটেল, দোকান, কাপড়ের, ঔষধের, বাক্সেমালের বা চা এর দোকান ছাড়াও বিস্ময়কর সংখ্যক ফটোর ও মদের দোকান। সব ফটোর দোকানের সামনেই কাঁচের শো-কেসে বহু সাদাকালো বা রঙ্গিন ফটো সাজানো আছে। আবার প্রতি শো-কেসে হিন্দী চিত্র জগতের নায়ক-নায়িকার ফটোর ছড়াছড়ি, কেহ বা সাধারণ পোষাকে, কেহ বা কাশ্মীরী পোষাকে। এমন ছবিও দোকানে টাঙ্গানো রহিয়াছে, যাহার নীচে লেখা থাকা উচিৎ "শুধু প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য," ভুলেও কোন অভিনেতা অভিনেত্রীর নোংরা ছবি তোমার মত সাধারণ লোকেরাই স্ত্রীসহ (ভগবান জানেন স্ত্রী, না ষ্ট্রীট গার্ল) উঠাইয়াছেন।

আর মদের দোকানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অন্যের সম্বন্ধে কি বলিব? আমার চোখেই চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিয়াছিল। এবার আর ভুল করিতেছি না। কেদারে যে ভুল করিয়াছিলাম। কেদার হইতে নামিয়াই প্রায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম হিমালয়ে যাইতে আর মদ ছাড়া কখনও পা বাড়াইব না। এদিকে আমি পান সিগেরেট পর্যন্ত খাই না, মদ ত দূরের কথা। শ্রীহৃষীকেশ দেববর্ম্মা, যিনি ভিক্ষু ঠাকুর নামে সর্বাধিক পরিচিত। আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, আবার একসঙ্গে আড্ডাও দেই। যদি সিগারেট খাইতাম তবে কখনও ঠাকুর সাহেবের সামনে গিয়া সিগারেট খাইতাম না এরূপ সম্পর্ক। এখান হইতে রওয়ানা হওয়ার কয়েকদিন আগে, কথা নাই বার্তা নাই, হঠাৎ পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বা কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া পট করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসি ;

আচ্ছা, আপানি আমাকে কি মদ খাইতে এড্‌ভাইস করেন? শরীরটা বেশ গরম হয় ;

তুনিয়ার বিস্ময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্তন মেজর ঠাকুর সাহেবের চোখ তুইটিতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এড্‌ভাইজ? এড্‌ভাইজ করিবেন কি? তিনি আমার দিকে নির্বাক হইয়া তাকাইয়া আছেন ত আছেনই।

: কেদারের অভিজ্ঞতায় নাক কান মুলিয়াছি, আর ড্রিঙ্ক ছাড়া হিমালয়ে যাইতেছি না।

আমি অমরনাথে যাইতেছি, তিনি জানিয়াছিলেন। সত্য খুব বড় তুশ্চিন্তা মুক্ত হইলে মানুষের চোখ মুখে যে ভাব ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ মুখভাব করিয়া মৃতু হাসি সহ,

: হুইস্কি, অবশ্য মিলিটারী ম্যান রান পছন্দ করিবে। মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম এখান হইতেই রামলক্ষন যা হউক একটা কিনিয়া সঙ্গে লইবে। যাওয়ার ব্যস্ততায় আর খেয়াল হয় নাই।

পাহালগামে মদের দোকান দেখিয়া আবার মনে হইল ; : তাই ত। মদ? মদ কেনা হয় নাই। কাল হুইস্কি।

সেদিন বিকালে পূর্ব দিকের পাহাড়ে সূর্যাস্ত দেখিলাম, এ এক বিচিত্র দর্শন, পূর্বদিকে সূর্যাস্ত ও পশ্চিম দিকে সর্যোদয়। পাহালগামের বৈশিষ্ট্য, না দিক ভ্রমের কথা বলিতেছি না, দিক্‌ভ্রমে অনেক সময় উত্তরদিকে ও সূর্য দেখা যায়। বুদ্ধি বলে 'উত্তর দিকে সূর্য থাকিতে পারে না,' চক্ষু বলে 'উত্তরদিকে সূর্য থাকিতে পারে কি পারে না সে বিচার্য বিষয় আমার নয়, আমি ত স্পষ্ট দেখিতেছি, এখন সোজা উত্তর দিকের আকাশে সূর্য। এ সম্বন্ধে যাহার অভিজ্ঞতা নাই তাহাকে শুধু মাত্র কথায় বুঝানো যাইবে না।

সমুদ্রে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখিতে সুন্দর। সমুদ্রের পারেই বলুন আর পাহাড়ের চূড়াই হউক সর্বত্র পূবদিকে চাহিয়া সূর্যোদয় ও পশ্চিমদিকে চাহিয়া সূর্যাস্তের কারণে সংঘটিত নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করিতে হয়। হয়ত হিমালয়ের অন্যত্রও থাকিতে পারে, কিন্তু আমি দেখি নাই, কিংবা কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই 'যদি সূর্যোদয়ের শোভা দেখিতে চাও তবে পশ্চিমে তাকাও কিংবা সূর্যাস্তের জন্য পূর্বদিকে। ছোট বেলায় নীচু ক্লাসের পাঠ্য বইয়ে একটি চিত্র এখনও স্পষ্ট মনে আছে। একটি বাঁদর দাড়িপাল্লায় ওজন করিয়া রুটি ভাগ করিতেছে। দুইটি মোটাসোটা বিড়াল অধীর আগ্রহে তাহা দেখিতেছে। পাল্লার একদিক হেলিয়া আছে। বাঁদরের ওস্তাদিতে একদিকের পাল্লা ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে আবার অন্য দিকের পাল্লা ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছে।

পাহালগামে কোনরূপ বদমতলব ছাড়াই প্রকৃতি দেবী নিত্য এই খেলা খেলিতেছেন। প্রভাতে সূর্যরশ্মি ধীরে ধীরে পশ্চিম পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নামিতেছে আবার সন্ধ্যার পর পাহাড় সূর্য রশ্মি ধীরে ধীরে নীচু হইতে উপরে উঠিতেছে। এই অশ্রুতপূর্ব, অতুলনীয় দৃশ্যটি বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

মনে করি দিগন্ত বিস্তীর্ণ কোন ময়দানে কিংবা সমুদ্রে আমরা শূন্য ডিগ্রিতে সূর্যোদয় দেখি। দুপুরে সূর্য ৯০° ডিগ্রিতে থাকে ও সন্ধ্যায় ১৮০° ডিগ্রিতে অস্ত যায়।

এখন, দুদিকের পর্বতের অবস্থান এরূপ যে সূর্য ৫০°—৫৫° ডিগ্রিতে না আসা পর্যন্ত কিংবা ১৩০°—১৩৫° ডিগ্রি অতিক্রম করিয়া গেলে পাহালগামের সমতল হইতে সূর্য দেখা অসম্ভব। সমতলভূমির বা পর্বত পাদদেশের এ করুণ অবস্থা পর্বতশীর্ষের নাই। প্রভাতে পূর্বদিকে হইতে আসা সূর্য রশ্মি পশ্চিম পর্বতের শীর্ষদেশ সর্বপ্রথম আলোকিত করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য যতই উপরে উঠিতে থাকে ততই ঐ সূর্যরশ্মি ধীরে ধীরে উপর হইতে নীচের দিকে নামিতে থাকে। আবার সূর্যাস্তের সময় একই কথা। এবার পূর্বদিকের পর্বতের পাদদেশে। পশ্চিমে পর্বত অবস্থিতির জন্য প্রথমে ছায়া পড়ে।

ধীরে ধীরে এই ছায়া বিস্তার লাভ করিয়া উপরের অংশ গ্রাস করিতে থাকে। সূর্য যত পশ্চিমে যায় ছায়াও ততই উপরে উঠে, একসময় সবটা অন্ধকার হইয়া যায়। একটা অদ্ভুত দৃশ্য। সন্ধ্যার পাহালগামে রীতিমত অন্ধকার কিন্তু পূর্বের পর্বতশীর্ষের গাছের মাথায় তখনও অন্ধকার ভাব সম্পূর্ণ দূর হওয়ার আগেই পশ্চিম পাহাড়ের চূড়ায় গাছগুলিতে সূর্যের আলো।

শুধুমাত্র বর্ণনার মাধ্যমে কাহাকেও এ দৃশ্য সম্যক বুঝানো যায় না। আরও খোলসা করিয়া স্বীকার করিতেছি, এ দৃশ্য বুঝানো আমার সাধ্যের বাহিরে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে পাহালগাম খুব ছোট জায়গা। একটি বড় রাস্তা, রাস্তার উভয় পাশে দোকান হোটেল ইত্যাদি। রাস্তাটি উত্তরে দক্ষিণে প্রসারিত। দক্ষিণ দিক হইতে শহরে প্রবেশ পথ। একই রাস্তায় উত্তরদিকে চন্দনবাড়ী তথা অমরনাথের পথ। যেখান হইতে ফুটপাত ও দোকান আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে একদিকে হাসপাতাল অন্যদিকে ডাকঘর। আর যেখানে ফুটপাত শেষ হইয়াছে সেখানে বড় রাস্তা হইতে বাঁ হাতি একটি ছোট রাস্তা নামিয়া গিয়াছে, এবং সেস্থান রাস্তার কোন পাশে কোন স্থায়ী দোকান নাই। বেশ ফাঁকা জায়গা। এই ফাঁকা বড় রাস্তার পশ্চিম পাশে শিখ গুরুদ্বোয়ারা ও গৌরীশঙ্কর মঠ। শিখ গুরুদ্বোয়ারাতে ধর্মশালা আছে। আমরা যখন যাই তখন শ্রাবণী পূর্ণিমার অনেক দেরী। অমরনাথ যাত্রী আছেন কিন্তু ভিড নাই। আমরা গুরুদ্বোয়ারা ধর্মশালায় উঠি। এমন আবাহন বিসর্জন আবেগ বর্জিত অভ্যর্থনা খুব কমই হয়। আমরা পূর্বে কোনরূপ চিঠিপত্র দেই নাই বা পাহালগাম বাস হইতে নামিয়া সচরাচর যাহা হইয়া থাকে, দলের দুই তিনজন দলের পক্ষে, মালামালসহ অন্যদের বাস আড্ডায় রাখিয়া, ধর্মশালায় গিয়া দেখে, থাকার স্থান পাওয়া যাইবে কিনা। কোন কিছু না করিয়া দলের সবাই মালপত্রসহ গুরুদ্বোয়ারার সামনে গালিচার মত নরম ঘাসে হাত-পা ছাড়াইয়া বসি। গুরুদ্বোয়ারার পিছনে কাঠের তৈরী দোতালা ঘরে থাকার ব্যবস্থা। গুরুদ্বোয়ার একটু পশ্চিমই রান্নাঘর। রান্নাঘরের উত্তরে প্রায় থাকার দোতালা ঘরের একই পংক্তিতে সুন্দর পাকা ২টি বড় বড় স্নানের ঘর, এক দেওয়াল দ্বারা বিভক্ত স্নানের ঘরের সঙ্গে সেনেটারী লেট্রিন। স্নানের ঘরে সাওয়ার ও ট্যাপ এবং বাহিরের দিকেও দুইটি নল লাগানো আছে। এই ট্যাপ দুইটির নীচে অনেকখানি স্থান পাকা। বাহিরেও স্নান করা কাপড় কাচা যায়। একটি ট্যাপ-এর উপরে, স্নানের ঘরের বাহিরের দিকে দেওয়ালে লেখা 'পিনে-কা পানী।"

গুরুদ্বোয়ারার ঠিক সামনে খুব বড পতাকা দণ্ড পোঁতা আছে। দণ্ডের নীচে যেরূপ ভাবে দোল মঞ্চ তৈয়ার করা হয়, সেরূপ পাকা বেদী! দণ্ড শীর্ষে বড় গৈরিক পতাকা পত পত করিয়া উড়িতেছে। আমরা পতাকা-দণ্ডের প্রায় নীচেই বসিয়াছিলাম। আমার সঙ্গী অন্যদের কি মনোভাব ছিল বলিতে পারি না। আমার মনোভাব ছিল 'শ্রীনগর হইতে দীর্ঘপথ বাস যাত্রার পরিশ্রম আগে দূর হউক তার পর দেখা যাইবে, স্থান আছে কি নাই, আপাতত এই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মানে, চরম আরামদায়ক বাতাসে, তুলার মত নরম ঘাসে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া ক্লান্তি দূর করি। দুই তিন মিনিটও হয় নাই, এক বৃদ্ধশিক ভদ্রলোক, অতি সাধারণ পোশাক পরা, ধীর পায়ে নিকটে আসিয়া বলিলেন;

: আপনারা ধর্মশালায় থাকবেন? আসুন, ঘর দেখুন।

আমরা কয়েকজন ঐ শিখ ভদ্রলোককে অনুসরণ করিয়া কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে দোতালায় উঠি। একতালাও থাকার জন্য ব্যবহৃত হয়।

একতলায় কোঠা সংলগ্ন বড় বারান্দা আছে, দোতালায় কোন বারান্দা নাই। তুলনামূলক একতলার কোঠা দোতালার কোঠা হইতে ছোট। একতালায় দশ পনর জনযাত্রী ছিল। উপরে গিয়া দেখিলাম, বেশ বড় ঘর। যদিও চার-পাচ যাত্রী পূর্ব হইতেই আছে, তবু এরূপ বড় কোঠায় স্বচ্ছন্দে ত্রিশ বত্রিশ জন লোক থাকিতে পারে। কাঠের পাটাতন, কাঠের দেওয়াল, উপরে টিন। অনেকগুলি বড় বড় লকার বা ড্র্যয়ার আছে। ড্র্যয়ারে মালপত্র রাখিয়া নিজের তালা লাগাইয়া নিশ্চিন্ত মনে বাহিরে ঘুরাঘুরি বা ঘুমানো যায়। ভদ্রলোকের পিছে পিছে আমরা দোতলা হইতে নামিয়া আসি। থাকার জন্য কোনরূপ চার্জ-ফার্জ এর বালাই নাই; এমন কি সুইপার চার্জ বা ইলেট্রিক চার্জ বলিয়াও কিছু নাই। পছন্দ না হওয়ার সন্দেহ ও মনের কোণে ছায়া ফেলে না।

ভদ্রলোকের নির্বিকার মুখের দিকে তাকাইয়া আমার এমন ধারণা কেন হইল তার যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা আমারও জানা নাই। যদি ভদ্রলোককে জানাইতাম ঘর পছন্দ হয় নাই, আমরা অন্যত্র দেখিতেছি, তবু তাহার মুখের একটি রেখাও স্থান বদল করিত না বা মুখে কোন নূতন রেখার আবির্ভাব ঘটিত না।

: ভগবানের দেওয়া আশ্রয়, ভক্তের মান লইতে থাকিবে, মান না লইলে থাকিবে না। আমি সেবক, নিমিত্তমাত্র।

এরূপভাব মুখে বলা বা মনে পোষণকরা এককথা আর কার্যে প্রকাশ করা অসাধ্য নয় দুঃসাধ্য। আবার কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা ও কাজে এইভাবে ফুটিয়া উঠার মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক। সেই দেবদুর্লভ ভাব শিখ ভদ্রলোকের প্রতি কথায় প্রতি কাজে যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সন্ধ্যার আগেই দোতালায় নিজেদের জিনিষপত্র গুছাইয়া হাত-পা ধোয়ার উদ্দেশ্যে মগ গামছা সাবান লইয়া নীচে আসি 'পিনে-কা-পানী' লেখা ট্যাপ হইতে মগ-এ জল লইয়া আমার চোখ সথার্থই ছানাবড়া। 'এ জল খাইতে হইবে'? আমি জলের চেহারা দেখিয়া সত্যি সত্যিই আঁৎ কহিয়া উঠি। দুই লিটার জলে আড়াই শ দুধ-মিশাইলে যেরূপ হইবে জলের চেহারা অনেকটা সেরূপ। মগ-এ রং দেখিয়া অনেকটা ভয়ে দু-পা পিছাইয়া আসি।

আমার অবস্থা দেখিয়া কলতলায় দাঁড়ানো এক শিখ ভদ্রলোক হাসি সামলাইতে পারেন নাই।

: এখানে জল এমনই। এখনই মগ-এর জল ভাল হইয়া যাইবে। বরফের গুঁড়া। ঠিক হইল বলিয়া।

দেখিতে দেখিতে যুগ-এর জল স্ফটিক স্বচ্ছ হইল ?
জীবনে প্রথম বোকা বনিয়া স্বস্তি পাইলাম।

সন্ধ্যা নাগাদ আমরা কজন গুরুদ্বোয়ারা হইতে বাহির হইয়া কিছু কেনা-কাটা ও একেবারে হোটেলে খাইয়া ফিরিব এরূপ চিন্তা করিয়া পাহালগামের দোকান অঞ্চলে আসি। আগেই বলা হইয়াছে, এখানে রাস্তার দুইদিকেই ফুটপাত। ফুটপাতে কিছু কিছু দোকান। লক্ষ্য করার মত এই ফুটপাতের কোন কোন দোকানেরও ইংরেজি সাইনবোর্ড। একমুচি জুতা-পালিশ, জুতা-সেলাই। টুকটাক লোহামারা ইত্যাদি করে। তারও কতবড় সাইনবোর্ড। সেই সাইনবোর্ড তারই একপাশে বাঁকা করিয়া দাঁড় করানো। ঐ বোর্ড ইংরেজিতে লেখা রেইট চার্ট বা দরসূচী। হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গ। কখনও ইংরেজিতে কখনও ফরাসীতে গ্রাহক আহ্বান করিতেছে। আমি ইংরেজি কথার অর্থ ধরিয়া আন্দাজ করি, ফরাসীতে নিশ্চয় একই বক্তব্য রাখিতেছে।

কোন কোন শহরে, কোন কোন নাপিত গ্রাহককে ইটের উপর বসাইয়া চুল দাড়ি কাটে। আহ্লাদ করিয়া বলা হয় 'ইটালীয়ন সেলুন'। এ সমস্ত সেলুনে কেহ 'সেভ' করিতে যায় না 'খেউরী' করাইতে যায়, নাপিত ও চুল কাটে না, দাড়ি কামায় না, স্রেফ খেউরী করে। এরূপ সেলুনের মালিক তথা কর্মী এবং কাষ্টমার গ্রাহক সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

এক বৃদ্ধ এমন এক সেলুনের ইটের দিকে নজর দিয়া আগাইতেছে। বৃদ্ধ লোকটিকে আসিতে দেখিয়া নাপিত তার হাত বাক্স হইতে টুকিটাকি জিনিস বাহির করিতেছে। বৃদ্ধটি কাপড় সামলাইতে সামলাইতে নাপিতের সামনে রাখা আসনে অর্থাৎ ইটে বসিল। এবার নাপিত তিন আঙ্গুল পাশ চার আঙ্গুল লম্বা কি যেন একটা বৃদ্ধের হাতে দিল। বৃদ্ধ জিনিষটি হাতে লইয়া একবার এদিক একবার ওদিক কয়েকবার করিয়া জিনিষটি ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। নাপিত নিজের মনে গালে সাবান লাগাইয়া, তারপর ক্ষুর চালাইয়া, বেশ কয়েক স্থানে রক্ত বাহির করিয়া, একসময় দাড়ি কাটা শেষ করে। তার পর গালে জল দিয়া, ফিটকারী লাগাইতে গিয়া বলিয়া উঠে, "ইস্—কর্তা, আপনি ত উল্টা ধরিয়া আছেন। এদিকে ত টিন। এদিকে আয়না। আপনি এদিকে মুখ দেখুন।" বলিয়া কর্তার হাতে ধরা জিনিষটি বা নাপিতের কথা মত আয়নাটি বৃদ্ধের হাতে ঘুরাইয়া দেয়।

এমন সেলুন পাহালগমের ফুটপাথেও আছে। ইংরেজিতে লেখা রেইট-চার্ট সহ সাইন বোর্ড। "নো সোপ অল ক্রীম্"। মুখ কামানোর ন্যূনতম দর একটাকা।

তবে ইট যে চেয়ার। আপনারা তিন বন্ধু ঐরূপ কোন দোকানে যান। কেহই জিজ্ঞাসা করিবে, "সবাই চুল কাটাইবেন?"

হয়ত আপনারা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন 'সবাই চুল কাটাইবেন, দর জানিতে চাহিলেন, : পার-হেড' তিন টাকা।

'পারহেড কথার এর চেয়ে ভাল প্রয়োগ আর কি হইতে পারে?

সেদিন সন্ধ্যার পর রাস্তায় আর বেশী দেরী করি নাই। পথ পার্শ্বের হোটেলে খাওয়া দাওয়া সারিয়া তাড়াতাড়ি ধর্মশালায় ফিরিলাম। রাতে মির্জাপুরের সঙ্গীদের সহিত বিস্তারিত আলোচনা দরকার। কে কে হাটিয়া যাইবে, কে কে ঘোড়ায় বা ডাণ্ডিতে। এখানে অর্থাৎ অমর নাথের পথে ডাণ্ডি পিছু ছয়জন। কেদারে দেখিয়াছি চারজন। এখানেও ডাণ্ডি চারজনেই বহন করে। কাধ বদলের জন্য সদাই দুইজন প্রস্তুত থাকে। দীর্ঘপথ তাই ডাণ্ডি বাহকের সংখ্যা বেশী। কোন ডাণ্ডি অর্থাৎ একজন বাহক একজন যাত্রীকে বহন করার ব্যবস্থা এ রাস্তায় অসম্ভব, নাইও। ধর্মশালায় ফিরার আগে সব কিছুর সরকারী দর অফিসের সামনে টাংগানো দর-সূচী হইতে লিখিয়া লইলাম। নমুনায় বুঝা প্রত্যেক বৎসর সব জিনিষের দর একরূপ থাকে না। দর সূচীতে দেখা দেখা গেল অমরনাথে যাত্রীদের বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার সময় ট্যাকে পয়সা ছাড়া আর কিছুই লওয়ার প্রয়োজন নাই। দরসূচী ইংরেজিতে লেখা, পাঠকের সুবিধার জন্য হুবহু তুলিয়া দিতেছি।

SHRI AMARNATHJI YATRA—1980

Tariff for Ponies, Dandies,

Tantage. Tent Equipments etc.

1.	Riding pory—		Rs. 275/-
2.	Pack pory—		„ 265/-
3.	Labourer—		„ 135/-
4.	Labourer with pitho		„ 150/-
5.	Dandy (Govt)—		„ 1800/-
6.	Dandy (Pvt.)—		„ 1600/-
7:	Tent (Double Fly)—	Rs. 48/- to	„ 192/-
8.	Tent (Single Fly)—	Rs. 33/- to	„ 128/-
9,	TURPOLIFE Ground Sheet 6′×3′—		„ 9/-

10.	Rain coat—	Rs. 7/- to Rs. 9/-
11.	Blanket (heavy)—	„ 5/-
12.	Do (Light)—	„ 3/-
13.	Hunter shoes—	„ 6/-
14.	Modlen Shocks—	„ 4/-
15.	Harican Lamp—	„ 6/-
16.	Woolen Over coat—	„ 6,-
17.	Petromax—	„ 10/-
18.	Folding Beds—	„ 5/-
19.	„ Chairs—	„ 6 -
20.	„ Table—	„ 6/-
21.	Quilts—	„ 6,-
22.	Mattresses—	„ 6/-
93.	Bed Sheet—	„ 6 -
24.	Pillow—	„ 4/-

Note : $\frac{1}{3}$ of the Tariff is payable in case
Pories Porters are utilised one way.

রাতে আমি ডাক্তারবাবু, পণ্ডিতজী, লাল্লু ভাই রামদাস প্রমুখ কয়েকজন পরদিনের যাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা করি। কেহ কেহ এখান হইতে ঘোড়ায় যাইবেন। আমরা কয়েকজন পাঁচ দিনই হাঁটির ঠিক করিলাম। কেহ কেহ এরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন, যেখানে পথ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নাই সেখানে সবটা পথ হাঁটির এনম বলা কঠিন। যতখানি সম্ভব বা যতদিন সম্ভব হাঁটির তারপর ঘোড়ায়। রাস্তাতে অর্থাৎ চন্দনবাড়ী, শেষনাগ এমনকি পঞ্চতরণীতেও ঘোড়া পাওয়া যায়। সে রাতে আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারি নাই। দেখা যাক কাল কি হয়। এরূপ প্রত্যেকের মনের ভাব অনেকে তলে তলে ঘোড়া বন্দোবস্ত করিয় আসিয়াছেন কিন্তু প্রকাশ্যে বলিতেছেন না। এর মধ্যে কে যেন অনুরোধ করিলেন ;

: আপনার ত বই আছে। ডাক্তারবাবুকে দেখাইয়াছেন। কি লেখা আছে আমাদিগকে হিন্দীতে বলুন না ?

কাশ্মীরের উপর ইংরেজিতে লেখা একটি বই খুলিয়া বলিতে লাগিলাম ; শ্রীনগর হইতে ১৪২ কিমি দূরে গুহা অবস্থিত। প্রথম ৯৬ কিমি, পাহালগাম পর্যন্ত মটরে,

যাওয়া যায়, পরবর্তী ৪ঃ কিমি হাঁটিয়া বা ঘোড়ায় যাইতে হয়। যাত্রার প্রথম অংশ পহালগাম হইতে চন্দনবাড়া, দূরত্ব ১৩ কিমি, চন্দনবাড়ী শেষনাগ নদীর ধার ধরিয়া যাইতে হয় চন্দনবাড়ীতে প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব। উচ্চতা ৯৫০০ ফুট।

পরবর্তী স্তরে চন্দনবাড়ী হইতে শেষ শেষনাগ, দূরত্ব ১৬ কিমি। এখানে পিশু ঘাঁটি, কঠিন পাকডণ্ডি। পাকডণ্ডির পর যশপাল, যাত্রীকে এখানে বিশ্রাম করায় জন্য উপদেশ দেওয়া যায়। যশপাল হইতে শেষনাগ ৫ কিমি। শেষনাগের উচ্চতা ১২,২৩০ ফুট। শেষ নাগে সুন্দর হ্রদ আছে। বরফ গলা জল স্নান করিলে শুধু পথের ক্লান্তিই দূর হয় না, এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত যে জীবনের সমস্ত পাঠ ধুইয়া মুছিলা শেষ হইয়া যায়। তারপর ওয়াবজান ১২,২৩০ ফুট উচু। ক্যাম্প করার সুন্দর জায়গা। যাত্রার তৃতীয় অংশ শেষনাগ হইতে পঞ্চতরণী। দূরত্ব ১৩ কিমি, এ যাত্রা আরম্ভ হয় মহাগুনাশ পাহাড় চড়াই দ্বারা। সমুদ্রপৃষ্ঠে হইতে ১৪ হাজার ফুট। এ যাত্রার শেষ ভৈরব পাহাড় হইতে আসা-পাঁচটি ছড়া পার হওয়ার পর।

পঞ্চতরণী হইতে গুহা মাত্র ৬ কিমি। একটি পাহাড় পার হইলেই অমরাবতী ও পঞ্চতরণী নদীর সঙ্গম। সেই সঙ্গমস্থান হইতে গুহা দেখা যায়। আর মাত্র ৩ কিমি, এখান হইতে গুহা দেখা মাত্র যাত্রীরা সজোরে চিৎকার করিয়া উঠে, "হয় হয় মহাদেব,"

যাত্রীদের জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ করেন :—

১। শ্রীনগর—পাহালগাম পথে বাসের ব্যবস্থা, অনন্ত নাগের নিকট অবস্থিত খান্নাবলেং নিকট হইতেও পাহালগামের বাস পাওয়া যায়।

২। ঘোড়া, ডাণ্ডি, মজদুর, পিঠ্ঠু, সরকার নির্দ্ধারিত দরে পাওয়া যায়।

৩। দুই সপ্তাহের অগ্রিম নোটিশে, দায়িত্বশীল কর্মচারীর নিকট হইতে ১ শতকরা পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম আদায়ে; প্রয়োজনীয় আসবার পত্র সহ থাকার তাঁবু পাওয়া যায়।

৪। আনুষঙ্গিক ঔষধপত্র সহ একটি চিকিৎসক দল সর্বত্র যাত্রীগণের সঙ্গে থাকিবে। চিকিৎসক (স্ত্রী ও পুরুষ) নার্স, কম্পাউণ্ডার, ধাই—এই চিকিৎসক দলে থাকিবে।

৫। পর্যটন বিভাগ একটি ভ্রাম্যমান রেস্তোঁরা পাহালগাম হইতে গুহা ও গুহা হইতে পাহালগাম পর্যন্ত, এই পাঁচদিন চালাইবে। যাত্রীদিগকে নির্দ্ধারিত দরে খাদ্য, চা, কফি ইত্যাদি সরবরাহ করা হইবে।

৬। রাস্তায় বড় বড় পানায় জলের ড্রাম ও ট্যাপ লাগানো ট্যাঙ্ক থাকিবে। যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ ঐ জল কাপড় ধোওয়ার জন্য যেন ব্যবহার না করেন।

৭। নিম্নলিখিত স্থান সমূহে রেশনসপ খোলা হইবে। ঐ রেশন শপে ক্রেতা তীর্থ যাত্রীরা নিদ্ধারিত দরে খাদ্য দ্রব্য যথা—চাউল, আটা কেরোসিন, তৈল, বিস্কিট, লবণ, চিনি, চা, গুড়া দুধ, দিয়াসালাই, মোম ইত্যাদি পাইবে।

(ক) চন্দনবাড়ী

(খ) শেষনাগ

(গ) পঞ্চতরণী

৮। নিম্নলিখিত স্থানসমূহে জ্বালানী কাঠ পাওয়া যাইবে,—

(ক) চন্দনবাড়ী

(খ) পিশুঘাটি

(গ) শেষনাগ

(ঘ) ওয়াবজান

(ঙ) ওয়াববল

(চ) মহাগুণাশ

(ছ) পঞ্চতরণী

(জ) গুহা

এ আলোচনার পর দ্বিতীয় বই এর উপর আলোচনা শুরু করি। অমরনাথ গুহার উপর লিখিত গাইড্ বুক।

এই বইয়ের প্রথমেই যাত্রীদের প্রতি নির্দেশ।

১। অনুগ্রহ পূর্বক লক্ষ্য করুন আপনার ব্যবস্থা যথার্থ।

২। ভাড়া করা তাঁবু ইত্যাদি জিনিষ যাত্রার পূর্বেই পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

৩। ঘোড়াওয়ালা, ডাণ্ডিওয়ালা যেন রেজিষ্টর্ড হয় লক্ষ্য রাখিবেন।

৪। যাত্রা সময়ে যাত্রা অফিসারগণের দেওয়া উপদেশ সমূহ মানিয়া চলিবেন।

৫। যাত্রা শুরু হইতে গুহা পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিভাগের অফিসার আপনার সাহায্যের জন্য সদা প্রস্তুত হইয়া আছেন।

৬। আপনার সঙ্গে অবশ্যই তাঁবু, গরম কাপড় বর্ষাতি, টর্চ্চ, ভ্রমন সহায়ক লাঠি যেন থাকে লক্ষ্য রাখিবেন।

৭। আপনার সুবিধার জন্য যাত্রার বিভিন্ন স্থানে রেশন ও জ্বালানি কাঠ মজুত আছে।

৮। কিছু খাদ্য যথা বিস্কিট, টিনজাত খাদ্য আপনার সঙ্গে রাখিবেন।

৯। আপনার খাদ্য যেন সঙ্গে সঙ্গে থাকে তার জন্য নিজের ঘোড়ার দিকে সব সময় নজর রাখিবেন।

১০। যাত্রার বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত সতর্কীকরণ সাইন বোর্ড টাঙ্গানো আছে, ঐ সমস্ত নির্দ্দেশ পালন করিবেন।

১১। অন্যকে ডিঙ্গাইবেন না।

১২। নির্দ্ধারিত দর হইতে বেশী দিবেন না।

১৩। যাত্রা পথে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

ডাক্তার কি বা ঔষধের দাম বাবদ কিছু দিবেন না।

এই বইতে আছে, আগে কেবল আষাঢ় বা শ্রাবনী পূণিমায় (রাখী পূর্ণিমায়) যাত্রী আসিত। এখন যাত্রী সমাগমে কোন নির্দ্দিষ্ট দিন নাই। জুলাই মাসের প্রথম হইতে আগষ্টের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত। এমন কি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতেও যাত্রী যাতায়াত করে। ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত তীর্থ অমরনাথ। ভারতের প্রত্যেক প্রান্ত হইতেই এখানে তীর্থ-যাত্রী আসে, কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীতে এই গুহা সম্বন্ধে দুইবার উল্লেখ আছে। খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দে রাজা রামদেব রাজা শুকদেবকে এখানে বন্দী করিয়া রাখেন এবং অমরনাথের নিকট অবস্থিত লীডার (লম্বোদর) নদীতে ডুবাইয়া মারেন। দ্বিতীয় ঘটনা রাজা সৈদিমতির (খৃঃ পূঃ ৩৪ হইতে ১৭ খৃষ্টাব্দ) এই তুষার লিঙ্গ দর্শনের বর্ণনা।

দ্বিতীয় বইতে পথের বর্ণনা প্রথম বই এর পথের বর্ণনার মতই। গুহার বর্ণনা বিস্তারিত, এই যা। অন্যথায় থাকার ব্যবস্থা, বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা, কোথায় কোথায় রেশন শপ বা জালানী কাঠ পাওয়া যায় সবই একরূপ। ঘোড়া, ডাণ্ডি, কুলী ইত্যাদির ভাড়ার হার সম্বন্ধে সোজা নির্দ্দেশ পর্যটন অফিসার হইতে জানিয়া নিন্।

দুইটি বই হইতে লওয়া নির্দ্দেশাবলীর সহিত, নিজেদের যার যার প্রস্তুতি মিলাইতেছিলাম। কাজ হইতে কথা হইতেছিল অনেক বেশী।

এর মধ্যে কে যেন আমাকে অমরনাথের কাহিনী বলিতে অনুরোধ করে। অমরনাথের উপর পড়াশুনা এমন কিছু নয় তবু সেদিন বা সে রাতে আমার মুখ হইতে শুনা স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার অমরনাথ দর্শন কিংবা গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্য গোরখনাথ সহ অমরনাথ তুষারলিঙ্গ দর্শন তাহাদিগকে বিস্ময়ে হতবাক করিয়া দিয়াছিল। "স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি" গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে আছে—

"আচ্ছাবলের মোগলবাগে একদিন আমরা বাহিরে ভোজনে বসিয়াছি, এমন সময়ে স্বামিজী হঠাৎ প্রকাশ করিলেন যে, তিনি যাত্রীদিগের সহিত অমরনাথ গমন করিবেন এবঙ তাঁহার কন্যাকেও (লেখিকাকেও) সঙ্গে লইয়া যাইবেন।...।

আমরা শেষ বন্দোবস্তের জন্য আচ্ছাবল পরিত্যাগ করিয়া ইসলামাবাদে আমাদের নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম। সকল স্থানেই দেখিলাম, ক্রমাগত নূতন নূতন যাত্রীর দল চলিয়াছে। সমস্তই বেশ নিস্তব্ধ। সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে। দুই-তিন সহস্র লোক একটি মাঠে ছাউনী ফেলিয়া আবার সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই উহা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে—উনানের ছাই ব্যতীত তাহাদের উক্তস্থানে রাত্রিবাসের চিহ্নমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তাহারা সঙ্গে বাজার লইয়া চলিয়াছে, আর প্রত্যেক বিশ্রামস্থলে তাঁবু খাটান ও দোকান সাজানর কার্য অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। সজ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করা যেন তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ। ছাউনীর এক অংশের মাঝখানদিয়া একটি চওড়া রাস্তা চলিয়াছে, তথায় শুখান ফল, দুধ, ও চাল-ডাল কিনিতে পাওয়া যায়। তহশীলদারের তাঁবুটি—তাহার একপাশে স্বামিজীর ও অপর পাশে আমার তাঁবু…

যাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শত শত সাধু ছিলেন। তাঁহাদের তাঁবুগুলি গেরুয়া রং এর, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার আকারে এক একটি বড ছাতার মত। এই সাধুগণের উপর স্বামিজীর অসাধারন প্রভাব ছিল। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বিদ্বান ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেক বিশ্রামস্থলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিতেন। তাঁহার তাঁবু লোকে ভরিয়া যাইত, এবং যতক্ষণ দিবালোক থাকিত' এই সাধুগণ কথাবর্ত্তায় মগ্ন হইয়া থাকিতেন। স্বামিজী পরে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শব শিববিষয়ক ছিল, আর তিনি মাঝে-মাঝে জোর করিয়া বাহ্য জগতের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে গম্ভীরভাবে ভৎ´সনা করিতেন।

পহলগামে একাদশী করিবার জন্য গাত্রীদল একদিন বিশ্রাম করিল। ইহা মেষপালকগণের একটি গ্রাম। অদূরে দুইটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের সন্ধিস্থলে একটি পার্বত্য তটিনী, তাহার প্রস্তর-সংঘর্ষে খনিত গর্ভে অনেকগুলি ছোট ছোট বালুকাময় দ্বীপ। সুন্দর দৃশ্য। ইহার ঢালু পার্শ্বদ্বয় সরল (Pine) গাছে ছাইয়া গিয়াছে, আর সন্ধ্যার সময় ইহার শিরোদেশর পর্বতটির উপর দিয়া অপূর্ণাবয়ব চন্দ্র দেখা যাইতেছে। সুইজলণ্ড অথবা নরওয়ে দেশের সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোরম দৃশ্যগুলি এইরূপ। এখানে অ্যমরা শেষ মনুষ্যবসতি চিহ্ন দেখিতে পাইলাম একটি পুল, একখানি খামার বাড়ী ও তাহার কর্ষিত ক্ষেত্র, আর কতকগুলি দেওদার কাষ্ঠ নির্মিত কুটীর।…

অনির্বচনীয় সৌন্দর্যময় দৃশ্যাবলীয় মধ্য দিয়া আমরা তিন সহস্র লোক পুরোবর্ত্তী উপত্যকাটিতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। প্রম দিন আমরা একটি সরল গাছের বনে তাঁবু ফেলিলাম; পরদিন আমরা চির তুষার রেখা অতিক্রম করিয়া একটি নদীর ধারে তাঁবু খাটাইলাম—নদীটি জমিয়া গিয়াছে। সেদিন রাত্রে ছাউনীর

সুবৃহৎ অগ্নি জুনিপার কাঠ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল এবং পরদিন সন্ধ্যায় উক্ত ভূভাগ আরও উচ্চ ছিল বলিয়া, ভৃত্যগণকে এই বিরল ইন্ধনের অনুসন্ধানে অনেক ক্রোশ পথ ঘুরিতে হইয়াছিল। অবশেষে, এতদিন আমরা যে ভাল রাস্তা দিয়া চলিতেছিলাম, তাহা ফুরাইয়া গেল এবং আমরা পগ্‌ডাণ্ডি (অতিশয় উঁচু-নীচু সরু পথ) দিয়া কষ্টে-স্থষ্টে খাড়া খাড়া পাহাড় চড়াই-উৎরাই করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমরা যে গিরিসঙ্কটে অমরনাথ-গুহা অবস্থিত, তথায় উপস্থিত হইলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে। এই স্থানে উঠিবার সময় আমরা দেখিতে পাইলাম, সম্মুখে তুষার শৃঙ্গগুলি একটি সদ্য পতিত শ্বেত অবগুণ্ঠনে আবৃত রহিয়াছে। যে সকল কৃষক সর্বপ্রথম এই লিঙ্গের দর্শনলাভ করিয়াছিল, তাহাদিগের নিকট সাক্ষাৎ ভগবানই তথায় অবস্থান করিতেছেন বলিয়া নিশ্চয়ই বোধ হইয়া থাকিবে।

আসিবার পথে স্বামিজী-এই যাত্রার প্রত্যেকটি বিধান পালন করিয়া আসিয়া ছিলেন। তিনি মালা জপ করিতেন, উপবাস করিতেন এবং পর পর পাঁচটি নদীর বরফের মত ঠাণ্ডাজলে স্নান করিয়াছিলেন, এই কঙ্করময় নদীগর্ভগুলি আমরা যাত্রার দ্বিতীয় দিনে অতিক্রম করিয়াছিলাম। আর এখন গুহায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার বোধ হইল, যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান। অসংখ্য যাত্রী কোলাহল করিয়া দলে দলে গুহায় প্রবেশ করিতেছে এবং মাথার উপর পারাবতকুল ঝটপট শব্দ করিয়া উড়িতেছে, ইত্যবসরে তিনি অলক্ষিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া দুই তিন বার প্রণাম করিয়া লইলেন; তৎপরে পাছে ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া পড়েন, এই ভয়ে তিনি উঠিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। পরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই কয়টি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তে তিনি মহাদেবের নিকট ইচ্ছামৃত্যুবর পাইয়াছিলেন। তাঁহার মনে আশৈশব এই অস্ফূট ধারনা বদ্ধমূল ছিল যে, পর্বত মধ্যস্থ কোন শিব-মন্দিরে তাঁহার মৃত্যু হইবে। সম্ভবতঃ তাহা এইরূপেই ব্যর্থ, অথবা সার্থক হইয়াছিল।

গুহার বহির্দেশে অসহায় লোকদের উপর পাণ্ডার জুলুম ছিল না। আড়ম্বর বিহীন ও প্রকৃতির বিশেষ অনুগামী বলিয়া অমরনাথের প্রসিদ্ধি আছে। আবার রাখীবন্ধনের পুণ্য দিবসেই এই যাত্রার শ্রেষ্ঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেকে আমাদের হাতে রক্ত ও পীত রাখী বাঁধিয়া দিয়া গেল। তৎপরে আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে নদীর ধারে কয়েকখানি প্রকাণ্ড উঁচু পাথরের উপর ভোজন সম্পন্ন করিলাম এবং পরিশেষে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম।

স্বামিজী এই স্থানে মাহাত্ম্যে ভরপূর' হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি এমন সুন্দর আর কিছু কখনও দেখেন নাই। তিনি অনেকক্ষণ

নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিলেন "কি করে এই গুহাটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তা আমি বেশ কল্পনা করতে পারি। গ্রীষ্মকালের কোন একদিনে একদল মেষপালক তাদের নিরুদ্দিষ্ট ভেড়াগুলির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়ে থাকবে। তারপর তারা তাদের উপত্যকাস্থ ঘরে ফিরে এসে বন্ধুদের কাছে, কি করে তারা হঠাৎ মহাদেবের দর্শনলাভ করেছে, তারই বর্ণনা করে থাকবে।"

আমাদের গুরুদেবের নিজের সম্বন্ধে অন্ততঃ এইরূপ কথা বলা চলে। এই ষারলিঙ্গের পবিত্রতা ও ধবলতা তাঁহাকে বিস্মিত, মুগ্ধ করিয়াছিল। গুহাটি তাহার নিকট কৈলাসের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। তিনি যাবজ্জীবন মনে রাখিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি একটি পর্বতগুহায় প্রবেশ করিয়া স্বয়ং শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎকার করিয়া ছিলেন।"

বিবেকানন্দের পর গুরু কবি গোরখনাথ শঙ্করনাথ রায়ের "ভারতের সাধক" ৭ম খণ্ডে "মহাযোগী গোরখনাথ" অংশে আছে,—"দূরতুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া গুরুমৎসেন্দ্র নাথ শিষ্য গোরখনাথ সহ সিংলাজে আসিলেন এবং হিংগুলা দেবীর দর্শন, পূজা ও হোম সম্পন্ন করিলেন। মধ্য রাত্রে গুরুর নির্দেশে গোরখনাথ মন্দিরে দেবীর আরাধনা করেন এবং চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে দেবীর দর্শন পান। দেবী বর প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান জানাইলেন মহাযোগী বলিলেন, ঃ জগন্ময়ী, কৃপা করে তুমি আবির্ভূতা হয়েছো, এতেই আমার জীবন সার্থক, আর আমি কি চাইব তোমার কাছে?

ঃ বৎস, আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি আজ থেকে অষ্টসিদ্ধির অধিকারী হবে। যোগী ও তন্ত্র সাধকের কাম্যধন মহাজ্ঞানের পথে ও তুমি এগিয়ে যাবে, লাভ করবে শিব সারূপ্য।

অন্তর্হিতা হইবার আগে দেবী একটি বিশেষ নির্দেশ তাহাকে দিয়া গেলেন। কহিলেন, ঃ এখান থেকে সাজা তুমি মহাতীর্থ অমরনাথে যাও, বিগ্রহীভূত পরম শিবকে দর্শন-স্পর্শন করে ধন্য হও।

পদব্রজে পথ চলিতে চলিতে গুরু ও শিষ্য উভয়ে কাশ্মীরের অমরনাথে আসিয়া উপস্থিত। দেবাদিদেবের অত্যাশ্চর্য্য প্রতীক তুষার লিঙ্গ দর্শনে গোরখনাথের আনন্দের অবধি নাই। তাড়াতাড়ি নিকটস্থ হিমধারায় স্নান সারিয়া আসিয়া গুহা মধ্যে তিনি ধ্যান ভজন শুরু করিয়া দিলেন।

কয়েক প্রহর এভাবে একটানা অতিবাহিত হয়। এবার মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্যকে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহেন, "বৎস আজ শিব চতুর্দশী। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী আজ

এই গুহায় ভগবান অমরনাথের তুষার লিঙ্গের সম্মুখে যোগী ও যোগিনীদের উলঙ্গ নৃত্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে, তুমি তাড়াতাড়ি পেছনে সরে, দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াও"।

কিছুকাল পরেই দেখা গেল, জটাজুটবিলম্বিত চিমটা করঙ্গধারী একদল নগ্ন যোগী ও যোগিনী হুড়হুড় করিয়া গুহা মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তুষার লিঙ্গের সম্মুখে প্রণাম ও স্তবস্তুতি নিবেদন করিয়াই তাহারা পরম উৎসাহে নৃত্য গীত শুরু করিয়া দেয়। সমস্বরে উদ্গত হইতে থাকে ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনি আর ত্রিশূল চিমটার ঠন্ঠন্ শব্দ। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে অবিরাম চলে উলঙ্গ নৃত্য। এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে গোরখনাথের বাক্স্ফূর্তি হইল না। নৃত্যগীত উৎসব শেষ হইয়া গেলে লিঙ্গ বিগ্রহের পূজা ও কৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া মৎস্যেন্দ্র ও গোরখনাথ শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলেন"।

গোরখনাথের এই দর্শন কাহিনী বর্ণনায় শঙ্কর নাথ রায় ব্রীগ্স এর "গোরখনাথ এণ্ড কাম ফাট্টা যোগীয্" এর সাহায্য লইয়াছেন। আনুমানিক দশম শতকে পূর্ব ভারতের সিদ্ধপীঠ কামরূপে গোরখনাথ আবির্ভূত হন।

বিবেকানন্দ গোরখনাথের কাহিনীর পর সে রাতে আর কোন আলোচনা চলানোর মত মানসিক অবস্থা আমাদের কাহার ও ছিল না। যে যার মত শুইয়া পড়িলাম।

আজ ১৭ই আগষ্ট রবিবার। একপ্রহর রাত থাকিতেই শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রস্তুত হওয়া উচিৎ যেন ভোরে ভোরে হাঁটা আরম্ভ করা যায়। উচিৎ বলা যত সহজ, কাজ করা তত সহজ নয়; এক প্রহর রাত থাকিতে ত দূরের কথা বহুকষ্টে চোখ খুলিয়া হাতঘড়ি দেখিলাম প্রায় ৭টা বাজে। কিছুতেই যেন চোখ খুলিতে পারিতেছি না। সেই ১২ ও ১৩ তারিখে ট্রেনে, ১৪ তারিখে, জম্মু ধর্মশালায়, ১৫ তারিখে, শ্রীনগরে, ১৬-এর রাত এখানে। শরীরের সমস্ত ক্লান্তি যেন আজ আমার চোখ দুইটিতে ভর করিয়াছে। না পারিতেছি চোখ খুলিতে, না পারিতেছি বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে। কি রকম যেন একটা অবসাদ অবসাদ ভাব। অনেক সময় ঔষধ খাওয়ানোর জন্য শুশ্রূষাকারী দুর্বল শায়িত রোগীকে ঘাড়ের নীচে হাত দিয়া সযত্নে বসায়, এখন আমাকে যদি কেহ এরূপ যত্নের সহিত ধীরে ধীরে ঘাড়ের নীচে হাত দিয়া সাহায্য করিত তবে কত আরামেই না বসিতাম।

যাক কপালে লেখা আমার বসা আমাকেই বসিতে হবে। একটু গড়িমসি করিয়া উঠিয়া বসিলাম। এ কি? বাহিরে বৃষ্টি। বেশ ভাল বৃষ্টি। প্রস্তুত হওয়াই কঠিন। অমর নাথের পথে রওয়ানা হওয়াত দূরের কথা।

আমাকে বিছানায় বসিতে দেখিয়া লাল্লু সিয়ারাম মুনীম্ হাসিমুখে আমার

বিছানায় আসিয়া বসিল। ফিস্ ফিস্ করিয়া জানাইল কাহারা কাহারা ঘোড়ায় যাইতেছে। সে হাঁটিবে। তাঁর স্ত্রী রাস্তার জন্য খাবার প্রস্তুত করিতেছে। আমার এই মির্জাপুরী সঙ্গিরা যদিও একসঙ্গে বাড় হইতে বাহির হইয়াছে ; একসঙ্গে ঘুরিতেছে এবং একসঙ্গে থাকা খাওয়া করে, তবু সুন্দর যার যার তার তার ব্যবস্থা। লাল্লু সিয়ারামের স্ত্রীর নিজের জন্য ও লাল্লু সিয়ারামের জন্য রান্না করে। ডাক্তার-বাবুর স্ত্রী ডাক্তারবাবুও নিজের জন্য। এরূপ যার যার তার তার ব্যবস্থা, তবে রসিক পণ্ডিতজী ডাক্তারবাবুর সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করিতেন। মামী রান্না করিতেন নিজের ও স্বামীর রান্না। এরূপভাবে মির্জাপুরী দল বেশ কয়েকটি উপদলে বিভক্ত ছিল। পরমানন্দ ওমরের, অর্জুন পরসাদ তেওয়ারীর বা-ওম পরকাস্ গুপ্তার উপদল যদিও মির্জাপুরের তবু রামদাস কোন উপদলে ছিল না। তিনি আমার সঙ্গে বাহিরে হোটেলে খাইতেন। আর এই দলে ছিল আমারই মত অমির্জপুরী কিন্তু হিন্দীভাষা—মহাবীর প্রসাদগুপ্ত। কাশীতে—বাঙ্গালী-টোলায় তার একটি ছোট দোকান আছে। মাতৃভাষার ন্যায় বাংলা বলিতে পারে। অত্যন্ত বাঙ্গালী বিদ্বষী এই মহাবীরের ওস্তাদিতে একদিন অজান্তে বেশ অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম। ঐদিন প্রথম, ঐদিনই শেষ। সেদিন মহাবীরের মনোবৃত্তির যে পরিচয় পাইয়াছি তারপর যতটা সম্ভব মহাবীরকে এড়াইয়া চলিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি জম্মুতে ধর্মার্থ ট্রাষ্ট পরিচালিত রঘুনাথ মন্দির ধর্মশালায় এই দলের সঙ্গে আমার আলাপ। রাতে মহাবীরের অনুরোধে ঐ দলের সঙ্গে এক সাথে খাইতে বসি। যে যার কম্বলে বসা। সামনে সদ্য কেঁদা শুকনা শাল পাতা। যার যার লোটায় জল, আমার জল ওয়াটার ব্যটলে। এক মহিলা দুইটি রুটি ও কিছু ভাজা পাতে দিয়া গেল। আর এক মহিলা এ খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই দুইটি রুটি ও হালুয়া দিয়া গেল। আর একজনা রুটি তরকারী প্রত্যেকটি সুস্বাদু। খাওয়া দাওয়ার পর্ব চুকিয়া গেলে পর আমি বুঝলাম এ হোটেল নয় যে পয়সা দিব। তবে দলের খাওয়া বাবদ যে খরচ হয় তার নাষ্য অংশ ত বটেই, এরূপ খাওয়া রাস্তায় পাইলে নাষ্য অংশ হইতে অনেক বেশী দিতেও আপত্তি নাই। আমার ধারণা দলের পুরুষরা বাজার হাট করেন, মহিলারা রান্নাবান্না পরিবেশন ইত্যাদি আর হিসবাদি রাখেন ডাক্তারবাবু। রাতে খাওয়া বাবদ খরচ কাহাকে দিতে হইবে মহাবীরের নিকট জানিতে চাই। উত্তরে যাহা শুনিলাম তাহা চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার বা পিলা চমকানোর পক্ষে যথেষ্ট। এই মির্জাপুরী লোকগুলি যথেষ্ট টাকা পয়সার মালিক। যদিও পোষাক আষাক দেখিয়া কিছু বুঝার উপায় নাই, তাহাদের কেহ কেহ তেল কলের মালিক, আবার

কাহারো কাহারো নিজস্ব ট্রাক আছে। তাঁহারা যখন খায় তখন বসিয়া গেলেই হইল। প্রত্যেকে একটি দুইটি করিয়া রুটি দিলেই যথেষ্ট। রুটিগুলি খাটি ঘি- এ ভাজা। তরিতরকারীতে ঘি গরম মশল্লা প্রচুর। তীর্থপথে মহিলারা দান করিতে চান। সে নিজে এই দলের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর হইতে এরূপ ভাবেই চালাইতেছে। এক পয়সাও খরচ নাই। আমি ইংরেজী জানা শিক্ষিত লোক। দল, বিশেষতঃ ডাক্তারবাবু, আমাকে খুব আদরের সহিত দলে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব খাওয়া বাবদ পয়সার চিন্তা আমার মাথায় কি করিয়া আসে? মহাবীর আরও কি কি যেন বলিয়াছিল। সবটা মনে রাখার মত মনের অবস্থা বা প্রবৃত্তি তখন ছিল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম এই প্রথম, এই শেষ। এরপর মাঝে মধ্যে এককভাবে হয়ত কাহাকেও চা ইত্যাদি খাওয়াইছি, আমি কাহারো উপর ভুলেও এক কাপ চা খাই নাই। এই ঘটনার পর মহাবীরের শুধু এড়াইতাম না কিরূপ যেন একটা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল।

লাল্লু সিয়ারামের নিচু স্বরের কথার উত্তরে জানাইলাম—

: হাঁটব ত ঠিকই। তবে কুলী চাই। রেজিষ্টার্ড। কুলী আবার ২০ কেজির উপর বহন করিবে না। কুলীর পিঠে ২৫ কেজি পর্যন্ত মাল থাকিতে পারিবে। ৫ কেজি কুলীর আর ২০ কেজি যাত্রীর। এই সরকারী নিয়ম।

: বাঙ্গালীবাবু তুমি উঠ। তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

: আরে আগে ত যে সমস্ত মাল হাঁটা পথে সঙ্গে থাকিবে না সে গুলি "ব্লকরুম" রাখিতে হইবে।

: বাবু তুমি উঠ।

: এক কাজ কর, তোমার ও তোমার ধরম পত্নীর কি কি মাল সঙ্গে লওয়া দরকার আগে দেখ, যদি বিশ কেজি না হয় তবে মহাবীরকে সঙ্গে নাও। এই তিন জনের কম্বল, জামাকাপড়ে বিশ কেজি হইয়া যাইবে।

: মহাবীর কুলী লইবে না। সে জানাইয়াছে নিজেই মাল বহন করিবে। এরূপ প্রস্তুতি লইয়াই সে বাড়ী হইতে মাল বহনোপযোগী ব্যাগ বানাইয়া আনিয়াছে।

মহাবীরকে যতটুকু বুঝিয়াছি যে উপদল আগাগোড়া হাঁটিবে মহাবীর সে দলের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তীর্থ যাত্রকে দান করার অপূর্ব সুযোগ বিলাইতে বিলাইতে চলিবে। এখন লাল্লু সিয়ারাম মুনীমের সঙ্গে মহাবীর নাই শুনিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিলাম।

: ঠিক আছে, সিয়ারামজি, এখানে বস বলিয়া হাত দিয়া নিজের পাতা বিছানায় বেশ জোড়ে থাপ্পর মারিয়া বলিলাম,—

: পান বানাও।

লাল্লু সিয়ারাম হাসিয়া আমার বিছানার উপর বসিল। আমি তাড়াতাড়ি এই বৃষ্টিতেই বাহিরে গেলাম, মুখ ধোওয়া, পায়খানা এমন কি সেই হাড় কাঁপানো শীতে বেশ করিয়া বরফ গুড়া সমৃদ্ধ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া আসিলাম। আগামী পাঁচ দিনের স্নান আজই সারিয়া লইলাম।

লাল্লু সিয়ারামকে "পান বানাও" কথাটার একটা কারণ আছে। তার মুখে সব সময় পান থাকিত, এবং সময় পাইলেই সে পান বানাইত। সে এক দৃশ্য। ছোট ছোট পান পচিশ ত্রিশটি এক সঙ্গে বিনাইত। প্রত্যেকটিতে সযত্নে গালা খয়ার লাগাইয়া আবার একটু একটু করিয়া শুকনা খয়ের গুড়া দিত। তারপর প্রতি পানে একটি কি দুইটি সুপারীর টুকরো, তারপর প্রতি পান পাতায় একটি দুইটি করিয়া এলাচ দানা, তারপর একটু একটু জর্দ্দা। পানে মশলা দেওয়ার জন্যই কমসে কম চৌদ্দ পনেরোটি কৌটা, প্রতি কৌটা হইতেই কিছু না কিছু বাহির করিয়া প্রতি পান পাতায় দিতেছে।

ডিষ্ট্রিবিউশান শেষ হইলে খিলি তৈয়ার করা। সে ও দেখাব জিনিষ সযত্নে এক একটা পানকে হাতে উঠাইয়া তিন ভাঁজ করিতেছে। আবার এই ভাঁজ করা পান বা খিলি দুইটি করিয়া বাঁ হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যে রাখিতেছে। কনিষ্ঠা অনামিকাতে আট দশটি বা চার পাঁচ জোড় খিলি রাখার পর অনামিকা, মধ্যমার মাঝে আবার একই কায়দায় আট দশটি খিলি, এরপর মাধ্যমা-তর্জনির মধ্যে। এইভাবে খিলি, বানানো শেষ হইলে পর খাবারের রং এ রঞ্জিত একটি ভিজা কাপড়ের টুকরায় খিলিগুলিকে নিয়মানুগ ভাবে রাখা। তারপর পানের খিলিসহ ঐ কাপড়ের টুকরা বা পুটুলীটিকে অয়েল পেপারে মুড়িয়া একটি টিনের ছোট বাক্সে রাখা। টিনের ছোট বাক্সটি লাল্লুসিয়ারামের বাঁদিকে ঝুলানো সাইড্ ব্যাগে থাকে। রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে ব্যাগ হইতে পান তুলিয়া মুখে দেওয়া বেচারার সাধ্যাতীত ছিল। পান খাইতে হইলে তাহাকে কোন এক সুবিধাজনক স্থানে বসিতে হইত। বাঁ কাঁধ হইতে ঝুলা নামাইয়া প্রথমে ঝুলা হইতে টিনের কৌটা বাহির করা, দ্বিতীয়ত টিনের কৌটা হইতে অয়েল পেপারে মোড়ানো পুটলি বাহির করা, তৃতীয়তঃ সাবধানে অয়েল পেপারের পুটলি হইতে খয়ার রঞ্জিত কাপড়ের পুটলি বাহির করা, চতুর্থত এই খয়ার রঞ্জিত কাপড়ের,

ভাঁজ হইতে অতি সাবধানে পানের ছটি খিলি বাহির করিয়া মুখে দেওয়া। পান মুখে দেওয়ার পর আবার উল্টা প্রক্রিয়ায় কাপড়-ভাঁজ, অয়েল পেপারে মোড়ানো টিনজাত করা ও সর্বশেষে ব্যাগে পুরিয়া ব্যাগটি কাঁধে ঝুলানো। এত কসরত করিয়া যেখানে পান খাইতে হয় সেখানে অন্যকে পান সাধার প্রশ্ন আসে না। লাল্লু সিয়ারাম কাহাকেও পান সাধিত না। আমি ব্যতিক্রম ছিলাম। আমি 'পানাসক্ত নই, তবে সিয়ারামের পান আমি প্রায়ই খাইতাম। নিজ মুখে দেওয়ার সময় সে আমাকেও দিত। প্রতিক্ষেপে দুটি খিলি। এত সুন্দর চুনের আন্দাজ যে আলগা চুনের প্রয়োজন হয় না। সব সাচী পান। তাহাতেই আসক্তি ধরিয়া গিয়াছিল।

স্নানের পর নিজের জিনিষগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করিলাম। পায়ে হাঁটা পথে যে সমস্ত জিনিষ অবশ্যই সঙ্গে রাখিতে হইবে সেগুলি এক ভাগে, অন্য ভাগে আছে যে সমস্ত জিনিষ এখানে রাখিয়া যাইব। মাল কমাইতে গিয়া এবং তাড়াহুড়ার জন্যও বটে, পথে দরকারী এমন অনেক জিনিষ ভুলবশতঃ পাহালগামের ক্লোক রুমে রাখিয়া যাই। অমরনাথ যাইতেছি, বাসা হইতে বড়দা যত্নের সহিত কিছু বেল পাতা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ও রৌদ্রে কিছুটা শুকাইয়া অয়েল পেপারে ব্যাগে ভরিয়া দিয়াছিলেন। ঐ বেলপাতা পাহাল গ্রামে থাকিয়া গিয়াছিল।

জিনিষপত্র ঠিক করিতে করিতে নিজেও পোশাক পরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলাম। টেরিউলের প্যান্ট, কাপড়ের জুতা, বক্ষিতের দেওয়া ফুল সাইজ উলের মোজা, গেঞ্জির উপর সুতির ফুলহাতা সার্ট, সার্টের উপর হাফ-সোয়েটার, মাথায় ম্যাঙ্কি ক্যাপ, গলায় মাফলার, হাতে দস্তানা, এবার গায়ে চড়াইলাম নন্দুর দেওয়া জ্যাকেট। "নন্দুর দেওয়া" কথাটা বোধ হয় ঠিক হইল না। কথাটা নন্দুদুলাল দাশগুপ্ত, মৎস্য বিভাগের অফিসার) সত্যিকারের ভাল ছেলে।

আমি কি বিচারে ভাল ছেলে বলি নিম্ন বর্ণিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক আন্দাজ করিতে পারিবেন। নন্দু এক কথায় আলমারী হইতে মাত্র পনর পকেট বিশিষ্ট কাঁধে সোলডার ষ্ট্যাম্প লাগানো, কি রকম একটা 'এয়ার ফোর্স পার্সোনেল' এয়ার ফোর্স পার্সোনেল' ভাব সম্পন্ন জ্যাকেট খানি গায়ে চড়াই, তারপর সাত আট দিন তাহা গা হইতে খুলি নাই। আহার নিদ্রা সবই জ্যাকেট গায়ে রাখিয়া। গুহা হইতে পাহালগামে ফিরার পরও তিনদিন পাহালগামে ছিলাম। তখন আমরা যাহারা গুহা হইতে ফিরিতেছিলাম তাহাদের শীতবোধ যাহারা অমরনাথে যাইতেছিলেন, তাহাদের শীতবোধ হইতে অনেকখানি কম ছিল, আমরা গুহা

হইতে পত্যাবর্তনকারীর দল গায়ে সাধারণ জামার উপর হাফ্ সোয়েটার রাখিতে পারিতেছিলাম না ; আবার ঐ একই তাপাংকে অমরনাথ যাত্রীগণ যাঁহারা সমতল হইতে আসিতেছেন তাঁহারা ফুল সোয়েটারের উপর মাঙ্কিক্যাপ দস্তানা, মাফলার, ইত্যাদির উপরও কেহ কেহ গায়ে কম্বল চড়াইয়া দিব্যি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এ-অবস্থাতে আমি শুধু গেঞ্জির উপর নন্দুর জ্যাকেট পরিয়া সাধুসঙ্গ করিতাম। কে অমরনাথ যাইতেছেন আর কে অমরনাথ হইতে ফিরিতেছেন, গায়ে চড়ানো জামা কাপড দেখিয়াই বলা যায়। জামা-কাপড়ে সন্দেহ দূর না হইলে নাক দেখিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। যিনি অমরনাথ হইতে ফিরিতেছেন, তাঁর নাকে, চোখের নীচে, কপালে, বিভিন্ন অংশ নজর দিলে দেখা যায়, চামবা কাটিয়া রহিয়াছে। অমবনাথ হইতে ফিরিয়াও তিন দিন গেঞ্জিব উপর নন্দুর জ্যাকেট পরিয়া রহিয়াছি। বাত গবমে অসহ্য না লাগিলে নন্দুর জ্যাকেট গায়েই থাকিত। জ্যাকেটটা উপর অংশ ওয়াটারপ্রুফ কাপড ছিল, ভিতরের অংশ লাইনিং। লাইনিং ও ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ের মধ্যে উল। এত সুন্দর ও দামী জ্যাকেটটি আমার যথেচ্ছ ব্যবহারে কয়েক জায়গায় সেলাই খুলিয়া যায়। ফিরত দেওয়ার সময় ঐ ছিঁড়া জাবগাগুলি নন্দুকে শুকনা সহানুভূতি জানানোর জন্য কয়েকটি কথা আরম্ভ কবিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারি নাই। তম্ করিয়া সে বলিয়া বসিল,

: দাদা, নেওয়ার সময় হয়ত লক্ষ্য করেন নাই, আমার জ্যাকেট ত এই এই জায়গায় আগে হইতেই ছেঁড়া ছিল।

সে সেদিন সশব্দ হাসিয়া আমাকে এ ব্যাপারে আর কোন কথা বলিতে দেয় নাই।

এখন পাঠক, তোমার অবগতির জন্য জানাইতেছি, এমন লোককেই আমি ভাল লোক বলি, যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিষটিও এককথায় হাসিমুখে দিবে। আবার নষ্ট করিয়া ফিরত দিলেও হাসিতে হাসিতে বলিবে, 'এ ত আগেই খারাপ ছিল।'

তাই আমার বিচারে নন্দু ভাল ছেলে।

যাহা বলিতেছিলাম, আমি পোশাক পরিয়া ও আমার জিনিষগুলি ভাগ করিয়া প্রস্তুত হইলাম, এবং সিয়ারামকেও, যে যে জিনিষপত্র এখানে রাখিবে। তাহা লইতে বলিলাম। পাহালগাম টুরিস্ট অফিসের সঙ্গেই ক্লোকরুম। আমাদের মালপত্র ঐ ক্লকরুমে রাখিয়া যার যার রিলিট লই। তখন প্রায় সকাল নটা। এবার কুলী ঠিক করা। কুলী প্রচুর। প্রত্যেকেই মাল বহন করিতে চায়। যে কোন হোটেলেও বিশ্বাসী কুলীর সন্ধান পাওয়া যায়। কুলী খুঁজিতে হয় না,

উল্টা কুলীই যাত্রী খোঁজে। তবে এ গতি সাধারণ সময়ে। "ছড়ি শ্রীস্বামী অমরনাথজী" এর সাথে যাহারা ও যে সমস্ত তীর্থযাত্রী যাত্রা শুরু করেন তাঁহাদের কুলী বা ঘোড়া সম্বন্ধে অনেক বেশী সাবধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। কুলী চুরি করে বা যাত্রীকে ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দেয় এমন হয়। যে সংখ্যক কুলী বা ঘোড়া আছে তার চেয়ে। সে সময় অনেক বেশী যাত্রী হয়। সাধারণ চাহিদা যোগান সূত্র অনুসারেই তখন দরের কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না। সরকার চেষ্টা করেন যথেষ্ট, কিন্তু অন্য দশটা সরকারী সাধু চেষ্টার যে পরিণতি আমরা দেখিয়া অভ্যস্ত এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়। সবচেয়ে মারাত্মক আপনি কুলী বা ঘোড়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। পাহালগাম হইতে ছড়ি যাত্রা শুরু করার পর বা ছড়ির সঙ্গে সঙ্গে আপনি যাত্রা করিবেন। কিন্তু এর মধ্যে আপনার ঠিক করা কুলী বা ঘোড়াওয়ালা বেশী টাকা পাইয়া অন্যের মাল কিংবা অন্যকে বহন করিতেছে। আপনি কুলীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন ত করিতেছেনই। বেলা আটটা, সাড়ে আটটা বাজিলে ঐ কুলী সম্বন্ধে সম্পুর্ণ নিরাশ হইয়া অনেক বেশী টাকায়, যদি আদৌ পাওয়া যায় তবে নূতন কুলী ঠিক করিলেন। পাহালগাম হইতে প্রায় দুই ঘণ্টা রাত থাকিতে শেষরাত চারটায় ছড়ির যাত্রা আরম্ভ হয়। যদি কুলী বা ঘোড়াওয়ালা বেইমানী করে, শুধু উৎকণ্ঠা নয় হয়ত সে সময় আপনার যাত্রা আদৌ না হইতে পারে। ছড়ির সঙ্গে যাত্রা করিলে এক সমস্যা, কুলী পাওয়া, আর এখন অনেকে মাল বহনে আগ্রহী। এখন সমস্যা কাহাকে সঙ্গে লই। প্রত্যেকেই সুন্দর স্বাস্থের অধিকারী, সুপুরুষ এর মধ্য হইতে বটকুল গ্রামের গোলাম মহম্মদ মীরকে ঠিক করি। সরকার নির্ধারিত দর ১৩৫ টাকা। আমাদের তিন জনের মাল, ২০ কেজি হইবে না। তার সঙ্গে চুক্তি করিলাম আমাদের মাল ১০ কেজি হইলে ও সে অন্যের মাল লইতে পারিবে না। আর আমাদের মাল যদি ২০ কেজির বেশী হয় তবে আমরা অন্য আর একজন কুলী লইব। আমার ধারণা, যদি লোভের বশবর্তী হইয়া বেশী মাল লয়, তবে তাহার নিকট হইতে যে সেবা আশা করিতেছি, তা নাও পাইতে পারি। যদি কুলীর পিঠে কম মাল থাকে তবে মাল বহন ছাড়াও সে অন্যান্য কাজ বা সেবা অনেক বেশী করিবে। কুলী শুধু মাল বহনই করে না, পিঠে, উর্দ্ধে ২৫ কেজি, এ পথের পক্ষে অত্যন্ত বেশী, মাল লইয়া ও সে যাত্রীর আগে আগে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে। আর কম মাল থাকিলে ত কথাই নাই সে অনেক তাড়াতাড়ি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া যাইবে ও বিশ্রামের প্রচুর সুযোগ পাইবে। বেশী মাল না লওয়ার যে সর্ত আমি আরোপ করিয়াছি তাহা কুলীর বেশী বিশ্রাম হউক, এরূপ কোন সাধু ইচ্ছা হইতে নয়, নেহাৎ স্বার্থ চিন্তা

হইতে যদি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া দেখি কুলী যথেষ্ট বিশ্রাম করিয়া বেশ তাজা হইয়াছে তবে তাহাকে দিয়া অনেক কাজ করানো যায়।

চা আনো, দেখ ত গরম জল পাওয়া যায় কিনা। ঐ স্থানে দেখিয়া আস তাহারা থাকার স্থানের জন্য কত করিয়া লয়। লেপ তোষকের ভাড়া কত? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এরূপ বহু কাজ কুলী দিয়া করানো যায়। আর কুলী যদি প্রচুর মাল লইয়া ধুঁকতে ধুঁকতে যাত্রীর পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছে তবে কুলীর নিকট অন্য সেবার আশা করা ত দূরের কথা, হয়ত উল্টা কুলীকেই সেবা করিতে হইতে পারে।

গোলাম মোহম্মদকে বলিয়াছিলাম—যতটা সম্ভব আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে। জানিতাম, যে যার নিজস্ব গতিতে চলিবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইবে বলিলেও কোন কাজ হইত না। হয়ত সে যাত্রী হাতছাড়া হইয়া যায় ভয়ে তখন গাঁনিয়া লইত সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে, কিন্তু কার্য্যকালে। অর্থাৎ হাঁটা শুরু করিয়াই সে আমদিগকে ছাড়িয়া আগাইয়া যাইত। পথে তার টিকির (এ ক্ষেত্রে নূরের) দর্শন আর হইত না? তাই প্রথমেই কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলি, "যতটা সম্ভব" তাহাতে সুবিধা, সে আগাইয়া যাইবে ঠিকই তবে পথে সুবিধাজনক স্থান পাইলে সে বিশ্রাম করিতে করিতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবে। বাস্তবে ঠিক তাহাই খাটিয়াছিল। গোলাম মহম্মদ আগে আগে চলিয়া যাইত। ২।৩ মাইল গিয়া কোথাও বিশ্রামে করিত। আমরা সেখানে গেলে পর সে হাসিমুখে আমাদিগকে একটু বিশ্রাম করার পরামর্শ দিয়া পিঠে মালপত্র লইয়া আবার রওয়ানা হইত। অমরনাথের পরে কেদার বদ্রী পথের মত রাস্তায় এত চটি নাই। তবে দুই একটি স্থানে অস্থায়ী চা এর দোকানের সাক্ষাৎ মেলে। এরূপ চা এর সন্ধান পাইলে কথা নাই। গোলাম মহম্মদ অবশ্য বিশ্রাম করিতেছে। আমি পৌছাব সঙ্গে সঙ্গে দেখিতাম দুই হাতে দুই গ্লাস গরম চা লইয়া হাসিমুখে গোলাম মহম্মদ আসিতেছে। বাঁ হাতে ধরা গ্লাসটি আর একটু বিশ্রাম করার ফ্রি পরামর্শ দিয়া সোজা কাটিয়া পরিত। "চা এর পয়সা এ দোকানে দিবেন"—বলার প্রয়োজনও সে বোধ করিত না।

গোলাম মহম্মদ বটকুল বা বাটকুল, যাহাই বলুন, গ্রাম নিবাসী। বাটকুল গ্রামের লোক বলিয়াও তাহাকে পছন্দ করি। অমরনাথ যাত্রায় বাটকুল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এরূপ প্রবাদ আছে বাটকুল গ্রাম নিবাসী

কোন এক মেষপালক প্রথম অমরনাথ গুহা আবিষ্কার করে, এরূপ কথাও প্রচলিত আছে, বাটকুল গ্রামের অধিবাসীরাই অমরনাথের দুর্গম পথ রক্ষনাবেক্ষণ বা যাত্রী চলাচলের যোগ্য রাখিত, এবং তার জন্য অর্থাৎ পবিত্র গুহা আবিষ্কারের জন্য প্রণামী কিংবা দুর্গম পথ যাত্রী চলাচলের যোগ্য রাখার জন্য মজুরী আজও বাটকুলের গ্রামবাসীরা পাইতেছে। বাটকুল গ্রামের সকল অধিবাসীই মুসলমান। ভক্ত হিন্দুর দেবতার উদ্দেশ্যে দেওয়া প্রণামীর অংশ বাটকুলের মুসলমান অধিবাসীরা পায়, কৌতূহলী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তাই গোলাম মহম্মদ বাটকুলের লোক বলায় খুব দেরী না করিয়া বা কোনরূপ দরাদরি না করিয়া সরকার নির্ধারিত দরে তাহাকেই কুলী হিসাবে লই। ছড়ি যাত্রার সময় যেমন কুলী বা ঘোড়াওয়ালা সরকার নির্ধারিত দর হইতে বেশী দর লইয়া থাকে, তেমনি আবার অন্য সময় যাত্রীর ঐ সরকারী দর হইতে দরাদরি করিয়া কম দরে কুলি বা ঘোড়া ঠিক করে। কুলী ও যাত্রীর এই দরাদরি সম্পর্কে সরকার দর নির্ধারণ করিয়াই খালাস। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা সাফল্যের সহিত পালন করে। যাত্রী যদি কম দেয় আর কুলী যদি রাজি হয় কিংবা কুলী যদি বেশী দর হাঁকে আর যাত্রী যদি দিতে রাজি হয় তবে নিরপেক্ষ সরকারের আর কি করার থাকে ?

গোলাম মহম্মদ হইতে পরে জানিয়াছি সে ও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় গতবার ও অমরনাথের প্রণামী ভাগ পাইয়াছে এবার ও পাইবে, এ সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ।

অমরনাথের পথে প্রায় দুই মাস যাত্রী চলাচল করে। এই দুই মাসে গুহায় প্রচুর প্রণামী জমা হয়। প্রণামী বলিতে শুধু নগদ টাকাই নয়, রূপার চাঁদ, এমন কি সোনার ত্রিশূল পর্যন্ত ভক্তগণ শিবের উদ্দেশ্যে তুষারলিঙ্গে দিয়া থাকেন। এই প্রণামী সোজা তিনটি সমান ভাগে ভাগ হয়। প্রথম অংশ দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের, দ্বিতীয় অংশ অমরনাথের পূজারী মাতণ্ডের ব্রাহ্মণদের আর তৃতীয় অংশ বাটকুল গ্রামবাসীর, যে গ্রামে সমস্ত অধিবাসীই মুসলমান।

কুলী ঠিক হইল। গোলাম মোহম্মদ জানাইল,

ঃ আপনারা গুরুদ্বারায় যান, প্রস্তুত হউন, আমিও প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি।

কোথায় আমরা বলিব, "বেশী দেরী করিও না," উল্টা সে বলে কিনা, ঃ দেখবেন দেরী করিবেন না, আজ বৃষ্টি সারাদিনেও না ছাড়িতে পারে। "আসুন" বলিয়া সামনেই এক দোকানে লইয়া যায় এবং দোকানে প্লাষ্টিক সীট দেখাইয়া বলে, "একটা

কিনুন," গোলাম মোহম্মদের কথায় অর্ধেক অনুরোধ অর্ধেক আদেশ, এরূপ স্বর ছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে তার কথামত প্লাষ্টিক সীট কিনিয়া দিই।

: দেখুন, আপনাদের মাল আমি বহন করিব। কিন্তু বৃষ্টি হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নয়। এবার আমার পিঠে মালের উপর আচ্ছা করিয়া প্লাষ্টিক সীট বাঁধিয়া দিবেন যেন বৃষ্টির জলে আপনাদের কম্বল না ভিজে। সিয়ারাম সীটটি গোলাম মহম্মদের হাত হইতে লইয়া ভাঁজ করিতে করিতে বলিল,—

: ঠিক আছে, তুমি তৈরা হইয়া আস, আমরা প্রায় প্রস্তুত। সিয়ারাম সীটটি নিজের কাছে রাখিয়া দিল এবং কথা না বাড়াইয়া গুরুদ্বারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল। আমি নিজের জন্য কিছু প্লাষ্টিক সীট কিনিলাম। পথে আরব দেশের লোকেরা যেরূপ টুপি পরে, অনেকটা সেভাবে মাথায় ম্যাঙ্কি ক্যাপের উপর ঐ সীটের একটি টুকরা বেশ কায়দা করিয়া ফিতা দিয়া বাঁধিরা রাখিয়াছিলাম। গায়ে নন্দুর জ্যাকেট ছিল। আমার ধারণা ছিল জ্যাকেটটি ওয়াটার প্রুফ। এখন প্রায় ছয় হাত লম্বা একটি সীটকে দু'ভাঁজ করিলাম। ভাঁজ অংশ আন্দাজ মত কাটিলাম যেন অনায়াসে মাথা গলাইতে পারি। সীটটির এই কাটা অংশে মাথা গলাইয়া, দুই হাতের নীচে দিয়া একটি বাঁধ বুকে ও অপরটি কোমরে দিয়াছিলাম। দেখিতে যেমনই লাগুক এই অদ্ভুত ওয়াটার প্রুফ ব্যবস্থা আমার খুব কাজে আমায় নিজস্ব প্যাটেণ্ট ওয়াটার প্রুফটি ওজনে হালকা, সহজেই ভাঁজ করিয়া সাইড ব্যাগে রাখা যায়, যে কোন স্থানে পাতিয়া বসা যায়, রাত্রে বিছানার নীচে পাতা যায়।

সকাল ১০টা নাগাদ রাস্তায় খাওয়া দাওয়ার পাট পাহালপামের রাস্তায় চুকাইয়া পথের সহায় নীচে লোহার টোপ লাগানো একটি লাঠি কিনিয়া গুরুদ্বারায় ফিরি।

গোলাম মহম্মদ খুব দেরী করে নাই। দুইটি কম্বল ও এনোমিলীয়ামের ঢাকনা দেওয়া পাত্রে বাড়ী হইতে তৈরী কিছু খাবার লইয়া সে আসে। তাহার বাড়ী হইতে জানিলাম, আজ দুপুরের খাওয়া বাড়ী হইতে সারিয়া আসিয়াছে। আজ বিকাল ও রাতের খাবার এবং আগামীকাল সকালের "নাস্তা" বাড়ী হইতে লইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক কুলী ও ঘোড়াওয়ালা এরূপভাবে যতটা সম্ভব বাড়ীর তৈরী খাবার লইয়া রওয়ানা হয়। রাস্তায় অর্থাৎ চন্দনবাড়ী, শেষনাগ-বা পঞ্চতরনীতে যথেষ্ট খাবার পাওয়া যায় কিন্তু দাম অত্যন্ত বেশী। তাই

যতটা সম্ভব বাড়ী হইতে আনা। একমাত্র উদ্দেশ্য পয়সার সাশ্রয় অন্য কোন মতলব নাই।

গোলাম মোহম্মদের মালপত্র কৃত্রিম পরীক্ষা করিয়া নিতান্ত রস সৃষ্টির জন্য বলিলাম,—: তোমার মাল পাঁচ কেজির চেয়ে বেশী। সরকারী—কানুন মোতাবেক তোমার মাল পাঁচ কেজির বেশী হইতে পারে না।

আমি-জানি সে বাড়ী হইতে দাড়িপাল্লা দিয়া মাল ওজন করিয়া আনে নাই। কে জানে তার মালের ওজন কত? তার মাল দশ কেজি হইলেই ক্ষতি কি? মাল-ত আর আমি বহন করিতেছি না। সে অনেক কসরৎ করিয়া বুঝাইল তার মাল পাঁচ কেজির চেয়ে এতটুকু বেশী নয়।

: তবে দেখ, আমাদের মাল চৌদ্দ, পনর কেজির বেশী কিছুতেই নয়।

বাস্তবিক আমাদের মাল বেশী ছিল না। আমার এক বিছানা, সিয়ারাম ও তার স্ত্রীর এক বিছানা।

এখন আন্দাজও করিতে পারি নাই আমার এই জিব-পিছলী কথা, যে বিষয়ে প্রয়োজন নাই সেই বিষয়ের উপর, অর্থাৎ মালের ওজন লইয়া কথা, আমারই বিরক্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইবে।

মহাবীর এই কথাটি হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। সে সিয়ারামের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পথ ছিল। আমার ধারণা সে চন্দনবাড়ী হইতে সিয়ারামের বিছানার সঙ্গে নিজের বিছানাও গোলাম মোহম্মদের পিঠে চাপাইয়া নিজের খালি ব্যাগটি পিঠে দিয়া চন্দনবাড়ী হইতে বাকী পথ তরতর্ করিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে। আমার এই ধারণা অমূলক হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

তাড়াতাড়ি মালপত্র ঠিকঠাক করিয়া পিঠে আচ্ছা করিয়া প্লাষ্টিক সীট দিয়া মুড়িয়া সস্ত্রীক সিয়ারাম ও গোলাম মোহম্মদকে রওয়ানা করাইলাম। মহাবীর ও একই সঙ্গে রওয়ানা হইল। কি একটা সাধারণ কারণে যেন আমার কয়েক মিনিট দেরী হইয়া গেল। এর প্রায় একই সময়ে, এই পনর বিশ মিনিটের আগে পাছে, পুরো মির্জাপুরী দল, ছোট ছোট উপদলে বিভক্ত হইয়া অমরনাথের পথে "জয় বাবা অমরনাথ" বলিয়া পদযাত্রা শুরু করিল।

দলের শেষ ব্যক্তি আমি। একা গুরুদ্বার হইতে বাহির হইতেছি। হাত-ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় ১১টা। বৃষ্টি পড়িতেছে। পায়ে কাপড়ের জুতা, রক্ষিতের মোজা, পরনে টেরিউলের প্যান্ট নীচের দিকে উভয় পায়ে তিন ভাঁজ বা

ফোল্ড করা, গায়ে গেঞ্জি, সার্ট, সোয়েটার, তার উপর নন্দুর জ্যাকেট, গলায় মাফলার, হাতে দস্তানা, মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ, বাঁকাধে ঝুলানো সাইড ব্যাগ, তাহাতে গামছা, সাবান, টর্চ, কাজু বাদাম, কাঠ-বাদাম, বিস্কুট, কিসমিস্, ছোট এলাচ, একটা হোমিওপ্যাথিক ছোট শিশিতে কিছু কর্পূর, প্রয়োজনীয় কিছু ঔষধ ও ছোট ছোট প্লাষ্টার, সব কিছুর উপর একটি ছোট প্লাষ্টিক সীট মাথায় ও একটি বড় সীট গায়ে বাঁধা। হাতে রাস্তার সম্বল নিচে লোহার টোপ লাগানো লাঠি।

সাইড ব্যাগের বিস্কিট, কিসমিস্, কাজু বা কাঠ-বাদাম, রাস্তায় টুক্‌টাক্ মুখে দেওয়ার জন্য। এ পথে বা হিমালয়ের কোন অংশেই হাঁটা পথে বেশী খাইতে নাই। লোভে পড়িয়া দুই চামচ বেশী খাইলেও সারাদিনের রাস্তায় দুই ঘণ্টা দেরীতে পৌছানোর সম্ভাবনা থাকে। শরীর ভারী হইলে হাঁটিতেও অসুবিধা। আবার খাওয়া হইতে বেশী তাপ সৃষ্টি না হইলে হাটার শক্তি ও শীতের জোঝার শক্তি পাওয়া যায় না। খাওয়ার পরিমাণ কম হইবে কিন্তু যেন শরীরে তাপ সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়ক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। তাই আমার ব্যাগে কাজু, কিসমিস্।

ছোট এলাচ ও কর্পূরের অন্য ভূমিকা। হাটিতে হাঁটিতে বিশেষত চড়াই ভাঙ্গার পর চূড়ান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায় হাপাইয়া উঠি। তখন আর নাকে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য হয় না, মুখ একটু ফাঁকা করিয়া শ্বাস গ্রহণ করি ও মুখে শ্বাস ছাড়ি। এরূপ অবস্থায় কাহাকেও দেখিলে বলি "লোকটা হেদাইতেছে।" এরূপ অবস্থায় মুখে দুই তিনটি এলাচ রাখিয়া দিলে খুব আরাম পাওয়া যায়, কিছুটা বিশ্রামের পর জোরে জোরে কর্পূর শুকিলে নাকটা পরিষ্কার হয়। চড়ান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থা হইতে স্বাভাবিক হইতে যতক্ষণ সময় লাগে, কর্পূর ও এলাচ ব্যবহারে তার চেয়ে অনেক কম সময়ে স্বাভাবিক হওয়া যায় ও বেশ আরাম লাগে।

গুরুদ্বারা হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই রাস্তাকে প্রণাম জানাই। নুইয়া রাস্তা হইতে একটু ধূলি লইয়া সোজা হইতে হইতে ধীরে ধীরে ধূলিসহ হাত কপালে বুলাইলাম।

এবার সোজা উত্তরমুখী হাঁটা। গুরুদ্বার হইতে একটু উত্তরে গৌরী শঙ্কর মঠ। মঠকে পিছনে ফেলিলাম। দেখি পিছন হইতে একটি ট্যাক্সি আসিতেছে। এ পথে গাড়ী চলাচল করে না এমন নহে। চন্দনবাড়ী পর্যন্ত গাড়ী চলাচলের রাস্তা। তবে এই সময়ে সরকারী আদেশে গাড়ীতে যাত্রা বহন নিষেধ। খুব ন্যায্য নিষেধাজ্ঞা। এই রাস্তাতে গাড়ী চলাচল করে সত্য তবে আমার বিবেচনায়, রাস্তা গাড়ী চলাচলের যোগ্য নয়। রাস্তার বাঁক সত্যি সত্যিই বিপজ্জনক। গাড়ীর

রাস্তার চড়াই উৎরাই ও স্বীকৃত মান অনুযায়ী নহে। এ রাস্তায় একই সময়ে পদ-যাত্রী, ঘোড়া ও যাত্রীবাহী গাড়ী চলাচল করিলে যে কোন সময় বিপদ ঘটিতে পারে। কিন্তু অমরনাথের ছড়ি যাত্রার সময় সরকারকে চন্দনবাড়ী, শেষনাগ, পঞ্চতরণী বা রাস্তার অন্যত্র অনেক ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হয়, এবং এই কারণে বহু সরকারী গাড়ী চন্দনবাড়ী পর্যন্ত মালামালসহ কিংবা তদারকী অফিসারসহ যাতায়াত করে।

কোন কোন সেয়ানা তীর্থযাত্রী ঐরূপ গাড়ীর সুযোগে থাকে। ড্রাইভারকে পয়সা দিয়া চন্দনবাড়ী পর্যন্ত গাড়ীতে আসে। বেসরকারী দর যাত্রী প্রতি দশ টাকা। দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার। পিছনে ট্যাক্সি দেখিয়া আমি হাত উঠাইলাম। খালি ট্যাক্সি, পোশাক আমাকে কথাবার্তায় ধারণা হইল মালিক স্বয়ং ষ্টিয়ারিং-এ। গাড়ী দাঁড় করাইয়া বলিলেন,

: দেখুন আমি চন্দনবাড়ী যাইতেছি না। আমার বাড়ী ফ্রিসলোনে। মাত্র দুই মাই দূরে। এ রাস্তার শেষ গ্রাম।

: ঠিক আছে। আপনার আপত্তি না থাকিলে ফ্রিসলোন পর্যন্ত যাই।

: না, না, আপত্তি কিসের? ভিতরে আসুন।

তিনি ট্যাক্সির দরজা খুলিয়া আমাকে বেশ যত্নের সহিত ফ্রন্টসীটে বা নিজের সঙ্গে বসাইলেন। বড়শীতে যাহারা দূরে মাছ ধরিতে যান। অনেক সময় দেখা যায়, জীপ বা ট্যাক্সি হইতে তাহাদের ছিপ ট্রেন্‌জিষ্টারের এরিয়েলের মত বাহির রহিয়াছে। আমিও ঐ এরিয়েলি কায়দায় লাঠিটি ধরিয়া ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে ফ্রিসলোনে আসিলাম। পথে আমাদের দলের সবাইকে অতিক্রম করিয়া সবার আগে আমি ফ্রিসলোনে পৌছি। আমি যেমন গাড়ী হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, তাঁহাদের কেহ কেহ আমাকে গাড়ীতে লক্ষ্য করিয়াছিল।

আমি বেশ হাসি হাসি মুখে দলে অন্য আসা পর্যন্ত ফ্রিসলোনে অপেক্ষা করিতেছিলাম। একে একে দলের সবাই আসিলেন। এখানে কিছু স্থায়ী বাসিন্দা আছে। কিছু স্থায়ী দোকান। এ পথের এই শেষ জনপদ ও স্থায়ী দোকান। একদিকে কয়েকটি দোকান, মাঝে পীচের রাস্তা অপরদিকে রাস্তা ঘেসিয়া লিভার নদী!

যে নদীতে তিনটি গতি যথা উচ্চগতি, মধ্যগতি ও নিম্নগতি থাকে তাহাকে ভৌগোলিকগণ আদর্শ নদী বলিয়া থাকেন। কিন্তু আদর্শ নদী বলিতে হয় ত ফ্রিসলোনের লিভার নদীকে বলা উচিৎ।' জল যতখানি স্বচ্ছ হইতে পারে ততখানি

স্বচ্ছ এ নদীর জল। জলে প্রচুর স্রোত তবে মারাত্মক নয়। এই জল দেখিলেই হাত মুখ ধুইত, জলমুখে দিতে ইচ্ছা জাগে।

ক্রিসলোন হইতে আবার যাত্রা শুরু করিলাম। দলের কেহ কেহ অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন "বঙ্গালীবাবু, তুমি ঐ ট্যাক্সিওয়ালাকে বলনা আমাদিগকে চন্দনবাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আসে। পয়সা দিব। দেখ,• এই পথটুকু আসিতেই ভিজিয়া গিয়াছি।"

: এ ট্যাক্সি আর আগে যাইবে না, কথা বাড়ানোর দরকার নাই। সোজা হাঁট।

আমি এবার সত্যি সত্যিই দলের সঙ্গী হইলাম।

রাস্তায় দু একটি ছোট ছেলে হাত পাতিল। জানি, এ রাস্তায় লোকালয় নাই, বেশীদূর এদের দর্শন মিলিবে না। তাই পথের সম্বল হিসাবে যে কয়েকটাকার খুচরা পকেটে লইয়াছিলাম তাহা হইতে খুশী মনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে দিতেছিলাম। এ পথে তীর্থ যাত্রীয় নিকট পয়সা চাওয়া ভিক্ষা নয় ছোটদের একটা খেলা যেন। এককভাবে কমই থাকে। বেশ কয়েকটি ছেলে মেয়ে একসঙ্গে থাকে। দলের একজনের হাতে কিছু পয়সা দিয়া বলিলেই হইল, "সবাই ভাগ করিয়া লইব। কিংবা বড়রা পাঁচ, ছোটরা দশ পয়সা করিয়া ভাগ করিবে।

ফুলের মত সুন্দর, গোলাপের পাঁপড়ির মত গায়ের রং ভিক্ষায় আনাড়ি। যে পয়সাই দাও, তাহাতেই খুশী। পয়সা হাতে পড়া মাত্র সবাই একসঙ্গে সবগুলি দাঁত বাহির করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। এক তীর্থযাত্রীর পর অন্য তর্থযাত্রীর নিবট হাত পাতে। শুধু হাত পাতে বলিলে সবটা বুঝানো হয় না। আদরে জড়াইয়া ধরে। একটি দুইটি শিশু সম্মুখ দিক হইতে পেলে ঠেলিয়া যাত্রীকে আগাইতে দেয় না। যেন বত দিনের।

চিনা পরিচয়। আবার অন্য কায়দাও আছে। দেখা গেল কোমর সমান উঁচু করিয়া একটি বাঁশের দুইদিকে দুইটি শিশু হাসি হাসি মুখে দাঁড়াইয়া আছে। বাঁশ ধরা শিশুদ্বয়ের উৎসাহ দাতা সঙ্গী আরও কয়েকটি বালক-বালিকা।

অঙ্গভঙ্গি, মুখের ভাব সবই বলিতেছে "যেতে নাহি দিব, আগে পয়সা দাও তারপর বাঁশ সরাইতেছি।"

একবার ও দেখি সামনে ঐরূপ এক বাঁশ। এবার ছোটদের ভিক্ষা ভিক্ষা খেলায় এক বয়স্কা কাশ্মীরী মহিলা দর্শক ছিলেন। হয়ত এ দলের কাহারও মা। এবার আমাকেও খেলার মৌজে পাইয়াছে। বাঁশ দেখিয়া আমি হাঁটার

বেগ বাড়াইলাম। ছেলেরা আমার বেগ বাড়ানো দেখিয়া বেশ শক্ত ও উঁচু করিয়া বাঁশটি ধরিল। আমি দ্রুত আসিয়া কেহ কিছু বুঝিবার আগেই ছোৎ করিয়া বাঁশটির তলা দিয়া বাঁশ পার হইয়া পিছন ফিরিলাম। এই অদ্ভুত কায়দায় বাঁশ পার হওয়া ছোটরা কোনরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইতে না পারিয়া 'থ' বনিয়া নির্বাক, বিস্মারিত নয়নে অমার মুখের দিকে বোকা বনিয়া চাহিয়া রহিল। মহিলাটি সশব্দে হাসিতেছে ত হাসিতেছে।

এক সময় ভিক্ষা ভিক্ষা খেলার ছেলেদের দর্শন পাওয়ার পালাও শেষ হইল। শেষ হইল রাস্তায় তীর্থযাত্রী, কুলী বা ঘোড়াওয়ালা ব্যতিত অন্য স্থানীয় বাসিন্দার দেখা পাওয়া। যে যার নিজস্ব গতিতে চুপচাপ হাঁটিতেছি। কোন সময় আমি সামনের তীর্থযাত্রীকে অতিক্রম করিতেছি, কোন সময় হয়ত পিছন হইতে আসিয়া কোন যাত্রী আমাকে অতিক্রম করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। যখন এইভাবে দুই তিন জন যাত্রী একত্র হই, তখন কোন সময় হয়ত সহযাত্রীর সঙ্গে ভদ্রতাসূচক দুই একটি বাক্য বিনিময় করি, কোন সময় হয়ত আদৌ কোন কথা বলি না। এ পথে কথা বলিনে 'আচ্ছা' না বলিলেও কেহ কিছু মনে করেন না। এ সত্য শুধু একমুখী যাত্রীদের বেলায়। অর্থাৎ সবাই যদি অমরনাথ অভিমুখী কিংবা অমরনাথ হইতে প্রত্যাবর্তনকারী হয়। আর যদি দু-মুখী অর্থাৎ গুহার উদ্দেশ্যে যাত্রী আর গুহা হইতে প্রত্যাবর্তনকারী যাত্রীর দেখা হয় তখন "জয় অমরনাথ" সম্ভাষণ বিনিময় করিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করে। সচরাচর গুহা হইতে প্রত্যাবর্তনকারী যাত্রীই প্রথম "জয় অমরনাথ" বলেন।

এই কায়দায় সম্মুখ দিক হইতে আসা কোন যাত্রী 'জয় অমরনাথ' বলিলে আমিও 'জয় অমরনাথ' করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলাম। তবে আজ সব সময় বৃষ্টি। এই বৃষ্টিজনিত কারণেই কিনা কে জানে, বিপরীত দিক হইতে আগত খুব কম যাত্রীই 'জয় অমরনাথ' বলিতেছেন, বৃষ্টিরও বলিহরি যা হউক। সেই ভোর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখন বেলা দেড়টা কোন সময় বৃষ্টির বেগ কমে, বেশ কমে, মনে হয় এ বৃষ্টি নয়, হয়ত কুঁয়াশা, অন্ধকার অন্ধকার ভাব, বৃষ্টি না কুঁয়াশা, স্থির নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞের তদন্ত কমিশন দরকার। আমার দ্বারা নিশ্চিন্তরূপে বলা অসম্ভব। আকাশের যে অবস্থা দেখিতেছি, সারা দিনে এখনও সূর্যের মুখ দেখি নাই। বাকী দিনে তিনি যে অনুগ্রহ করিয়া দর্শন দিবেন, তেমন ভরসা করার ন্যূনতম কারণও পাইতেছি না।

এক সময়ে দেখিলাম চার যুবতী, বয়স পনর হইতে কুড়ির মধ্যে ঘাসের বোঝা মাথায় লইয়া পাহাড় হইতে একে একে নামিয়া বড় রাস্তায় একত্রিত হইতেছে।

তাহাদের ভাবভঙ্গীতে সন্দেহ হইল, এ মেয়েরাও পয়সা চাহিবে। মনে মনে ঠিক করিলাম, যদি পয়সা চায়, তবে আজ স্বচক্ষে যাচাই করিব পিতামহ ব্রহ্মার কলঙ্কের কারণ। পয়সা চাহিলে আমারও সুযোগ আসিবে কথা বলার। আর এ সুযোগে দেখিব কাশ্মীরের মেয়েরা সুন্দর, কত সুন্দর? আর বিশেষভাবে লক্ষ্য করিব মেয়েদের পায়ের সৌন্দর্য্য। পা লক্ষ্য করার কারণ "দেহি পদ পল্লব" গোছের কিছু নয়, উদ্দেশ্য অন্যত্র।

আমার ধারণা সত্য হইল। মেয়েদের মধ্যে যার বয়স কম, সে আগাইয়া আসিয়া পয়সা চাহিল।

: শুধু তোমাকে দিলেই চলিবে? না, সবাইকে দিতে হইবে? এ ঘাস কোথা হইতে কাটিয়াছ? তোমরা সবাই কি এক বাড়ীর? বোন? ক্রিস্ লানে থাক? বড় রাস্তা ধরিয়া বাড়ী যাও? না পাহাড়ের মধ্য দিয়া সটকাট মার? ইত্যাদি বহু কথা। আমার উদ্দেশ্য সফল। মেয়েরা ঘাসের বোঝা নামাইয়া কখনও ঘাড় নাড়িতেছে, কখনও হাসিতেছে। দুইটা জিনিষ পরিষ্কার। তাহারা আমার হিন্দী বুঝিতেছে না, আমি বুঝিতেছি না তাহাদের কাশ্মীরী। কিন্তু একটা জিনিষ বুঝাইতে আমার কোন অসুবিধা হইতেছে না। মেয়েরাও বুঝিতে কোনরূপ অসুবিধা বোধ করিতেছে না। সে জিনিষটি আর কিছুই নয় একটি টাকা নোট নয় ধাতুর তৈরী মুদ্রা। সেই পাহাড়ের উপর গাঁ। লোকসংখ্যা কম; গ্রামবাসীরা স্বভাবতই নিজেদের ভোগের জিনিষ নিজেরা উৎপন্ন করিয়া লয়। তাছাড়া জীবন ধারনের জন্য বিনিময় প্রথার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। এ সমস্ত জায়গায় একটি আস্ত টাকার দাম, আর সমতলের লোকালয়ে একটাকার দাম সমান নয়। আমার হাতে ধরা টাকাটি মেয়ে দিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। কথা একটি ছলমাত্র।

এ মেয়েদের সৌন্দর্যের বর্ণনা করিতে হইলে ভাষার উপর যে দক্ষতা অর্জন করা দরকার তার সহস্রাংশও ও আমার নাই। আমার বিশ্বাস সম্যক দক্ষতা কাহারও নাই। ভাষায় এ জিনিষ ফোটানো যায় না। তাদের হাত, পা, আঙ্গুল, চোখ, মুখ, দেহের গঠন সুন্দর, না এরূপ হাত পাকে সুন্দর বলে, সুন্দর মূর্ত্ত হইয়া আছে প্রত্যেকের শরীরের প্রতিটি অঙ্গে। আর পা। শরীরে এত অঙ্গ থাকিতে কেন আমরা শুধুমাত্র পা এর সময় শ্রীচরণ ব্যবহার করি তার স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়। তবে কোন কোন শিষ্য গুরুদেবের সব কিছুতেই শ্রীদেখেন। গুরুদেবের 'শ্রীমুখ' নিঃসৃত বাণী, গুরুদেবের "শ্রীহস্ত" লিখিত চিঠি, গুরুদেব অনুগ্রহ পূর্বক 'শ্রীঅঙ্গে' চাদর খানি জড়ান ইত্যাদি।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমার উদ্দেশ্য মেয়েদের সৌন্দর্য্য, বিশেষত পায়ের সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করা। আর যদি সম্ভব হয় তবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব পিতামহ ব্রহ্মার কলঙ্কের কারণ। আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি পা। আমার সীমিত ক্ষমতায় পায়ের কথাই বলি। পায়ের গঠন গ্রীক্ স্থাপত্যে দর্শন মিলিলেও মিলিতে পারে, কিন্তু রং? এ রং অন্য আর একটি কাশ্মীরী মেয়ের পা ছাড়া এ দুনিয়ায় অন্যত্র নাই। আলতা বা ঐ জাতীয় কিছু ব্যবহার করিয়া ঐ পাকে সুন্দরতর করার যে কোন প্রয়াস গোলাপফুলের পাপড়িতে তুলি চালাইয়া গোলাপকে সুন্দরতর করার মতই শোচনীয় ব্যর্থ হইতে বাধ্য। যে প্রকৃতি দেবী স্বহস্তে প্রত্যেক পায়ে সাদার উপর লালছে আভা দিয়ে রাখিয়াছেন। এখনকার বিশ্বসুন্দরীরাও সারাদিন ব্যাপী আধুনিকতম বিলাস উপকরণ বা কসমেটিক গালে ঘসিয়াও এ রং ফোটাইতে পারিবে না।

এই হিমালয় কন্যাদের সাজানো বা সুন্দরতর করা সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাহিরে। তবে উপযুক্ত ক্ষমতার অধিকারীর হাতে পারিলে হিমালয় কন্যারাও সুন্দরতর হয় বৈ কি। আর ঐ সুন্দরতর অবস্থায় তাহাদের সামনা সামনি না হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি কৌতুহল অদম্য হয়, আমি দায়িত্ব লইয়া, প্রজাপতি ব্রহ্মার দিবি দিয়া বলিতেছি, কৌতুহল সংযত করুন।

পাঠক স্কন্দ পুরানের নিম্নোক্ত ঘটনা উক্ত পরিস্থিতি বুঝিতে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। স্কন্দ পুরানের মহেশ্বর খণ্ডের কেদারখণ্ড ভাগে শিবের বিবাহের বর্ণনা দেওয়া আছে। হিমালয় কন্যা উমার সহিত শিবের বিবাহ। বরের সহিত বহু বরযাত্রী। ব্রহ্মাও বিষ্ণু বিশিষ্ট বরযাত্রী। "হিমালয় অভ্যাগত ব্যক্তি বর্গের নিমিত্ত মনোহর হর্ম্য সকল প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বাসের নিমিত্ত বিশ্বকর্মা তথায় এক পরম দীপ্তি সম্পন্ন বিশাল ভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর জন্যও সেইরূপ অন্য এক ভবন বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ঐ ভবন আপনা হইতেই দীপ্তিমান, সুচিত্রিত ও মনোরম," বুঝা যায় কন্যালয়েও ব্রহ্মাও বিষ্ণু বিশেষ মর্যাদায় আপ্যায়িত হইয়াছিল। উমাকে বিবাহ সাজে সাজানোর দায়িত্ব সানন্দে শিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতী পালন করিয়াছিলেন। হিমালয় কন্যা উমাকে বিবাহ সাজে কত সুন্দর দেখাইতে ছিল এ সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণ সম্যক বর্ণনা না দিলেও ঐ কেদারখণ্ডের এক স্থানে আছে, "তখন বিবাহ যজ্ঞ আরম্ভ হইলে দেবীর মনোহর নখচন্দ্রের প্রতি লোকপিতামহ ব্রহ্মার দৃষ্টি পতিত হইল। দৃষ্টিমাত্র কমলযোনি সদ্যই স্খলিত বীর্য্য হইলেন। মদনাবেশে তাঁহার বীর্য্য ভূতলে পতিত হইল। রেতঃ ক্ষরণ হওয়ার

পিতামহ তখন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সেই অতি গোপ্য দুর্দ্ধর্ষ বীর্য্য তখন চরণ দ্বারা মর্দ্দিত করিলেন।

সেদিন দুপুরে বৃষ্টির মধ্যে ঘাসের বোঝা মাথায় চারটি কাশ্মীরী যুবতীকে পাইয়া আমার কেন যে স্কন্দ পুরাণ বর্নিত লোক পিতামহ ব্রহ্মার রেতঃ ক্ষরণ হওয়ার ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে মনে উদিত হইল, তার সঠিক কারণ আমি আজও বলিতে পারি না। লোক পিতামহ ব্রহ্মা শুধুমাত্র দেবীর মনোহর নখচন্দ্রব প্রতি দৃষ্টি দিয়াই কেলেঙ্কারী ঘটাইলেন। তাই আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছিলাম পা। উমা হিমালয় কন্যা। তফাৎ সামান্য। এ মেয়েরা সাধারণ পোষাকে আছে, আর তখন উমা বিবাহ সাজে সজ্জিতা ছিলেন। মেয়ে সাজানোর দায়িত্ব ছিল বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতীর উপর।

তাই পাঠক, আমার সাধু উপদেশ, লোক পিতামহ ব্রহ্মা বৃদ্ধ ছিলেন, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শিথিল হইয়া পড়িয়া ছিল, এরূপ কোন কুচিন্তা মনে স্থান না দিয়া, সুন্দর সাজে সজ্জিতা কোন হিমালয় কন্যাকে দেখার জন্য কখন যদিও কৌতূহলী হও তবে সে কৌতূহল স্রেফ দমন করিবে।

এক সময় এই মেয়েদের পর্ব শেষ হইল। নূতন উদ্যমে চন্দনবাড়ীর উদ্দেশ্যে হাঁটিতেছি। একবার বৃষ্টির বেগ এত তীব্র ছিল যে, আর এ বৃষ্টিতে হাঁটাত দূরের কথা দাঁড়াইয়া থাকাও যায় না। সৌভাগ্য বশত নজরে আসিল পথের ধারে এক অস্থায়ী চা-এর দোকান। বৃষ্টির কারণে দেখিতে দেখিতে দোকানে প্রচুর তীর্থযাত্রী একত্রিত হইল। ঐ ছোট দোকানে বসা ত দূরের কথা দাঁড়ানোর স্থান পর্যন্ত পাওয়া কঠিনী হইয়া গেল। দোকানী, দোকানে যতগুলি গ্লাস ছিল তার সবগুলিতে চা তৈয়ার করিয়া ভর্ত্তি করিল। খুব ব্যস্ততার সহিত আমাদিগকে বলিল,—

: তোমরা চা খাও, আর এখানে এখানে বিস্কিট আছে, খাও।

বলিয়া পড়ি-কি-মরি করিয়া এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে তর তর করিয়া নিকটবর্তী পাহাড়ের চুড়া দিকে লক্ষ্য করিয়া উঠিতে লাগিল। আমরা, যাত্রীদল, দোকানীর এই কাজ কারবারে, যথেষ্ট কৌতুহলী হইয়া তাহার অতি দ্রুত পর্বতারোহণ দেখিতেছিলাম। এক সময় সে আমাদের সবার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল।

এদিকে মিনিট পনের পর বৃষ্টি বেশ কমিয়াছে। আবার হাঁটা [illegible] করা যায়।

বৃষ্টির জন্য দোকানে আশ্রয় নেওয়ায়, বিশ্রাম; আবার পেটে চা বিস্কিট পড়ার জন্য একটু তাজা ভাব আসিয়াছে। এবারের বিপত্তি, পয়সা দেই কাহাকে? দোকানী ত নাই। না পারিতেছি দোকান ছাড়িতে, না পারিতেছি হাঁটা আরম্ভ করিতে। অসহায়ভাবে কোথাও আট্‌কা থাকিলে একটা বিরক্তি আসে। একে একে সবাই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছি। প্রায় আধ-ঘণ্টা পর শ্রীমান দোকানীর দর্শন মিলিল। দোকানে পদার্পণ করিতে না করিতেই আমরা তীর্থযাত্রীর দল দোকানীকে স্বাগতঃ ভাষণ মাধ্যমে অভ্যার্থনা করিলাম,—

অপদার্থ! কাণ্ডজ্ঞানহীন! কতক্ষণ বৃষ্টি কমিয়াছে। রাখ পয়সা।

আমাদের সম্মিলিত বাক্যবানের উত্তরে লোকটি ছোট করিয়া বলিল,—

: ছাগল।

ছাগল? বলে কি?

: আমি চা বানাইতে বানাইতে দেখি, আমার একটি ছাগল কি করিয়া যেন দলছুট হইয়া ওই পাহাড়ের চূড়ায় ঘাস খাইতেছে। যদি পাহাড়ের চূড়ার উপরে পশ্চিম পার্শ্বে চলিয়া যায় তবে আর পাইব না। তাই চা বানায়াই চলিয়া যাইতে হইল। আপনাদের যে অসুবিধা হইয়াছে তার জন্য দুঃখিত, আমি মাফ চাহিতেছি।

লোকটি ভদ্র, গুছাইয়া কথা বলিতে জানে। তার কথামত, পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া যাই। এত উপরেও ছাগল উঠিতে পারে?

আর এই দোকানী কি করিয়া আধ-ঘণ্টায় পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত যাতায়াত করিল?

: ঠিক আছে; পয়সা লও।

: আপনারা কে কি খাইয়াছেন জানি না, কত পয়সা হইয়াছে কি করিয়া বলি।

হক কথা। আমরা খাইয়াছি জানি, কিন্তু কোনটার কত দাম জানি না, পয়সা দেই কিভাবে?

তখন আমরা এক এক জন কি কি খাইয়াছি, তাহার ফিরিস্তি দেই, দোকানী কত হইয়াছে জানায়, পয়সা দিয়া দোকান হইতে বাহির হই।

তখন, নিজের মনে একাকী হাঁটিতেছিলাম। বেলা প্রায় ৫টা হইবে।

হঠাৎ অবিষ্কার করিলাম প্রায় চৌদ্দ পনরটি ঘোড়ার দলের মধ্যে আমি একা। পিছন হইতে এ ঘোড়া আলতো এক ধাক্কা দেয় ত অন্য ঘোড়ার উভয় পার্শ্বে চাপানো মালের উপর এক পার্শ্বে পড়িতেছি। এ ঘোড়া হইতে সরিতে না সরিতেই আর এক ঘোড়ার ধাক্কা। আমি যথেষ্ট ভয়ে চিৎকার করিতেছি,—

: ঘোড়াওয়ালা, এই ঘোড়াওয়ালা, এই ঘোড়াওয়ালা,—

কার কি? এক সময়ে ঘোড়াগুলি আমাকে বেশ কয়েকটি ধাক্কা দিয়া এবং যথেষ্ট সন্ত্রস্ত করিয়া, আমাকে অতিক্রম করিয়া গেল। ঘোড়াগুলির ধাক্কায় ও ভয়ে আমি কিরূপ যেন অসহায় অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখি ঘোড়াগুলির অনেক পিছনে চার-পাঁচ জন ঘোড়াওয়ালা বেশ গল্প গুজব করিতে করিতে আসিতেছে।

ঘোড়াওয়ালাদিগকে দেখিয়া আর মেজাজ ঠিক রাখিতে পারি নাই। এতক্ষণের ভয় ও উৎকণ্ঠা রাগে পর্য্যবসিত হইল। যা নয় তাই বলিয়া তাহাদিগকে কতক্ষণ গালি গালাজ করিলাম। আমার গালি-গালাজ পর্ব শেষ হইলে তাহাদের মধ্যে একজন বেশ শীতল স্বরে জানাইল।

: দেখুন, আপনি খালি-খালি আমাদের উপর রাগ করিতেছেন, আমাদিগকে গালি-গালাজ দিতেছেন। আমরা আপনার এতটুকু ক্ষতি করি নাই। যদি আপনার কোন অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া থাকে, তবে আপনার রাগ করিতে হয়, ঘোড়াগুলির উপর রাগ করুন। গালি-গালাজ করিতে হয় ছোড়াগুলিকে গালি-গালাজ করুন।

এরূপ ছোট খাট ঘটনার মধ্য দিয়া সন্ধ্যা, সন্ধ্যা নয় বিকাল বলা ভাল, বিকাল ৭ টায় চন্দন বাড়ীতে পৌছি। এত কায়দা করিয়া প্লাষ্টিক সীট গায়ে মাথায় জড়ানো সত্ত্বে ও, এবং শরীরে ওয়াটার প্রুফ জ্যাকেট থাকা সত্ত্বেও সমস্ত জামা কাপড় ভিজিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে। গেঞ্জিও, আণ্ডারওয়ার পর্য্যন্ত চীপ দিলে টস্ টস্ করিয়া জল পড়ে। চন্দন বাড়ী আসিয়া দেখিলাম গোলাম মোহম্মদ পূর্ব হইতেই হোটেলে থাকার ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে।

সব তাঁবু, এক বড় তাঁবুতে রান্না, আর একটি বড় তাবুতে খাওয়ার ব্যবস্থা—বেশ চেয়ার—টেবিল পাতা, থাকার জন্য ছোট ছোট তাঁবু, এক একটিতে আট দশ জনের থাকার ব্যবস্থা। এরূপ হোটেল বেশ কয়েকটি। প্রায় প্রত্যেক হোটেলের একই চেহারা। শরীরে আর এতটুকু শক্তিও নাই যে কয়েকটি হোটেল দেখিয়া নিজে পছন্দ করিব। থাকার তাঁবু শুকনা দেখিয়া আর দেরী

করি নাই। চাটাইয়ের উপর দেহটি এলাইয়া দিলাম। যতই চন্দন বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতেছিলাম ততই রাস্তায় কাদার পরিমান বাড়িতেছিল। চন্দন বাড়ীর রাস্তায় এক হাটু কাদা। আমরা একে একে কুকিং টেণ্টের সম্মুখ দিয়া ও ডাইনিং টেণ্টের মধ্য দিয়া আমাদের থাকার তাঁবুতে আসিয়াছিলাম। কুকিং টেণ্টের সম্মুখের রাস্তায়, এমন কি ডাইনিং টেণ্টের মধ্যেও যথেষ্ট কাদা ছিল। ডাইনিং টেণ্টের মধ্যে কাঁদা বাঁচাইয়া যাতায়াত করার জন্য বড় বড় কাঠের তক্তা বিছানো ছিল। এরূপ পেচ্‌পেচে ভেচ্‌ভেচে জায়গায় টন্‌টনে্‌ শুকনা থাকার ব্যবস্থা দেখিয়া স্বভাবতই খুসী হইলাম। তাঁবুর মধ্যে প্রত্যেকের থাকার আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। ব্যবস্থা বলিতে এক একটি প্রায় চার আঙ্গুল উচু মাটি পাশে দুই হাত, ও লম্বায় সাড চার হাত, তার উপর মোটা চাটাই বিছানো। প্রতি শোয়ার জায়গার রাত পিছু ভাড়া চার টাকা। গোলাম মোহম্মদ জানাইল, "এখানে লেপ-তোষক ভাড়ায় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটির জন্য চার টাকা করিরা দিতে হইবে"।

ঃ শোন গোলাম মোহম্মদ, আগুন দিবে কিনা জিজ্ঞাসা কর; না হয় শুনিয়া গোলাম মোহম্মদ রান্নার তাঁবুর দিকে গেল এবং বেশ বড় একটি লোহার কড়াইয়ে প্রচুর জলন্ত কাঠ কয়লা ও কিছু শুকনা লাকড়ি সহ হাসিতে হাসিতে ফিরিল।

আমরা আগুন ঘিরিয়া বসিলাম। আমরা দলের সবাই ঐ তাঁবুতে ছিলাম না, সমস্ত তাঁবুতেই আট জনের থাকার ব্যবস্থা তবে যাহারা ছিলাম সবই একদলের, ঐ মির্জপুরী দল।

আগুনে শুধু হাত পা সেঁকিলাম না, প্রত্যেকের জামা কাপড়, মাফলার, দস্তানা, মোজা, ম্যাঙ্কি ক্যাপ, এমন কি কাপড়ের জুতা পর্য্যন্ত শুকাইলাম। আগুনের নিকটে বসিয়াই।

ঃ গোলাম মোহম্মদ—চা—।

গোলাম মোহম্মদ একবার আমাদের নিকট আসিয়া জানিয়া লয় আমাদের আর আর কিছুর দরকার আছে কিনা, আবার পর মুহূর্তেই কি জানি কেন এই ঠাণ্ডায় বাহিরে যায়।

প্রতি তাঁবুর হোটেলেই দুই—তিনটি করিয়া পেট্রোমাক্স জলিতেছে। এই পেট্রোমাক্সের আলোই চন্দনবাড়ীর একমাত্র ভরসা। আমরা যেরূপ তাঁবুতে আছি, সে সমস্ত তাঁবুতে হ্যারিকেন। হ্যারিকেন তাঁবুর ভিতরই ভাল আলোকিত করিতে পারিতেছে না। তবে কড়াইয়ের আগুনে কিছুটা আলোর কাজও হইতেছে।

আগুন পোহান, কাপড় চোপড় শুকানো ও নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব একসঙ্গে চলিতেছিল। চিন্তায় ছিল স্বামী বিবেকানন্দের অমরনাথ যাত্রার বর্ণনা। যে পথে স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা সহ হাঁটিয়াছিলেন, আমি ও কি আজ সেই পবিত্র পথে হাঁটিলাম? যে পথে গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্য গোরক্ষনাথ সহ হাঁটিয়াছিলেন আমি ও কি আজ সেই পবিত্র পথে হাঁটিলাম? কত শত মহাত্মার পদধূলি ধন্য এপথ কে জানে? যাত্রা বর্ণনায় ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন, "অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যময় দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া আমরা তিন সহস্র লোক পুরাবর্তী উপত্যকাটিতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। প্রথম দিন আমরা একটি সরল গাছের বনে তাঁবু ফেলিলাম।"

আমার কপাল দোষে পথের "অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্যময় দৃশ্যাবলী" বৃষ্টিতে ধুইয়া গিয়াছে। হয়ত এই তাঁবুটিও "একটি সরল গাছের বনে।" কিন্তু তাঁবুর বাহির হইয়া দৃশ্য দেখার পরিবেশ বা সামর্থ আর নাই। শরীর পরিশ্রান্ত, জামাকাপড় জুতা শুকানো দরকার, বাহিরে পাহাড় অংশে অন্ধকার, সর্বত্র এক হাঁটু কাদা।

এ অবস্থায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যদি কিছু থাকে ও আমার মাথায় থাকুক। শীতে তাঁবুর ভিতর আগুনের সামনে শ্রম-ক্লান্ত শরীরে তোফা আছি। প্রথম দফা চা-শেষের পর গোলাম মোহম্মদ তাঁবুতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

: আপনাদের কাছে আছে ত?

তার চোখ চক্ চক্ করিতেছিল। "কি আছে?" বুঝিতে না পারিয়া সবাই তার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। এবার গোলাম মোহম্মদ আর একটু ব্যক্ত করিল,

: হুইস্কি, কি ব্রাণ্ডি কিংবা রাম।

প্রত্যেকেই না-বোধক মাথা নাড়াইল। হঠাৎ আমার চিন্তায় আসিল—আমি না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম আর কখনও ড্রিঙ্ক ছাড়া হিমালয়ের বরফের দেশে যাইতেছি না। আগেই যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। ইস্, এবারও ত আনা হয় নাই। যাত্রা শুরুর আগে পাহালগাম হইতে কিনিয়া লইব, এরূপ চিন্তা গতকাল ও ছিল। আজ সকালে, মরা বৃষ্টির জন্য, আজ নিজের তাড়াহুড়ার জন্য বটে শেষ সময়ে আর মদের কথা মনে হয় নাই। এখন কি করা?

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া গোলাম মোহম্মদ হয় ত ভরসা পাইয়া থাকিবে।

সাধারণ ভাবে সবাইকে না বলিয়া এবার সে আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রশ্ন করিল,—

: বাবু তোমার কাছে ও নাহি ?

: না হে।

এবার সে সত্য সত্যই নিরাশ হইয়া তাঁবুর বাহিরে চলিয়া গেল !

আমার কথায় গোলাম মোহম্মদ নিরাশ হইলেও আমার সঙ্গী লাল সিয়ারাম মুনীম্ বা তাঁর স্ত্রী, ডাক্তার, পণ্ডিতজী সবাই যেন নূতন করিয়া স্বস্তি পাইল। আমার নিকট হইতে বাহির হইলে কিংবা আমাকে পানরত দেখিলে তাঁহারা কিছু বলিতেন না সত্য তবে তাঁদের নিকট একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া সৃষ্টি হইত। আমার সঙ্গে তাঁদের যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে আঘাত আসিত। আমার নিকট মদ থাকিলে হয়ত শীতে আরাম পাইতাম। মদ না পাওয়ায় অন্যদিকে লাভ হইল। অবাঙ্গালী মহিলারা আমার সঙ্গে ব্যবহারে তাঁহাদের তরফ হইতে যে সামান্য দূরত্ব টুকু অবশিষ্ট—রাখিয়াছিলেন, তাহা-এক মুহূর্তে দূর করিয়া দিলেন।

সন্ধ্যা শেষ হইয়া অন্ধকার হইতেই রাত আটটা হইয়া যায়। আমরা সাড়ে আটটা নাগাদ ডাইনিং টেণ্টে গেলাম। এতক্ষণের বিশ্রাম এ আগুনের তাপে বেশ চাঙ্গা হইয়াছি। পরিবেশক লোকদের সাথে কোথা হইতে যেন এই সময় গোলাম মহম্মদও আসিয়া হাজির হইল। জানাইল, আজ রাতের খানা বাড়ী হইতেই আনিয়াছে, ঐ খানায় আগামী কালের নাস্তা হইয়া যাইবে। আমরা খাওয়া শেষ করিয়া ঘুমাইলে পর সেও খাইয়া শুইয়া পড়িবে। বুঝিলাম, এর মধ্যে শ্রীমান কোথা হইতে যেন ব্যবস্থা করিয়া পান করিয়া আসিয়াছে। হোটেলে ভাত, রুটি, আলু, পরোটা আর আলু-মটর ও ডাল আছে। আমাদের যাহা ইচ্ছা লইতে পারি। সব গরম গরম পরিবেশন করা হইবে।

: ঠিক হ্যায়, পহেলা গরম পানী দেও।

দলের অনেকের সঙ্গেই পাহালগামে তৈয়ারী করা রুটি তরকারী ছিল। কেহ কেহ ঐ খাবার খাইয়া শুইয়া পড়িল। আমি, রামদাস, আরও কয়েকজন হোটেলে আসিয়াছি। আমি আলু-পরোটা লইলাম। রুটি তৈয়ার করার জন্য মাখা আটা আন্দাজমত গোল গোল করিয়া রাখা আছে, অন্য একটি ডেকসিতে সিদ্ধ আলু গরম জলে ডোবানো। ডেকসিটি চুল্লার নিকটে। আলু-পরোটা বলিতে বোঝায় ঐরূপ একটি মাখা আটার দলা লইয়া তাহাতে একটি সিদ্ধ আলু ছুঁলিয়া বেশ করিয়া

"মিশানো হয়, এবার ঐ মিশানো দলাটি বেলতিতে বেলিয়া একটু ঘি মাখিয়া ভাজিয়া দেওয়া। এরই নাম আলু পরোটা। এক একটির দাম দুই টাকা।

একটি ছোট কটোরায় আলুর দম, কয়েকটি মটর আলুর সঙ্গে অত্যন্ত দীনভাবে কোনরূপ যেন নিজ অস্তিত্ব জাহির করিতেছে—এর নাম "আলু মটর" দাম কটোরা প্রতি তিন টাকা। আর একটি কটোরায় একটু রাজমার ডাল দাম আড়াই টাকা।

"হিমালয়ের পথে পেট ভরিয়া খাইতে নাই" মূলমন্ত্র স্মরণ রাখিয়াও যাহা খাইলাম তাহাতে আমাকে সাড়ে দশ টাকা দিতে হইল। ভাতের কিনার দিয়াও যাই নাই। শ্রীনগর ছাড়ার পর হইতে ভাতের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। আবার শ্রীনগর ফিরিলে ভাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা। ভাতের সঙ্গে এ ব্যবহার আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফসল। চাউল সম্বন্ধে অভিযোগের কোন কারণ নাই। খুব ভাল চাউল। সুগন্ধি। আমরা এ চাউল নিজেদের অঞ্চলে চোখেও দেখি না। এ চাউলে ভাত হয় যে সুন্দর, ধবধবে, সরু সরু, লম্বা লম্বা। ভাত ভাল ফোটে না ভিতরটা কিরূপ যেন কাঁচা-কাঁচা থাকে। গরম ধুমায়িত ভাতের প্লেট সামনে দিলেই ভাতের সবটুকু গরম এক বারেই ফক করিয়া কিছু জলীয় বাষ্প-সহ উড়িয়া যায়। এক গ্রাস মুখে দিতে না দিতেই ভাত ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা কি যাকে বলে "টেলকা" কড়কড়া ভাতে রূপান্তরিত হয়। যে চাউল হইতে ভাত হইয়াছিল, প্রতি ভাত আবার সেই চাউলে প্রত্যাবর্তনে ব্যস্ত হইয়া উঠে। যে সমস্ত বাঙ্গালী ভাত লয় তাহারা কোনরূপ দুই তিন গ্রাস মুখে দিয়াই,—

: সিদ্ধ হয় নাই। ওহে শুনছ, এ-ভাত সিদ্ধ হয় নাই। থাক্ রুটী দাও।
আর হিন্দীভাষীদের অভিব্যক্তি আরও সুন্দর।

: কচ্চা, কচ্চা হ্যায়, বিলকুল কচ্চা, খানেকা লায়েক নেহি, ঠিক হ্যায় ভাই দো রুটিয়া দেও।

আমি যতখানি সম্ভব ঝঞ্জাল এড়াইয়া চলি। ভাতের সঙ্গে সম্পর্ক শ্রীনগরেই চুকাইয়া আসিয়াছি, আবার শ্রীনগরে গিয়া সম্পর্ক পাতিলেই চলিবে। খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া রান্নার তাঁবুতে হোটেলওয়ালাকে পয়সা দেওয়ার সময় চুলার গনগনে আগুনে বেশ করিয়া শরীর গরম করিলাম ও এক সময়ে ঘুমানোর উদ্দেশ্যে নিজের তাঁবুর দিকে রওয়ানা হইলাম। তাঁবুতে দেখিলাম সবাই ভাড়া করা লেপ তোষকের ভিতর হইতে গল্প-গুজব করিতেছে। গোলাম মোহম্মদ আলোচনার

নেতৃত্ব করিতেছে। আমি গোলাম মোহম্মদের সাহায্যে চাটাইয়ের উপর ভাড়াকরা তোষক বিছাইলাম। তোষকের উপর আমার ওয়াড়সহ কম্বল! মাথায় হাওয়া-ভরা বালিশ। প্লেন্ট, সোয়েটার, জ্যাকেট, মাফলার, দস্তানাসহ আমি আর একটি ওয়াড়ওয়ালা কম্বল গায়ে দিয়া শুইলাম। তার উপর গোলাম মোহম্মদ সযত্নে ভাড়াকরা লেপটি ধীরে ধীরে আমার গায়ে চাপাইল। বস্তুতঃ আমি সমস্ত পথেই বাড়ী হইতে নেওয়া আমার ওয়াড়ওয়ালা কম্বল নীচে পাতিয়া এবং আর একটি কম্বল গায়ে দিয়া ঘুমাইতাম। শুধু ভাড়া করা লেপ তোষকে ঘুমাইতে প্রবৃত্তি হইত না। আমার শোওয়ার পর জ্বলন্ত কড়াইয়ে গোলাম মোহম্মদ আর কিছু কাঠ দিল। বুঝিলাম তার বিলক্ষণ ইচ্ছা আর ও কিছুক্ষণ গল্প-গুজব চলুক। এরূপ আরামে আগুনে গরম তাঁবুর মধ্যে লেপের নীচে শরীর রাখিয়া গল্প করিতে আমারও খুব খারাপ লাগিতেছিল না। কিন্তু ঘুম পাইয়া গিয়াছিল। একটি দুইটি কথা বলিয়া ও দুই একবার "হুঁম্, হ্যা" করিয়া কেহ কেহ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমি একটি জিনিষের অনুসন্ধানে ছিলাম। শ্রীনগরে কোন দোকানে দেখি নাই, পাহালগামে বেশ আগ্রহের সহিত দোকানে দোকানে লক্ষ্য করিয়াছি, দেখি নাই। দুই একজন ঘোড়াওয়ালা বা কুলীর সহিত আলাপ করিয়াছি, বুঝাইতে পারি নাই। এবার জিনিষটি গোলাম মোহম্মদকে বুঝাইতে সমর্থ হই। তার নিকট হইতে জানিলাম ঐ জিনিষটির স্থানীয় নাম "পল্হর" বা "পোল্হর"। আমার ধারণা ছিল নারিকেলের রসির তৈয়ারী।

: কত টাকা লাগে বল, আমার একজোড়া চাই।

: টাকা লাগবে না, আমি আপনাকে একজোড়া পহুলর বানাইয়া দিব।

: আহা, নারিকেলের দড়ি লাগবে ত? তুমি কাল সকালেই চার টাকা লইয়া রাখিও।

খুব ভাল জানি টাকা থাকিলেও এপথে নারিকেলের দড়ি পাওয়া যাইবে না।

: নারিকেলের রশির প্রয়োজন হয় না। আমরা একপ্রকার পাহাড়ী লতা দিয়া বানাই। লতাটা শুকনা হইলে ভাল হয়।

: টাকা লও না লও আমার কিন্তু অবশ্যই পল্‌হর চাই।

: কোন চিন্তা করিবেন না। কালই আপনাকে পলহর দিতেছি।

লোকটা কথা খেলাপে উস্তাদ। গুহা পর্যন্ত আমি তার নিকট হইতে পল্‌হর উদ্ধার করিতে পার নাই। আর গুহা হইতে ফিরার পথে পল্‌হরের দরকারই বা কি? সে রাতে পল্‌হরের কথা স্মরণে আসার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব রক্ষিতের। পায়ে রক্ষিতের মোজা ও কাপড়ের জুতা। ফুলসাইজ উলের মোজা আজ সকালে সর্বপ্রথম পাহালগামে পায়ে দিয়াছি। এর আগে গরম মোজা পরার কোন কারণ ছিল না। মোজা পরিতে গিয়া দেখি পায়ের পাতার দিকে বেশ ছেঁড়া। আগে বলিয়া দিলেও হইত। শেষ সময়ে আমার কিছু করার ছিল না। ঐ ছেঁড়া মোজাই পায়ে দিই। পথে মোজা ছেঁড়া থাকার কারণে দুই পায়ের দুইটি আঙ্গুলে বেশ বড় সব ফোসকা উঠিয়াছে। সঙ্গে চার আনা দামের ছোট ছোট প্লাষ্টার ছিল। রাতে পা খোলা রাখিলেও কাল সকালে ঐ ফোসকার উপরই প্লাষ্টার লাগাইয়া তার উপর জুতা মোজা চড়াইব। যদি পায়ের অবস্থা এরূপ খারাপ হয় যে জুতা মোজা পরা হইতেছে না তখন উপায় কি? কষ্ট করিয়া এত পয়সা খরচ করিয়া এতদূর আসিয়া শেষ মেষ পায়ের ফোসকার জন্য ফিরিয়া যাওয়া? মুখে বলিতে পারি "অসম্ভব" কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কি? সম্ভব কি ভাবে? পা ছাড়া যাওয়া? আমি যেখানে আমার পা ও সেখানে। বস্তুত এ রাস্তায়, আমার অনুগ্রহ আমার পা, আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে এরূপ নহে, উল্টোটা অনেক সত্য, পা-এর দয়ায় আমি যাইতেছি।

বিকল্প ঘোড়া। কিন্তু রাস্তা যেখানে খুব খারাপ, কিংবা অনেকখানি পথ পিচ্ছল বরফের চাই এর উপর দিয়া যাইতে হইবে সেখানে সওয়ারীকে হাঁটিয়া যাইতে হয় ঘোড়াওয়ালা লাগাম ধরিয়া ঘোড়াকে ঐ বিপদজনক পথটুকু সাবধানে অতিক্রম করায়। আর একটি বিকল্প হইতে পারে পল্‌হর। অন্য সময় হিমালয়ে লক্ষ্য করিয়াছি দরিদ্র কুলী বা ঘোড়াওয়ালাদের কাহারও কাহারও দরিদ্রতা এত বেশী যে, ঐ বরফের পথেও তাহারা খালি পায়ে যাত্রীকে বা যাত্রীর মালপত্র বহন করিতেছে। এই খালি পা কুলীদের অনেকেই বরফের পথে কিংবা জল-কাদায় একরকম হাতে বোনা দড়ির জুতা পায়ে দেয়। এখন গোলাম মোহম্মদ হইতে জানিলাম, দড়ির নয় একরকম পাহাড়ী লতায় তৈয়ার করা হয় ঐরূপ জুতা যার নাম পল্‌হর।"

—বন্ধিমের অনুগ্রহে আমার অর্জিত যোগ্যতা ছাড়াও 'কেদারের শিক্ষা' আমাকে দড়ির জুতার জন্য আগ্রহী করিয়াছিল। আমি কেদারনাথ মন্দিরে দুই দিন প্রবেশ করি। যে দিন কেদারে পৌঁছি সেদিন বিকালে ও পরদিন সকালে। সেদিন বিকালে প্রবল তুষার পাতের মধ্যে, কি যে অব্যক্ত উৎসাহে, অব্যক্ত উন্মাদনায় কেদারনাথ মন্দিরে গিয়াছিলাম আমিই জানি। সঙ্গের বহু লোক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য, প্রবল তুষারপাতের জন্য কেদারে পৌঁছিয়াও সেদিন আর মন্দির দর্শনে যায় নাই। পরদিনের জন্য মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন মুলতবী রাখিয়াছিল। আশায় 'আশায় ছিল পরদিন' কেদারনাথের দয়ায় রৌদ্র উজ্জ্বল সকালে কেদার মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন শেষে কিছু মুখে দিয়া সোজা সীতাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবে। পরদিন রৌদ্র-উজ্জ্বল সকাল ও দূরের কথা আবহাওয়া আরও খারাপ, তুষারপাত আরও বেশী। এই তুষার-পাতেও কেহ কেহ মন্দিরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হইতেছিল। খবর আসিল, "খারাপ আবহাওয়ার জন্য এখন মন্দিরের দ্বার খোলে নাই। আরও কয়েকবার খবর লওয়া হইল। প্রত্যেকবার একই উত্তর, "এখনও মন্দিরের দ্বার খোলে নাই।" একবার এখবর আসিল "আজ যে কোন্ সময় মন্দির-দ্বার খোলে তার কোন ঠিক নাই। সবই তুষার-পাত ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে।"

আবহাওয়া মন্দিরের দ্বার খোলার জন্য দায়ী, এ আমার, অনেকেরই নূতন অভিজ্ঞতা।

বরফ বা তুষারপাত যদিও বা সহ্য করা যায় বরফগলা জল অসহ্য। বাংলা ভাষায় "শীতল জল" বা "ঠাণ্ডা জল" এর বেশী শব্দ আমার জানা নাই—যদি ইংরেজী কায়দায় "কামরানো ঠাণ্ডা" জাতীয় কোন শব্দ থাকিত তবে হয়ত কিছুটা আন্দাজ দিলেও দিতে পারিতাম। ঐরূপ ঠাণ্ডা জলেও পায়ে জুতা মোজা থাকিলে কোন ভাবে হাঁটা যায়। এরূপ "কামরানো ঠাণ্ডা" জলে জুতা-মোজা পায়ে হাটিয়া প্রবল তুষারপাতের মধ্যে আমি প্রথমদিন বিকালে ও দ্বিতীয় দিন সকালে কেদারনাথ মন্দিরে যাই। মন্দিরের বাহিরে জুতা-মোজা খোলার রীতি। আমি ও খালি পায়ে মন্দিরে প্রবেশ করি। মন্দির চত্বরে বড় বড় চাই। যেখানে বরফ নাই, সেখানে বরফগলা জলে ভিজা স্যাঁতসেঁতে। মহাভারতের কালে পাণ্ডবদের তৈয়ারী পাথরের মন্দির। আমার দুইবারের একই অভিজ্ঞতা। খালি পায়ে মন্দির চত্বরে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দু-পায়ের গোড়ালীর নিচ হইতে দুইটি হিম প্রবাহ শীর্ শীর্ করিয়া শরীরের পিছন

দিক দিয়া, ব্লাড-প্রেসার মাপার যন্ত্রের পারদের মত দ্রুত উপরদিকে উঠিতে থাকে। এই হিম প্রবাহ মেরুদণ্ডের শেষ কসারুতে একত্রিত হইয়া, একই গতিতে, মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া উপর দিকে উঠিতে থাকে। এই প্রবাহ যত উপরের দিকে উঠিতে থাকে, নীচের ততখানি অংশই যেন কিরূপ অসাড় হইয়া যায়, যেন কোনরূপ বোধ শক্তি নাই। দ্রুত এই প্রবাহ ব্রহ্মতালুতে পৌঁছে। সমস্ত শরীর অসাড় বা বোধশক্তি রহিত হইয়া যায়। বিষয়টি বুঝাইতে যত সময় গেল বা কাহাকেও বলিলে যত সময় যায় তার অনেক কম সময়ে ঘটনাটি ঘটিয়া যায়। এরূপ শীতল অভিজ্ঞতা অর্জন করা জীবনে বেশীবার দরকার হয় না। আমার পক্ষে দুইবারই যথেষ্ট। তৃতীয় অভিজ্ঞতা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য "পলহর" এত যাত্রীর মধ্যে দু-একজনকে দেখিয়াছি পলহর পায়ে দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে। জুতা-মোজার প্রবেশাধীকার না থাকিলেও পলহর এর আছে। আমার ধারণা মন্দিরের ভিতর পূজারী ঠেকায়-বেঠাকায় পলহর পায়ে দেয়। অমরনাথ গুহায় দেখিলাম এক সন্ন্যাসী কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া দিব্যি হাঁটিতেছে। আমাদের অর্থাৎ খালি পায়ের যাত্রীদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। গুহায় স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ কি করিয়াছিলেন? ভগিনী নিবেদিতা তার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন, "মাথার উপর পারাবতকুল ঝটপট শব্দ করিয়া উড়িতেছে, ইত্যবসরে তিনি অলক্ষিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া দুই-তিন বার প্রণাম করিয়া লইলেন, তৎপর পাছে ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া পড়েন, এই ভয়ে তিনি উঠিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।" এখন যদি কেহ প্রশ্ন করেন, ভগিনী নিবেদিতার বই তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া কোথাও পাই নাই, স্বামীজি স্বয়ং বলিয়াছেন "গুহায় ভাবাবেশে আত্মহারা হওয়ার ভয় ছিল।" "তিনি উঠিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।" —এ সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রশ্ন নাই। প্রশ্ন "ভাবাবেশে আত্মহারা হওয়ার ভয়ে" বাহির হওয়া ভগিনী নিবেদিতার নিজস্ব ধারণা। যদি কেহ যুক্তি দেখায় মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডায় শরীর প্রায় অবশ হওয়ার মুখে তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন তবে কি তাহাকে স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্বেষী হিসাবে চিহ্নিত করা হইবে? ঠাকুর জানেন।

আমার পলহর প্রয়োজনে। পলহর এর জন্য গোলাম মোহম্মদকে বলিতে বলিতে ও সারাদিনের প্রচণ্ড পরিশ্রমের ক্লান্তিতে চোখের পাতা আপনা হইতেই বুজিয়া আসিতেছিল। এক সময় নিজের অজ্ঞাতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পঞ্চম অধ্যায়

আজ ১৮ই আগস্ট সোমবার। ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। দেখিলাম এর মধ্যেই সঙ্গের কয়েকজন আজকের যাত্রার প্রস্তুতি নিতেছে। চন্দনবাড়ী শেষনাগ হ্রদের তীরে অবস্থিত। এখানে এই নদকে কেহ কেহ নীলগঙ্গা বলিয়া থাকেন, নদীর জলের রং নীলাভ। তাঁবুগুলি নদীর নিকটেই। পাঠক, কোনরূপ লাজলজ্জা বোধ থাকিলে এপথে পদার্পণ না করা বাঞ্ছনীয়। অন্তত মানসিক প্রস্তুতি এমন মজবুদ থাকা চাই, যেন শেষ লোকালয়েই লাজলজ্জা জমা রাখিয়া আসা যায়। ফিরৎ পথে ঐ লোকালয় হইতে লাজ-লজ্জাসহ দেশে ফিরলেই হইল। এত কথা বলার কারণ এতটুকু লাজ-লজ্জা বোধ থাকিলেও এ সমস্ত স্থানে প্রাতঃকৃত্য করা অসম্ভব। কি পুরুষ, কি মহিলা, সবার জন্য এ কথা সমান সত্য।

লজ্জার মাথা খাইয়া সকালের অশালীন কাজটি সমাধা করিলাম।

চা-পরোটা খাইয়া খুব একটা দেরী করি নাই। গতকালের মতই সমস্ত পোশাক আসাকের উপর প্ল্যাষ্টিক সীট বাঁধিলাম। নূতন গহনা পায়ের আঙুলে প্লাষ্টার জুতা মোজার মধ্যে।

দেখিতে দেখিতে সূর্যের আলো আসিল। একদম নির্মেঘ আকাশ। গত কালের সাথে আজকের আবহাওয়ার রাত-দিন ফারাক। আজ সকাল সাড়ে সাতটায় বাঁকাধে সাইডব্যাগ ও ডান হাতে, নীচে লোহার টোপ লাগানো লাঠি, লইয়া শেষনাগের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। আমার বহুদিনের স্বপ্ন শেষ-নাগ। আমার ধ্যানে-জ্ঞানে শেষনাগ। শেষনাগের কিংবদন্তি চিন্তা করিতে করিতে রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে নিজের মনে একাকী হাঁটিতেছিলাম। একাকী হাঁটিতে ছিলাম কথার অর্থ এই নয় যে সেদিন আমি একা চন্দনবাড়ী হইতে শেষনাগ যাইতে ছিলাম। শেষনাগের পথে অনেকেই ছিলেন, কেহ বা আমার মত পদযাত্রী, কেহ ঘোড়ায়, আমি নিজের চিন্তায় আত্মস্থ ছিলাম। এ অবস্থায় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সুন্দর, না অপূর্ব কিংবা সাধারণ কিছুই বলিতে পারিব না। চন্দনবাড়ী হইতে মাইলখানেক ও যাই নাই হঠাৎ দেখি সম্মুখে একটি মস্ত বড় শ্বেতপাথর। দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া নীলগঙ্গা। আমি বাঁদিকের পাহাড় ধরিয়া হাটিতেছি। আমার ডান দিকে বেশনীচে দিয়া স্ফটিকস্বচ্ছ নীলাভ জল প্রবলবেগে ও সশব্দে বহিয়া যাইতেছে। এই জল

ধারার ডান দিকে আর একটি পাহাড়। দুই পাহাড়ের পাদদেশের মধ্যে দূরত্ব কিছুই নয়, নীলগঙ্গার বিস্তার সমান, কয়েকহাত মাত্র। দুই পাহাড়ের চূড়ার ব্যবধান একমাইল বাঁ তারও বেশী। বাঁ দিকের পাহাড়ের যে উচ্চতায় শেষনাগের পথ, ঠিক সম-উচ্চতায় ডানদিকের পাহাড়ের দূরত্ব প্রায় ২৫০ আড়াইশ মিটার। ঐ মস্ত বড় শ্বেত-পাথরটি দুইটি পাহাড়ের মধ্যে সেতু স্বরূপ। এত বড় শ্বেতপাথর দেখিয়া মনে খুব আনন্দ হইল। পাথরটি উত্তরে দক্ষিণে বিস্তৃত। দক্ষিণ অংশের নীচের দিকে ধনুকের মত বাঁকিয়া আছে, ফাঁপা। এই ফাঁপা অংশ দিয়া নীলগঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। উত্তর অংশে সিঁড়ি কাটা আছে। এই সিঁড়ি দিয়া পদযাত্রী, ঘোড়া প্রভৃতি শ্বেত পাথরটির উপর উঠিতেছে। পাথরটির শেষ কোথায় আমি দূর হইতে দেখিতেছি না। বুঝিতেছি এই শ্বেতপাথরের উপর দিয়া আমার রাস্তা। আমি শ্বেতপাথরটির নিকটবর্তী হইলাম। তখনও বুঝি নাই। প্রথম সিঁড়িতে একপা রাখিলাম, দেখি ভিজা স্যাঁতসেঁতে, তখনও বুঝি নাই। বুঝিতে বুঝিতে আমার তিন চার সিঁড়ি গেল। দেখিলাম এতক্ষণ যাহাকে শ্বেতপাথর ভাবিয়াছিলাম তাহা শ্বেতপাথর নয়, বরফ, বরফের মস্ত বড একটি চাঁই। এবার পূর্বেব শ্বেতপাথব দর্শনের আনন্দ বহুগুণ বাডিয়া গেল। আর কি পরিমাণ যে অবাক হইলাম, তাহা বর্ণনার অতীত। এবার নূতন উদ্যমে একটি দুইটি করিয়া গুনিয়া গুনিযা সিঁডিগুলি অ'রোহণ করিতে লাগিলাম। মাত্র ৬৫টি সিঁড়ি। বরফ, বরফ, সবই বরফ, ববফময়। বরফটির উপর উঠিযা দেখিলাম, উত্তরেব যে অংশে সিঁডি দিয়া পদযাত্রী চলাচল করেন, কিংবা যাত্রী বা মালসহ ঘোড়া, একমাত্র সেই অংশে কিছু ববফ গলিয়া সিঁড়িটি ভিজা স্যাঁতসেঁতে করিতেছে। ববফচাঁই এব অন্য কোন অংশে এতটুকু বরফও গলিতেছে না। লক্ষ্য করিলাম, লোক চলাচল পথের, এস্থানে সিঁড়ির বরফ গলার কারণ আমারই মত সমস্ত পদযাত্রীর নীচে লোহার টোপ লাগানো লাঠি আছে। এই লাঠির আঘাতে কোন কোন সময়, এই এতটুকু, একটিপ নস্য আন্দাজ বরফের গুডা মূল চাঁই হইতে উঠিয়া আসিতেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর এই গুড়াগুলি গলিয়া জল হয়। আবার ঘোড়ার খুরের নীচে লোহার নাল লাগানো থাকে। এই নালের আঘাতেও কোন কোন সময় মূল চাঁই হইতে এক একটি ছোট ছোট টুকরা আলগা হয়। ঐ টুকরাগুলি গলিয়া জল হয়। বরফগলা জল, সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে থাকে, সে কারণে সিঁড়ি ভিজা স্যাঁতসেঁতে। এই বরফ চাঁই এর অন্যত্র এরূপ কোন স্যাঁতসেঁতে ভাব নাই।

বরফ-চাঁই পার হইয়া আবার মাটির বা পাথরের স্বাভাবিক রাস্তায় আসিলাম। রাস্তার একপাশে P. W. D.র সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড। তাহাতে লেখা আছে,

"Avoid Short Cuts
Fellow the Track."

আর একটু যাওয়ার পর নজরে আসিল পিশু-ঘাঁটি। যদিও পিশু শব্দটির সঙ্গে শিশু শব্দটির যথেষ্ট ধ্বনিগত মিল আছে তবু কেহ যেন এধারায় চিন্তা না করেন তারজন্য পূর্বেই সতর্ক করিতেছি।

অনেকে মনের সুদূরতম কোন একটি ছোট্ট বাসনা অতি আদরে, অতি যত্নে লালন করেন যেন তীর্থস্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়, নিদেন পক্ষে তীর্থপথে মৃত্যু। পাঠকগণের কাহারও যদি এরূপ কোন মহান ইচ্ছা থাকে, তীর্থপথে মৃত্যু,' আমি তাঁহাকে পিশু-ঘাঁটি আরোহন করার জন্য সাদর আহ্বান জানাই। আপনার দায়িত্ব অতি সামান্য। 'সটকাট' এভয়েড বা পরিহার না করা বাকী সমস্ত দায়িত্ব বাবা অমরনাথের। সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

চন্দনবাড়ীর উচ্চতা ৯,৫০০ ফুট। পিশুঘাঁটির চূড়ার উচ্চতা ১৩,৫০০ফুট। চন্দনবাড়ী হইতে পিশুঘাটির পাদদেশ না হয় আরও ৫০০ ফিট বেশী উচ্চ ধরিলেও পিশুঘাঁটির পাদদেশের উচ্চতা ১০,০০০ ফুট। পাদদেশে হইতে চূড়া পর্য্যন্ত track বা পাকডণ্ডির পথ দেড়মাইল। দেড়মাইল রাস্তায় ৩,৫০০ ফিট উচ্চতা আরোহন। মোটামুটি হিসাবে সোওয়া দুই ফুট রাস্তায় একফুট উচ্চতা আরোহনের ব্যবস্থা। সবখানে উৎবাইয়ের এই গতি বা ধারা সমান নয়। কোনখানে বেশী কোনখানে কম' যে সমস্তস্থানে উচ্চতার এই ধারা বা গতি বেশী সে সমস্ত স্থানও অতিক্রম করিতে হয়।

পিশুঘাঁটির পাকডণ্ডির পথ অনেকটা ইংরেজি বর্ণমালার জেড (Z) এর ন্যায়। একটি জেড এর মাথায় আর একটি জেড তার উপর আর একটি জেড, এইরূপ ভাবে পর পর বহু জেড একটির উপর আর একটি স্থাপন করিলে যেরূপ দেখিতে হয়, পিশুঘাঁটির পথ অনেকটা সেইরূপ।

পর্বতের পাদদেশ হইতে উপরের অনেকখানি পর্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া আরোহনরত যাত্রীদিগকে দেখা যায়। উপরের মানুষ বা ঘোড়াকে এই এতটুকু এতটুকু দেখায়। মনে ভয় হয়, "বা-বাহ! এত উপরে উঠিতে পারিব ত?"

-পর্বতের মাঝামাঝি আসিলে নীচের যাত্রীকে বা পর্বত-শীর্ষের যাত্রীকে ছোট ছোট দেখায়। তা ছাড়া। তা ছাড়াও অনেক ব্যক্তব্য আছে। পিশুঘাঁটির জেড মার্কা রাস্তা না হয় বাটকুলের মুসলমানেরা বানাইয়াছে। এই সর্টকাট কে বানাইল ? পর্য্যবেক্ষণের পর যাহা বুঝিয়াছি এই সর্টকাট নশ্বর দেহধারী কাহারও তৈরী নয়। স্বয়ং প্রকৃতি দেবী খেলার ছলে প্রতি বৎসর নূতন নূতন সর্টকাট বানাইতেছেন, কোন কোন পুরাতন সর্টকাটকে আরও প্রসস্ত করিতেছেন, কোনটিকে বা বন্ধ করিয়া দিতেছেন। বর্ষার জলধারা যখন প্রচণ্ড গতিতে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসে, তখন সব সবময়ই যে রীতি মানিয়া জেড এর বাহু ধরিয়া (মনে করি একটি জেড এর তিনটি বাহু) নীচে নামিবে এমন কোন বাধ্য বাধ্যকতা ঐ জলধারার নাই। একবর্ষায় যে যে স্থানে বেপথে জলধারা জেড এর একবাহু হইতে অন্য বাহুতে নামে, সেই সেই স্থান পরবৎসর অমরনাথের রাস্তা খুলিলে পর, সর্টকাট হইয়া রহিয়াছে, দেখা যায়। জেড এর বাহু ধরিয়া পর্বতশীর্ষে আরোহণ করিতে যতটা পথ অতিক্রম করিতে হয় ; বর্ষার জলধারা সৃষ্ট সর্টকাটের পথে আরোহণ করিলে স্বভাবতই এর চেয়ে কম পথ অতিক্রম করিতে হয়, সময় কম লাগার কথা। যদি তীর্থপথে মৃত্যু কামনা আপনার মনের কোনে কোথায়ও সুপ্ত থাকে তবে এই সর্ট'কাটের আশ্রয় লইয়া শেষ পরীক্ষা করিতে পারেন।

অমরনাথের পথ দুর্গম। ভারতে অবস্থিত হিন্দুদের তীর্থস্থান সমূহের মধ্যে দুর্গমতম। অমরনাথ পথের মধ্যে সবচেয়ে দুরূহতম অংশ পিশু-ঘাঁটি। তবে রাস্তার কোন অংশে আপনি কতটা কষ্টভোগ করিবেন তাহা নির্ভর করে আপনার কপালের উপর। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে এই দুরূহতম অংশও অনেক স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করিতে পারেন। অমরনাথের পথে সবচেয়ে সহজ অংশ পাহালগাম হইতে চন্দনবাড়ী। গাড়ী চলাচলের রাস্তা। কিন্তু এই অংশটি হাটিতে গতকাল যে কষ্ট সহিতে হইল, সেইরূপ কষ্ট এ যাত্রা পথে আর কোনদিন সহিতে হয় নাই।

পিশুঘাঁটি উঠিতে দেখা যায় বড় বড় পাথর রাস্তার এদিকে সেদিকে, এমনকি রাস্তার উপরও পড়িয়া রহিয়াছে। এরূপ প্রবাদ আছে যে দেবাসুর যুদ্ধে, এখানে অসুরেরা চূড়ান্ত পরাজিত হইয়া মৃত্যু বরণ করে। মৃতদেহের কোনরূপ সৎকার হয় নাই। অসুরের হাড়ে তৈরী এই পাহাড়। এ কাহিনীর কোন অনুমোদন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে পাই নাই। বিশ্বাস উৎপাদনে কাহিনীটি খুব দুর্বল,

পিণ্ডঘাঁটির পাকডণ্ডি ধরিয়া উপরে উঠিতেছি। পথে দুইটি অবাঙ্গালী যুবক অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া প্রায় চলৎশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একটু একসঙ্গে দাঁড়াইলাম। প্রত্যেককে দুইটি দুইটি করিয়া এলাচ দিলাম। নিজেও দুইটি এলাজ মুখে দিয়া তাহাদিগকে মুখে দিতে ইঙ্গিত করিলাম। এলাচ মুখে দেওয়ার কতক্ষণ পর হোমিওপ্যাথি শিশিতে রক্ষিত কর্পূর নাকে শুঁকিয়া তাহাদিগকেও শুকাইলাম। এ সময়ে এমন অসম্ভব দুইটি জিনিষ পাইয়া ও জিনিষগুলির কার্য্যকারিতা দেখিয়া তাঁহারা সকৃতজ্ঞ হাসি হাসিল। আমিও হাসিয়া বা-হাত 'টা-টা' ভাবে উপরে উঠাইয়া আবার হাঁটা আরম্ভ করি। পরদিন আবার তাঁহাদিগকে সেইরূপ চূড়ান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায় একপা একপা করিয়া মহাগুনাশ টপ অতিক্রম করিতে দেখি। আমি সেদিন ঘোড়ায় ছিলাম, মহাগুনাশেও কথা বলার অবস্থা তাঁহাদের ছিল না। আমাকে দেখিয়াই যেন কতদিনের পরিচিতি, কিংবা আমার কাছে তাদের এলাচ গচ্ছিত আছে, এরূপ মনোভাবে, কোন কথা না বলিয়া, আমার দিকে হাত বাড়ায়। এবার তাদের হাতে বেশ কয়েকটি এলাচ দিই। আবার সকৃতজ্ঞ হাসি। সে সময়ও কোন বাক্যালাপ হয় নাই। এরপর তাঁহাদের সঙ্গে আর দেখা হয় নাই।

পথে শরীরের কি অবস্থা হয়, কষ্ট কতখানি, কত ব্যাপক, উপরিউক্ত ঘটনায় কিছুটা আন্দাজ করা যায়। দুইদিনে একবারও কথাবার্তা হয় নাই পরিশ্রান্ত শরীরে ঘন ঘন সশব্দে শ্বাস ছাড়া ব্যতিত আর কোন কিছু করিতেই ভাল লাগে না।

হাঁটিতেছি। আমি হাঁটিতেছি। একসময় একটি সাইনবোর্ড নজরে আসিল, "You are more than half way up. Do it steadily" P. W. D. এতক্ষণে মাত্র half way up. এ পথ কি আর শেষ হইতে জানে না। আমার দ্বারা হইবে ত। মনে মনে কল্পনা করিতেছি আর হাঁটিতেছি। আমি হাঁটিতেছি।

যে স্বভাব মরলেও যায় না তাহা পিণ্ডঘাঁটিতে যাইবে এতখানি আশা করা বৃথা। পর্বতের চূড়ার উপরে কিছু দেখার নাই, কিংবা পর্বতের পাদদেশে, নীচের দিকে। পিণ্ডঘাঁটি আরোহণের সময় সবসময় উপরে বা নীচে চলমান তীর্থযাত্রী বা ঘোড়া দেখা যায়। একমাত্র পাদদেশের যাত্রী পিছনে অন্য যাত্রী দেখিতে

[illegible] কি[illegible]। [illegible] চূড়ায় যাঁহারা আরোহণ করিয়াছেন তাঁহারা সম্মুখে যাত্রী থাকিলে দেখিবেন কিন্তু উপরে নয়।

নীচু হইতে লক্ষ্য করিতেছিলাম একটি ছোট ছেলে বিপাকে পড়িয়াছে। ঘন ঘন বসিতেছে, বিশ্রাম করিয়া আবার হাঁটিতেছে। পায়ের উপর যেন কবটা নিয়ন্ত্রণ নাই। পা কিছুটা টলিতেছে। এমন ভাবে শ্রীমান বেশীক্ষণ হাঁটিতে পারিবে না চিন্তা করিয়া পাকদণ্ডির পথে যতটা সম্ভব দ্রুত হাঁটিয়া তাহাকে ধরিলাম। ওঃ হরি, সবই ঠিক আছে। দূর হইতে দেখা প্রায় সবই ঠিক আছে। পায়ে কাপড়ের জুতা, মোজা, পরণে পা-জামা, গায়ে পাঞ্জাবী, সোয়েটার, গলায় মাফলার, হাতে দস্তানা, মাথায় ম্যাঙ্কিক্যাপ, বাঁ-কাঁধে ঝোলানো সাইডব্যাগ, ডান হাতে নীচে লোহার টোপ লাগানো লাঠি, বেঠিক অতি সামান্য, শ্রীমান নয় শ্রীমতী, বালক নয় বালিকা। বালিকা বলিতে যে বয়স বুঝি তিনি সে বয়স অনেক আগেই পার হইয়া আসিয়াছেন। বয়স আন্দাজ ত্রিশেক। এরূপ পোশাকের জন্য ভদ্র মহিলার বয়স সম্বন্ধে আমার ধারণা মারাত্মক রকমের হেরফের হইতে পারে।

প্রথমেই ভদ্রমহিলাকে রাস্তার একপাশে দাঁড় করাই। বসিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতে নিষেধ করিলাম। বিশ্রাম করার সময় দাঁড়ানো অবস্থায় কোন পাথরে ঠেস দিয়া শরীরের ওজন সম্পূর্ণভাবে পাথরের উপর ছাড়িয়া বিশ্রাম করিতে বলিলাম। কতক্ষণ বিশ্রামের পর এলাচ দিলাম, নিজেও দুইটি এলাচ মুখে পুরিলাম। এলাচের কতক্ষণ পর কর্পূর অবাঙ্গালী পোশাক দেখিয়া হিন্দীতে কথা বলিতেছিলাম, মহিলা দু একটি কথা হিন্দীতে বলা মাত্র বুঝিলাম, বাঙ্গালী বাংলায় কথাবার্তা শুরু হইল। কাঁদো কাঁদো গলায় ভদ্রমহিলা জানাইলেন সঙ্গের সবাই উপরে উঠিয়া গিয়াছে। তিনি একা পড়িয়া রহিয়াছেন। আর চলিতে পারিতেছেন না। দলে এগার জন। পাঁচজন মহিলা। দুইটি ঘোড়া ভাড়া করা আছে। দলের মহিলারা পালা ক্রমে ঘোড়ায় যাইবেন। তিনি শিক্ষয়িত্রী। টুকরা টুকরা কথা। সবাই চলিয়া যাওয়ায় দলের অন্যদের প্রতি একটা চাপা অভিমান। ঘোড়া দুইটাও চলিয়া যাওয়ায় একটা অসহায়ভাব।

অন্য কোথায় ও এমন সাক্ষাৎকার হইলে আমার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইত বলিতে পারি না, তবে এখন এই পিণ্ডঘাঁটির পাকডণ্ডির পথ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ভদ্রমহিলার অসহায় ভাব দেখিয়া আমি আন্তরিক সহানুভূতির সহিত তাঁহাকে

সাহায্য করিতে প্রস্তুত হই। তবে আমার স্বভাব। রামাছাড়া কোন কিছু সুচারুরূপে শেষ করিতে পারি না। কতখানি উঠিয়াছি? চূড়া আর কত দূর? চূড়ায় পৌঁছিতে আর কতক্ষণ লাগিবে? পথের বাকী অংশ কি, যে অংশটুকু অতিক্রম করিয়াছি, তার চেয়ে তুলনামূলক ভাল না খারাপ কিছুই জানি না। বলিলাম, "আমরা অলমোস্ট নাইন্টি টু নাইন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পথ ক্রস করিয়াছি। এ পথের বাকী অংশের গ্রেডিং অনেক ভাল। এ অংশে আর বিশেষ অসুবিধা নাই।" হাত ঘড়ি দেখিয়া বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলাম, আর হাউলি দশ থেকে পনরো মিনিটের পথ। ব্যাস্। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনাকে একা ছাড়িয়া আমি যাইতেছি না। যতক্ষণই লাগুক আমরা একসঙ্গেই যাইব।

ধাপ্পায় কাজ হইয়াছিল। মাঝে মধ্যে একটি দুইটি কথা কহিতে কহিতে ভদ্র-মহিলাকে সঙ্গে লইয়া হাঁটিতেছিলাম। একসময়ে সম্মুখে দেখি একটি সাইনবোর্ড। একি? বোর্ডে লেখা আছে, "Just a Hop You are on Pissu Top." P. W. D. আনন্দে ভদ্রমহিলার চখে জল আসিয়া গিয়াছিল। একটু পরে আরও একটি সাইনবোর্ড পাই, "Relak A while and Move." নিজেদের অজ্ঞাতেই পিশুঘাঁটির চূড়ায় কোন সময় যেন আসিলাম। দুর্গম অমরনাথ পথের দুরাহতম অংশ পিশুঘাঁটি। অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অতিক্রম করিয়া এক অব্যক্ত আনন্দে মন ভরিয়া গেল। যশপালে আমি আসিলাম। ভদ্রমহিলাকে তার দলের লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিলাম। আমি আসিতেছি দেখিয়া গোলাম মোহম্মদ হাসি মুখে বাঁ হাতে এক এক গ্লাস চা আগাইয়া দিল। যথারীতি আমাকে খানিকক্ষণ বিশ্রামের জন্যে ফ্রি পরামর্শ দিয়া মালপত্র পিঠে বাঁধিয়া সে শেষনাগের পথে রওয়ানা হইল। আমি চা হতে ঐ ভদ্রমহিলা, দলের লোকদের সঙ্গে যে স্থানে দোকানে ছিলেন সে দোকানে আসিলাম। দেখিলাম, পাকৃডণ্ডির পথে একা ছাড়িয়া আসার জন্য ক্ষোভে দুঃখে অশ্রু ছল ছল চক্ষে ভদ্রমহিলা দলের প্রত্যেককে অভিযুক্ত করিতেছে। "উনি সঙ্গে না থাকিলে আজ কি যে হইত" ইত্যাদি-ইত্যাদি। আমি নীরব শ্রোতা। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি লক্ষ্য করার মত ঘটনা, দূর বা নীচু হইতে যাহাকে তিন চার মিনিট পর পরই বিশ্রাম করিতে দেখিয়াছি সেই মহিলাই আমার সঙ্গে দাঁড়াইয়া একজন বিশ্রামের পর টানা পঁচিশ মিনিট হাঁটিয়া যশপালে আসিয়াছেন। এই পঁচিশ মিনিটে একবারের

তরেও বিশ্রামের নাম লন নাই। এলাচ কপূরের গুনই বলুন—বা আমার 'উৎসাহ বদ্ধক' সঙ্গ কিংবা দুইটিই ঘটনা এই, ভদ্রমহিলা দীর্ঘ পঁচিশ মিনিট ভূবন বিখ্যাত পিশুঘাটির পাকডণ্ডের পথ বিনা বিশ্রামে অতিক্রম করিয়াছেন। ২২শে কিংবা ২৩শে আগষ্ট সন্ধ্যায় পাহালগামে জনৈক যুবক তার সঙ্গের মহিলার সহিম আমাকে পরিচয় করায়। যুবকের ভাষায় আমার পরিচিতি, উনি, উনিই ত— সেই ভদ্রলোক। আমাদের অমুকদিকে যিনি পিশুঘাটিতে উদ্ধার করেন।

যশপাল কয়েকটি তাঁবুর দোকান। চা বিস্কিট পাওয়া যায়। যাত্রী বিশ্রামের সুন্দর বন্দোবস্ত। ১৩৫০০ ফিট অতিক্রম করার পর শরীরে শক্তির ছিটে ফোঁটাও অবশিষ্ট থাকে না। অমরনাথ যাত্রার সহায়ক ও নির্দ্দেশক পুথিপত্রেও এখানে বিশ্রাম করার উগদেশ দেওয়া আছে, "The trekkers are adviied to encamp here"

যশ পালে চা প্রতি কাপ এক টাকা। দোকানী গ্রহককে চা দেওয়ার আগে চা কতখানি গরম তাহা দর্শনীয় কায়দায় পরীক্ষা করিয়া লয়। শিশুকে দুধ খাওয়ানোর আগে সচরাচর মায়েরা এরূপ কায়দায় দুধের উত্তাপ বুঝিতে চেষ্টা করেন। সবকিছু ঠিকঠাক করিয়া দুধ খাওয়ানোর আগ মুহূর্ত্তে একটু দুধ হাতের চামড়ায় দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন দুধটি কতটা উত্তপ্ত। যদি দেখেন গরম বেশী, তবে আর একটু ঠাণ্ডা করিয়া শিশুকে খাওয়ানো হয়। কিন্তু এরূপ কায়দায় জলন্ত উনন হইতে ফুটন্ত চা প্রথমে হাতে কুশ করিয়া লইয়া উত্তাপ দেখা ও তারপর গ্নাসে ঢালা, যশপালে অতি সহজলভ্য দৃশ্য।

এ সমস্ত ঠাণ্ডা জায়গাও সময় সময় জল পিপাসা পায়। ঠাণ্ডা জল খাইলে কতক্ষণ পরই স্বর ভাঙ্গিয়া যায়। কতক্ষণ পর গলা হইতে আর আওয়াজ বাহির হয় না। গলা বসিয়া যায় ঠাণ্ডা জলে একটু গরম জল নিশাইয়া খাইলে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। জল চাহিলে বলিতে হয় "পানী দেও।" ঠাণ্ডা জলকে "ঠাণ্ডা পানী" বা গরম জলকে "জলকে "গরম্ পানী"। কিন্তু "ঠাণ্ডা জলে একটু গরম জল মিশাইয়া দিও" কে এক কথায় কি বলা হয়?

তাই ত বলি চন্দন বাড়ীতে "গরম পানী লে আও" বলায় এত গরম জল-ফুটন্ত জল কেন দিয়াছিল? যশপালে শিখিলাম। তারপর সমস্ত পথে কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। দোকানীর বুঝিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নাই। ঠাণ্ডা

জলে একটু গরম জল মিশাইয়া বেশ "উম উম" গরম জলের গ্লাস হাতে তুলিয়া দিয়াছে। এরূপ জলকে এ সকল স্থানে বলা হয় "গরম ঠাণ্ডা পানী"

যশপালের অন্য আর একটি অভিজ্ঞতা বুঝাইতে উপমার সাহায্য লইতেছি। পাঠক, মনে করুণ আপনকে আলাদা আলাদা ভাবে তুই দল লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে হইতেছে। তুই দলের প্রতি দলেই জনা পনেরক লোক। বয়স চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ এর মধ্যে, প্রথম দলের সবার মাথায় কালো কুচকুচে চুল। প্রথম দলের সঙ্গে আলাপ শেষে দ্বিতীয় দলের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিতে গিয়া যদি দেখেন এ দলের সবার মাথায় এক একটি মস্ত মস্ত টাক, চুলের লেশ মাত্র নাই, তবে আপনার মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে? যশপালে আমার মনে সেইরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। পাহালগাম হইতে চন্দনবাড়ী, চন্দনবাড়ী হইতে পিশু ঘাঁটি পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে বড় বড় গাছ ছিল। সিষ্টার নিবেদিতার ভাষায় "সরল বৃক্ষের বন" (Pine গাছ) আমরা সরল বৃক্ষ বা পাইন গাছ যাহাই বলি না কেন স্থানীয় লোকেরা "তিরি কোনী" বলে। তিরি কোনী? কেন? নামটা আমার ভারী পছন্দ হইয়াছে, পথে এ নামকরণের কারণ কিছুটা অনুসন্ধান করিয়াছি। দেখিলাম, এ সমস্ত গাছের পাতার গঠন হয়ত এ নাম-করণের জন্য দায়ী। প্রতি পাতায় তিনটি কোন আছে। "ত্রিকোনী" পাতা। এই "ত্রিকোনী" হইতেই "তিরি কোনী" হওয়ার সম্ভাবনা।

যশপালের পর শেষনাগ পর্যন্ত বড় পাহাড় নাই। চড়াই উৎরাই নাই এমন নয় তবে গণ্য করার মত নয়। গ্রেডিং বা আরোহণ-অবতরণ স্তর খুব ভাল। যশপালের সম্মুখদিকে তাকাইলে গোনা যায় এরূপ অল্প সংখ্যক কয়েকটি গাছ দেখা যায়। তাও পাহাড়ের পাদদেশে; যে স্থানে নীলগঙ্গা বা শেষনাগ নদ বহিয়া যাইতেছে। আর যশপালের পিছন দিকে তাকাইলে অগুন্তি গাছ নজরে আসে। পাহালগাম হইতে হাঁটা আরম্ভ করার পর হইতে এখন পর্যন্ত দেড় দিন যাইতেছে। ডানে বাঁয়ে সম্মুখে পশ্চাতে সবসময় ঘন বড় বড় তিরি কোনী গাছ দেখিতে দেখিতে চোখ একরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। যশপালে আসার পর সম্মুখে বৃক্ষবিহীন নেড়া পাহাড় দেখিয়া আমার মনে "টেকো দল" দর্শনের প্রতিক্রিয়া হয়।

সকাল সাড়ে দশটায় যশপালে পোঁছি। আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া কাঁটায় কাঁটায় এগারটায় আবার হাঁটা আরম্ভ করি। শেষনাগ পর্য্যন্ত পথে আর কোন বিশ্রাম স্থান নাই। পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা। আজ এখন বৃষ্টি হয় নাই।

কয়েক বারই মেঘে সূর্য্য আড়াল করিয়াছে। সূর্য্য থাকিলে ঠাণ্ডার একরূপ। সূর্য্য মেঘের আড়ালে গেলে ঠাণ্ডার আর একরূপ। কুয়াশায় ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির সময়ের ঠাণ্ডার যথেষ্ট তফাৎ আছে। সবচেয়ে কঠিন সময় ঘন কুয়াশার বা বৃষ্টির পর কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস। এ অসহ্য। এ পথে মুখ কামানোর রীতি নাই। কোন ধর্ম্মীয় কারণে নহে। ঠাণ্ডায় গালের চামড়ায় কোন বোধশক্তি থাকে না। সেভ করিলে দাঁড়ির সঙ্গে চামড়া এমন্ কি টুকরা টুকরা মাংস খণ্ড আসার আশঙ্ক থাকে। তাই ভুলেও কেহ সেভ করেন না। স্বভাবতই কয়েক দিনের খোচা খোচা দাড়ি হয়। এখন বৃষ্টির জল কিংবা ঘন-কুয়াশার বারিবিন্দু কপালের উপর চুলে, কানের পাশে জুলফিতে, মোচে কিংবা ঐ খোচা-খোচা-দাড়িতে জমে। বৃষ্টির পর কিংবা ঘন কুয়াশার পর কিংবা পদব্রজে মেঘ অতিক্রম করার পর যখন কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস বহে তখন ঐ সমস্ত স্থানে অর্থাৎ চুলের অগ্রভাগে, জুলফিতে কিংবা প্রতি খোচা খোচা-দাড়ির অগ্রভাগে, কার্ত্তিক মাসের ভোরে প্রতি ঘাসের মাথায় যেমন শিশিরবিন্দু দেখা যায় প্রায় সেইরূপ সাদা বরফকনা জমে। হোড খোলা জীপে প্রচুর ধূলি সমৃদ্ধ পথে বহু পথ অতিক্রম করিলে চোখের পাতি, চুলে, সর্বশরীরে যেরূপ ধূলি আবরণ পড়ে অনেকটা এরূপ অতি সূক্ষ্ম কণা কণা বরফ সর্বশরীরে জমে। যশপাল হইতে শেষনাগ পর্য্যন্ত ৫ পাঁচ কিলোমিটার যাইতে আড়াই ঘণ্টা লাগিয়াছে। পথে এক স্থানে সিমেণ্ট আটকানো পাথরের দেওয়াল। উপরে টিন এরূপ চারটি ঘর দেখি। শেষনাগ, পঞ্চতরণীতে মহাগুহাশে এরূপ আরও কয়েকটি ঘর দেখিয়াছি। যাত্রীদিগকে তুষার ঝড় হইতে রক্ষা করার সরকারী বন্দোবস্ত। ছড়ি যাত্রার সময় হয়ত পরিষ্কার করা হয়, ঠিক জানি না, অন্য সময় ব্যবহারের অযোগ্য। পায়খানা হিসাবে ঐরূপ সুন্দর সুন্দর ঘরগুলি ব্যবহৃত হয়। এ সমস্ত ঘর নোংরা করিয়া রাখা ঘোড়াওয়ালা ও হোটেল-ওয়ালার সমান স্বার্থ। হোটেল ওয়ালার তাঁবুতে যাত্রীকে পয়সা দিয়া রাত্রীবাস করিতে হয়। পাথরের দেওয়াল, বিশিষ্ট ঘরগুলি নোংরার কারণে মানুষ্যবাস উপযোগী না থাকায় ঘোড়াওয়ালা রাত্রে তাহাদের ঘোড়াগুলিকে ঐ সরকারী ঘরে রাখিতে পারে। ফলে ঘরের মেঝেও ঘোড়ার লাদায় আধ হাত উঁচু হইয়া আছে। সরকারী ঘরগুলি যতবেশী নোংরা থাকে ততই হোটেল ওয়ালা ও ঘোড়াওয়ালার স্বার্থ রক্ষিত হয়।

যশপাল হইতে সেই যে হাঁটা আরম্ভ করিয়াছি যে হাঁটা এখন ও চলিতেছে।

পথে সঙ্গের অনেকের সাথেই দেখা হইয়াছে। এ পথে মাথার উপর দিয়া কয়েকবার বৃষ্টি গিয়াছে। ঘনকুয়াশা, ঘনকুয়াশার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছি। কোন সময় আমি হাঁটিয়া মেঘ অতিক্রম করিয়াছি, কোন সময় হয়ত মেঘ, আমাকে। এখন প্রায় সবদিকের পাহাড়ের চূড়াই বরফে আবৃত। কোন পাহাড়ের শুধু চূড়াই নহে আরও নীচের দিকে অনেকখানি অংশে বরফ।

যশপাল হইতে শেষনাগের রাস্তায় একটি জিনিষ লক্ষ্য করিতেছিলাম। যতটুকু বুঝিয়াছি তার বর্ণনা দিতেছি। পাহালগাম হইতেই লক্ষ্য করিতেছিলাম এপথের ঘোড়াগুলি এত শিক্ষিত যে ঘোড়াওয়ালার এতটুকু ইঙ্গিত, এতটুকু নির্দ্দেশ ও খুব নিষ্ঠার সহিত পালন করে। ঘোড়াওয়ালা যে সবসময় ঘোড়াগুলির সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে এরূপ নয়। ঘোড়ার পিঠে যাত্রী থাকিলে তবু কিছুটা সঙ্গে সঙ্গে থাকে, আর ঘোড়ার পিঠে মাল থাকিলে এক এক ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে তিন চারটি মালের ঘোড়া ও থাকে। দশ বারটি ঘোড়াকে এক সঙ্গে ছাড়িয়া দিয়া তিন চার জন ঘোড়াওয়ালা এক সঙ্গে গল্প গুজব করিতে করিতে আসে। কিন্তু দূর হইতে যে যার ঘোড়াকে সুউচ্চ স্বরে, কোন সময় হয় ত বা চিৎকার করিয়া, কোন সময় শীষ দিয়া এবং সিটি দিয়া সিনেমায় কিংবা যাত্রায় কোন রগ রগে দৃশ্য দেখিয়া কোন কোন বিকৃত রুচির লোককে আঙ্গুল মুখে দিয়া সুতীব্র আওয়াজ সৃষ্টি করিয়া দৃশ্য উপভোগ করিতে দেখা যায়—এরূপ আওয়াজকে সিটি দেওয়া বলিতেছি ঘোড়াগুলিকে নির্দ্দেশ দিতে দেখিয়ছি। শীষ বা সিটি না হয় বুঝিলাম, আর কি বলে? একটা শব্দ বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় নাই। "হুস্" বা "হোস"। হুসিয়ারের সংক্ষেপরূপ হুস্ বা হোস্। এই হোস্ অর্থাৎ হুসিয়ার ঘোড়াওয়ালা ঘোড়ার না পদযাত্রীর কাহার উদ্দেশ্যে বলে, বাবা অমরনাথ জানেন। তবে হোস, হোস শুনিতে শুনিতে, আর ঘোড়ার পথ করিয়া দিতে দিতে পিত্তি জলিয়া যায়। পদযাত্রীর মুখে এমন ও শুনিয়ছি সহযাত্রীকে পথ ছাড়ার জন্য বলিতেছে:—

ওরে! ওরে। কিনারে আয়। আবার হোস্ আসছে। হোস্ শুনিতে শুনিতে তোমার আমার মত অনেক সাধারণ পদযাত্রী ঘোড়া না বলিয়া হোস বলি।

শীষ, সিটি আর হোস্ ছাড়া আরও তিনটি শব্দ, মাত্র তিনটি শব্দ ঘোড়াওয়ালার মনেরভাব-বা নির্দ্দেশ ঘোড়ার নিকট পৌঁছাইয়া দিতেছে শব্দ তিনটি সুন্দর—

ৎক্রো, ৎপ্রো, ৎব্রো বা ক্রো. প্রো, ব্রো। তিনটি শব্দ, কাশ্মীরে কাশ্মীরীর মুখে শুনিয়াছি, অতএব কাশ্মীরী ভাষা নিঃসন্দেহ। কেহ যদি আমার নিকট জানিতে চান কথা তিনটির অর্থ কি আমার সহজ-সরল উত্তর "ঘোড়ায় জানে"।

কেহ যদি অমরনাথ ভ্রমণ শেষ করিয়া শুধু বলেন "ক্রো, প্রো, ব্রো এর দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি—তবে ঐ ব্যক্তি কোন স্থান সম্বন্ধে বলিতেছেন তাহা আর এক অমরনাথ ভ্রমণ অভিজ্ঞ যাত্রীর বুঝিতে কোন অসুবিধা হইবে না। ঘোড়া ও ঘোড়াওয়ালার দিকে নজর রাখিয়া চলিতে চলিতে দেখি—সামনে বোর্ড।

"Look Sheshnag is just AHED" আহা! কি দেখিলাম, কি হেরিলাম Shesh is just AHED। এ আনন্দ রাখি কোথায়? তাই ত বলি এ আওয়াজ কেন? এতক্ষণ ধরিয়া কিসের অস্পষ্ট আওয়াজ কানে আসিতেছিল? ক্রমে ক্রমে আরও জোর আরও জোরে আওয়াজ হইতেছে। জলপ্রপাতের যত নিকটবর্তী হওয়া যায়, জলপ্রপাত দেখা না গেলেও দূর হইতে প্রথমে ক্ষীণ আওয়াজ, ক্রমে ক্রমে জলপ্রপাতের যত নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততই সমান গতিতে আওয়াজের জোর বাড়িতে থাকে। দূর হইতে শোনা জলপ্রপাতের ক্ষীণ আওয়াজের মত কি যেন শুনিতেছিলাম। ক্রমে ক্রমে এই আওয়াজের জোর বাড়িতেছিল। এখন বুঝিলাম শেষনাগ এই আওয়াজের উৎস। শেষনাগ হ্রদ দৃষ্টিপথে আসিল। আমার রাস্তা হ্রদের উত্তর দিকের পাহাড়ে, পাহাড়ের কোমর আন্দাজ উচ্চতায়, এ সময় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। হ্রদের মাঝামাঝি স্থান বরাবর রাস্তায় দাঁড়াইলাম। এত দিনের স্বপ্ন, এত কিংবদন্তির উৎস শেষনাগ হ্রদকে একটু দুই চোখ ভরিয়া দেখি। শান্তিদার কথা মনে হইল। আকাশে মেঘ থাকিলে হ্রদের জল সবুজ দেখায়। দেখিলাম সত্য সত্যই হ্রদের জলের রং কিরূপ সবুজ সবুজ যেন। মনে উদিত হইল, এই সেই হ্রদ যেখানে শেষনাগ থাকেন। দেবাদিদেব মহাদেবের সহস্রমুণ্ড বিশিষ্ট যে নাগের অবস্থান প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ হিন্দুর অন্তরের স্থলে পবিত্র বিশ্বাসরূপে বিরাজ করিতেছে, সেই নাগ আজও জীবিত অবস্থায় এই হ্রদে বাস করিতেছেন। কাহারও কাহারও মতে ক্ষীর সাগরে অনন্ত শয়ানে নারায়ন যে নাগের উপর শয্যা পাতিয়াছিলেন—সেই নাগই শেষনাগ। ঐ শেষ নাগ এ হ্রদে থাকেন।

রক্ষিত মাত্র গতবার এপথে অমরনাথ গিয়াছে সে প্রত্যক্ষদর্শী। রক্ষিতের সঙ্গে শত শত তীর্থযাত্রী এই নাগকে পঞ্চমুণ্ড সহ হ্রদের জলে বিচরণ করিতে

দেখিয়া "জয় বাবা অমরনাথ" ধ্বনিতে শেষনাগের, আকাশ আলোড়িত করিয়াছে। শক্তিদা অন্যের মুখে শুনিয়াছেন। এ হ্রদে শেষনাগ থাকেন তিনি বিশ্বাস করেন।

লক্ষণ মন্দিরের কথা স্মরণে আসিল। মন্দিরের গর্ভগৃহে লক্ষণের মূর্তি। অযোধ্যায় লক্ষণ কিলা নামক স্থানে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের নিকটে একটি কুণ্ড। ঐ স্থানের পাণ্ডারা দাবী করেন ঐ কুণ্ডস্থান হইতেই শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লক্ষণ শেষনাগের রূপ ধারণ করিয়া পরমধামে যাত্রা করিয়াছিলেন। লক্ষণ কিলার এ কাহিনী আমার বিশ্বাস উৎপাদনের পক্ষে খুবই দুর্ব্বল। লক্ষণ ত্রেতা যুগের, শেষনাগ সত্যযুগের। ত্রেতা যুগের কেহ, যে রূপই ধারণ করুন না কেন, সত্যযুগে কি করিয়া যায়? সত্যযুগের কেহ ত্রেতা, দ্বাপর এমন কি কলিযুগে আসিলে ও না হয় কথা ছিল। আবার অন্য দিক হইতে চিন্তা করিলে বিশ্বাস হইলেও হইতে পারে। শেষনাগ সত্যযুগের। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণকে পরম ধামে যাত্রা করার জন্য আদেশ দিয়াই 'খালাস'। কি করিয়া আদেশ পালিত হইবে এ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কোন উচ্চ-বাচ্য করেন নাই। আদেশ পালন করিতে গিয়া লক্ষণ দেখেন স্বাভাবিক দেহে পরমধামে যাওয়া অসম্ভব। শরীরের যেরূপ ধারণ করিলে সবচেয়ে আয়াশে পরমধাম যাওয়া যায় সে রূপ শেষনাগের রূপ। এ ধারার চিন্তা করিলে অবশ্য মনে হয় শেষনাগ ত্রেতাযুগের ও আগের।

হ্রদের নিকটে কতক্ষণ দাঁড়ানোর পর প্রথম দর্শনের সময় মনে যে উন্মাদনা সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহা আস্তে আস্তে অনেকখানি সংযত হইল। চারিদিকে মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলাম। হ্রদের জল পশ্চিম দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। বর্ষাকালে পুকুরের জল পাড় ছাপাইয়া পড়ার উপক্রম হইলে একদিকে ছোট নালার মত কাটিয়া জল বাহির করা ব্যবস্থাকে "জান কাট" বলে। মনে হয় প্রকৃতিদেবী স্বয়ং হ্রদের পশ্চিম দিকে এরূপ "জান কাটিয়া" হ্রদের জলের একটি ধারা সবসময় বাহির করিয়া দিতেছেন। ঐ জল ধারাটিই শেষনাগ নদ বা নীলগঙ্গা নদী। কোন নদীর উৎস এত প্রত্যক্ষ দেখি নাই। এত প্রত্যক্ষ নদীর উৎস দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। নদীর বেলায় একটি কথা শুনিয়াছিলাম। নদীর উৎসেরও নাকি উৎস থাকে। কথাটা সত্য মনে হইল। শেষনাগ নদ বা নীলগঙ্গা নদীর উৎসের উৎস দেখিলাম। নীলগঙ্গার উৎস শেষনাগ হ্রদ। শেষনাগ হ্রদের জলের উৎস হ্রদের চারিদিকের পাহাড়ের

চূড়া হইতে পাদদেশ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে হ্রদের জল পর্যন্ত আঁকা বাঁকা অবস্থিত বরফের চাঁই। যদি বরফ আদৌ গলে তবে সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে বরফের চাঁই এবং নীচ দিক দিয়া জলধারা বহে। শেষনাগের চারিদিকেই পাহাড়, কিন্তু দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পাহাড়গুলি হইতে এরূপ চূড়া হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত আঁকা বাঁকা বরফ চাঁই এর অবস্থিতি বেশী। এই চাঁইগুলির নীচের দিক দিয়া বরফ-গলা জলধারাগুলি প্রচণ্ড বেগে ও প্রচণ্ড আওয়াজ সৃষ্টি করিতে করিতে শেষনাগ হ্রদের জলের সঙ্গে মিশিতেছে। চারিদিকে পর্বতের অবস্থানের জন্য জলধারা সৃষ্ট সে আওয়াজ প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করিতে করিতে চারগুণ জোরে কানে আসিয়া বাড়িতেছে। গম্ গম্ আওয়াজ। আওয়াজ এত বেশী যে পার্শ্ববর্তী কোন যাত্রী যদি স্বাভাবিক স্বরে কথা বলেন তবে কিছু বুঝা যায় না। চিৎকার করিয়া কথা বলিতে হয়। অন্যকে কিছু বুঝাইতেও চিৎকার করিতে হয়। হ্রদের উত্তর দিকের পাহাড়ের কোমর আন্দাজ উচ্চতায় আমার রাস্তা। রাস্তায় আমি দাঁড়ানো আছি। আমার অবস্থান হইতে হ্রদের অবস্থান অনেক নিচে। হ্রদের জল স্পর্শ করিতে হইলে আমাকে প্রায় পোয়া মাইল নীচে যাইতে হয়, অর্থাৎ জলের দূরত্ব প্রায় পোয়া মাইল। সেখানের সৃষ্ট আওয়াজ, এখানে স্বাভাবিক স্বরে উচ্চারিত কথাবার্তা শুনিলেও বোধগম্য হয় না।

ঘড়ি দেখিলাম একটা বাজিয়া গিয়াছে। খাওয়া দাওয়ার পর আবার শেষনাগ হ্রদ দেখিব চিন্তা করিয়া প্রায় মাইল খানেক দূরে কয়েকটি তাঁবু দেখিয়া বুঝিলাম। ঐ স্থানে তাঁবুর হোটেল আছে। এখ আর শুধু পর্বত-শীর্ষেই বরফ নয়, আমার সমান সমান উচ্চতায় কিংবা আমার অনেক নিচের দিকে পর্বতের পাদদেশেও বরফের চাঁই দেখিতেছি। যে কয়েকটি জলধারা আমার রাস্তার উপর দিয়া অতিক্রম করিতেছে সবই বরফ-গলা হিমশীতল জল। বাতাস ঠাণ্ডা। সূর্য্য থাকা না থাকা প্রায় সমান। ঘন কুয়াশা কোন সময় এমন হয় সম্মুখে বেশীদূর দেখি না বুঝি মেঘের ভিতর দিয়া অতিক্রম করিতেছি, কিংবা মেঘ আমাকে। ১—৩০ মিঃ। এক সর্দারজীর হোটেলে কোনরকমে শরীরটিকে আনিয়া জলন্ত উনুনের নিকটে ধপ করিয়া ছাড়িয়া দিলাম। আমাকে আগুন পোহানোর আরও সুযোগ সৃষ্টি করিয়া সর্দারজী একটু সরিয়া বসিল।

আজ গতকালের মত বৃষ্টিতে ভিজি নাই সত্য, তবে আজও কয়েকবার

শরীরের উপর দিয়া বৃষ্টি গিয়াছে। উনানের সামনে কতক্ষণ থাকার পর হাতমোজা, মাফলার, ম্যাঙ্কিক্যাপ খুলিয়া আগুনে ভাল করিয়া শুকাইতেছি। জুতা, মোজা শুকানোর দরকার ছিল, খুলিতে গিয়া দেখি রক্ষিতের মোজার কৃপায়, পায়ে নূতন স্থানে ফোসকা উঠিয়াছে। আগের ফোসকা প্লাষ্টারের নীচে ফাটিয়া বা গলিয়া রহিয়াছে। শূয়র।

পাঁচ-সাত মিনিট পর সর্দারজী আমাকে এক গ্লাস চা দেয়। আমি চা খাই, কি খাই না, কিংবা এখন আমার চা-এর দরকার আছে কি নাই, কোনরূপ যোগ-জিজ্ঞাসা না করিয়াই সোজা আমার হাতে এক গ্লাস গরম চা ধরিয়া দিল। বলার অপেক্ষা রাখে না, আমিও কোনরূপ বাক্য ব্যয় না করিয়া সর্দারজীর আপ্যায়নকে উপযুক্ত মর্য্যাদায় ভূষিত করিতে লাগিলাম। এখানে সর্দারজীর হোটেলের মতই সর্বমোট আট-দশটি হোটেল আছে।

যেহেতু যাত্রীর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, তাই সর্বশ্রেণীর লোক, এ স্থানটিকে শেষনাগ বলে। কোন কোন তাঁবুর হোটেলেরও সাইন-বোর্ড আছে। সাইন-বোর্ডে লেখা আছে শেষনাগ। বাস্তবে স্থানটি হ্রদ হইতে আর একটু উজানে। অনেকটা শেষনাগ ও ওয়াব-জানের মাঝামাঝি জায়গায়। এখানে পাথরের দেওয়াল, উপরে টিন এরূপ কয়েকটি সরকারী যাত্রী-নিবাস আছে। যথারীতি মানুষের মল, প্রসাব ও ঘোড়ার ন্যাদায় ভর্ত্তি। থাকার অযোগ্য বলিলে কিছুই বুঝানো হয় না, শক্ত বাজী ধরিলে হয়ত মিনিটখানেক থাকিলেও থাকা যাইতে পারে।

এখানে কোন তাঁবুর হোটেলেই চন্দনবাড়ীর মত ডাইনিং টেণ্টের বিলাসিতা নাই। যে তাঁবুতে রান্না হয় সেই তাঁবুতেই খাওয়ার ব্যবস্থা। চট বিছানো আছে। চটে বসিয়া খাইতে অসুবিধা হইলে নিজের বিছানা বিছাইয়া লও। অন্যের বিছানো বিছানাতে বসিয়া খাইলেও কেহ আপত্তি করে না। খাওয়ার বা অন্য সময় প্রত্যেকের লক্ষ্য থাকে উনানের কত নিকটে বসা যায়।

আমি কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ও আগুনে চাঙ্গা হইয়া হোটেলের মালিক কাম ম্যানেজার কাম ক্যাসিয়ার সর্দারজীর সঙ্গে আলাপ সালাপ শুরু করিলাম। সর্দারজী হাতে কাজ ও মুখে গল্প অপূর্ব দক্ষতায় একসঙ্গে চালাইতেছিল। শেষনাগ হ্রদ যে ১২,২৩০ ফিট উপরে সে তথ্য সর্দারজীর জানা আছে তবে ১২,২৩০ ফিট উপরে বলিতে কি বুঝায় সে জানে না।

: তুমি পরিশ্রান্ত না? তোমার শরীর ভার ভার ঠেকিতেছে না? এক কাজ কর। ঐ বরফ-ঠাণ্ডা জলে একটা ডুব দিয়া আস। দেখবে শরীরের ভার ভার ভাব কিংবা পরিশ্রম জনিত ক্লান্তি এক মুহূর্তে কোথায় চলিয়া যাইবে।

আর জান, এখানে আমরা সবাই, তীর্থযাত্রী বল, আমাদের মত দোকানদার বল, এমন কি কোন কোন মুসলমান ঘোড়াওয়ালা ও কুলী পর্যন্ত বিশ্বাস করে এই হ্রদে এক ডুব দিলে জীবনের সব পাপ ধুইয়া মুছিয়া সাফ হইয়া যায়।

: দেখ সর্দারজী, এক মুহূর্তে যদি আমার জীবনের সমস্ত পাপ কর্পূরের মত উড়িয়া যায় তবে ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিব না? কোন পাপ নাই ও শুধু পূণ্য এরূপ অবস্থায় জীবনের ভারসাম্য হারাইয়া এই লোকালয় বর্জিত হিমালয়ের বরফ-রাজ্যে বিপদ ডাকিয়া আনিব না?

: পাপ পুণ্যের কথা না হয় বাদ দাও, আমার কথামত স্নান কর, আরাম পাইবে।

চিন্তা করিতে লাগিলাম। পাগলে বলিতেছে কি? কতক্ষণ হ্রদের পারে দাঁড়াইলাম। হ্রদের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত হাঁটিতেও কম সময় গেল না। মানুষ ত দূরের কথা একটি কাক-পক্ষীকেও স্নান করিতে দেখি নাই। আর সে বলে কিনা স্নান কর, আরাম পাবে, স্নান কর, সমস্ত পাপ ধুইয়া যাইবে ইত্যাদি।

: দেখ সর্দারজী, স্নান করিতে হয় তুমি কর। তুমি রোজ প্রচুর পাপ করিতেছ, তুমি এই ঠাণ্ডা জলে রোজ, সম্ভব হইলে তোমার তিন বেলা স্নান করা কর্তব্য।

: আমি? আমি পাপ করি।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই পাপ কর। দেখ চন্দনবাড়ীতে ঘুমাইয়াছি, লেপ-তোষকের ভাড়া চার টাকা হিসাবে আট টাকা আর তাঁবুর ভিতর জায়গার জন্য চার টাকা সর্বমোট মাত্র বার টাকা গিয়াছে। আর তোমার এখানে লেপতোষকের জন্য পাঁচ টাকা হিসাবে দশটাকা আর তাঁবুর ভিতর খাটিয়ার জন্য পনের টাকা, একরাত্রের থাকা খরচ পঁচিশ টাকা। তুমি পাপ কর না? চন্দনবাড়ীতে প্রতিগ্লাস চা আশি পয়সা, তোমার এখানে এক টাকা, তুমি পাপ কর না? ডাল রুটির জন্য কি পরিমাণ পাপ কর খাওয়ার পর দাম দিতে গিয়া বুঝিব।

কথাবার্তা শুনিলে মনে হইতে পারে আমরা ঝগড়া করিতেছি, কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। ঝগড়া মুখোসের আড়ালে হৃদ্যতার সুন্দর আদরণীয় মুখ লুকায়িত ছিল।

জীবনে আজ পর্যন্ত যত বোকামী করিয়াছি তারমধ্যে সবচেয়ে বড় বোকামী,—

: ঠিক আছে সর্দারজী, তুমি আগে স্নান কর,

আমি সঙ্গে সঙ্গে স্নান করিব।

কথা ও কাজ একসঙ্গে চালাইতে চালাইতে এক সময় সর্দারজী দুইটি বেশ বড় মাপের বালটি ও একটি ভাঙ্গা মগ হাতে লইয়া বলিল— "স্নানে চল।"

"স্নানে চল" বলিলেই হইল ? কোন সময় কথার পিঠে কথা দিয়াছি "তুমি স্নান করিলে আমিও করিব।" তাই বলিয়া সে কথা এখনও মনে রাখিতে হয় !

: শোন সর্দারজী, তুমি এতক্ষণ শেষনাগ সম্বন্ধে যে সমস্ত আজে বাজে কথা বলেছ তাতে মনে হয় তুমি শেষনাগ সম্বন্ধে কিছুই জান না।

: তুমি জান ?

: অবশ্য।

: বল।

: বেশ বলছি।

আমি সুবোধ চক্রবর্ত্তীর রম্যানিবীক্ষ্য পড়িয়া যে কাহিনী জানিয়াছিলাম তাহার যতটুকু মনে আছে বলিলাম,—

: শোন, এদিকেই কোন একস্থানে বহুপূর্বে কিন্নর নামে এক জনপদ ছিল। এ জনপদের রাজার নাম "নর"—তিনি কাশ্মীরের রাজা দ্বিতীয় বিভীষণের পুত্র। রাজা নর ধার্মিক ও চরিত্রহীন ছিলেন। কথাটা গোলমানে মনে হইলেও একটি লোক একই সঙ্গে দুষচরিত্র ও ধার্মিক কি করিয়া হয় ? যদি আমার কাছে জানিতে চাও, তবে বলি এ সম্বন্ধে কোনরূপ দায়িত্ব লইতে আমি অক্ষম। যেরূপ পড়িয়াছি শোন, এদিকে বিতস্তার তীরে একটি বাগানের যে সরোবর ছিল, তাতে সুশ্রবন নাগ বাস করতেন। সুশ্রবন নাগের দুই সুন্দরী কন্যা। ইরাবতী ও চন্দ্রলেখা। নরের রাজধানীতে বসবাসকারী বিশাখ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত চন্দ্রলেখার বিবাহ হয়। শ্বশুরবাড়ীতে চন্দ্রলেখা একদিন রোদে ধান শুকোতে দিয়াছিল। কোথা থেকে একটা ঘোড়া সেই ধান খেতে আসে। চন্দ্রলেখা সেই ঘোড়া তাড়াতে তার পিঠে হাত দিয়াছিল। তাতে একটা সোনালী ছাপ ঘোড়ার গায়ে পড়ে। বিশাখ পত্নী চন্দ্রলেখার উপর রাজার দৃষ্টি আগেই পড়েছিল। এইবার তার হাতের সোনালী ছাপ দেখে আর দেরী করেন নাই। সোজা ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়া চন্দ্রলেখাকে চেয়ে বসলেন। রাজা নর ব্রাহ্মণের বাড়ী ঘেরাও করেছিলেন। কোনরূপে সুযোগ সৃষ্টি করিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সুশ্রবন নাগের নিকট পালাইয়া গেলেন। সমস্ত শুনে নাগ ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা ও তার রাজধানী

ধ্বংস করে ফেললেন। তারপর অনেক নিরীহ প্রাণীর মৃত্যুতে অনুতপ্ত হয়ে দূরে একটি পর্বতে একটি সরোবর রচনা করেন। ঐ সরোবরই এই হ্রদ, লোকে বলে শেষনাগ হ্রদ। কেহ কেহ ইহাকে শেশ্রমনাগ বা শিশ্রমনাগ হ্রদ ও বলে।

এ ত গেল চন্দ্রলেখা বিশাখ উপাখ্যান। তা ছাড়া অন্যত্র দেখিয়াছি (সুধীর চন্দ্র সরকার সংকলিত পৌরানিক অভিধান) শেষনাগ নাগবংশের রাজা ও পাতালের অভিনায়ক। সহস্র ফণাযুক্ত শেষনাগের মস্তকে প্রত্যেক কল্পের শেষে বিষ্ণু অবস্থান করেন। পুরাণে কথিত আছে এই শেষনাগ তার মস্তকে সমস্ত পৃথিবী ধারণ করে আছেন। যখন তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তখন সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হয়, তাতেই পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়। প্রতি কল্পের শেষে শেষনাগ মুখ হতে অগ্নি উদ্গীরণ করে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করেন। সমুদ্র মন্থন কালে দেবতারা শেষনাগকে মন্থন রজ্জুরূপে ব্যবহার করেন। পুরানে লিখিত আছে ইনি দক্ষের অন্যতমা কন্যা কশ্যপের স্ত্রী কদ্রুর গর্ভজাত নাগদের অন্যতম। সপত্নী বিনতাকে ছলনা করার জন্য কদ্রু নিজপুত্রদের সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্তু শেষ প্রমুখ কয়েকটি নাগ মাতাকে সাহায্য করিতে অসম্মত হয়। এর ফলে, মাতৃশাপে এঁকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এর অন্যতম নাম বাসুকি।

এ কাহিনী দুইটি শুনার পর সরদারজী বেশ অবাক হইয়াছে বুঝা গেল। আমার সঙ্গে কিরূপ সুন্দর একটা "ইয়ার ইয়ার" ভাবের খাতির জমিতেছিল তাহা ও শেষ হইল। এ কাহিনী শুনার পর হয়ত তার ধারণা হইয়া থাকিবে, আমি এক বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তি। এখন সর্দ্দারজীর কথাবর্ত্তায় আগের হালকা সুর একদম অনুপস্থিত। তৎপরিবর্ত্তে স্থান লইয়াছে সম্ভ্রম।

ঃ তেল? তেল লাগবে না? তেল দিবেন ত গায়ে।

ঃ শোন, ঘর যন্ত্রণা। এই প্রচণ্ড শীতে গা খানি করাই যেখানে চূড়ান্ত সমস্যা সেখানে কামড়ানো ঠাণ্ডা জলে শুধু নিজেই স্নান করিবে না পরন্তু আমাকেও স্নান করাইবে যেন এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

ডুবন্ত লোকও নাকি খড়কুটা ধরিয়া বাঁচিতে চায়। খুব অসহায় ভাবে বলিলাম

ঃ কি করে স্নান করি? পায়ে দিব কি?

হাওয়াই সেণ্ডেল নাই।

ডুবন্ত লোকে হয়ত শেষ সময়ে হাতের কাছে পাইলে খড়কুটা ধরিলে ধরিতে

পারে কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহ শুধুমাত্র খড়কুটা ধরিয়া শেষ পর্যন্ত জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে এরূপ কোন দৃষ্টান্ত আমার জানা নাই। আমিও শেষ রক্ষা করিতে পারি নাই।

ঃ হাওয়াই সেণ্ডেলের কোন চিন্তা নাই।

আপনি আমারটি ব্যবহার করুণ।

অম্লান বদনে শ্রীমান নিজের সেণ্ডেল জোড়াটি আমার ব্যবহারের জন্য দিয়া দিল।

আমাদের তাঁবুর পিছনে পাহাড়। পাহাড় ও তাঁবুর মধ্যকার দূরত্ব পনর বিশ হাতের বেশী নয়। এ স্থানে মাটির উপর নল অনেক দূর পর্যন্ত গিয়াছে। খুবই অস্থায়ী ব্যবস্থা। জলের পাইপ বা নল সর্বত্র মাটির নীচে থাকে। এখানে মাটির উপর। এই নল হইতে মধ্যে মধ্যে কোমর সমান উঁচু জলের পাইপ। পাইপের মাথা ছাতার বাটের মত বাঁকানো। ঐ বাঁকানো অংশে ইংরেজী 'টি' অক্ষরের মত একটা কিছু থাকে, যাহা ঘুরাইলে ট্যাপে আসে বা বিপরীত দিকে ঘুরাইলে ট্যাপের জল পড়া বন্ধ হইয়া যায়। এখানে ট্যাপের বৈশিষ্ঠ ট্যাপের মাথায় ঐ ইংরেজী 'টি' অক্ষরের মত কোন কিছু নাই। সব স্পেশাল ট্যাপ। সব সময় জল পড়িতেছ ত পড়িতেছেই। জল ধারা বন্ধ করার কোন উপায় নাই, কোন প্রয়োজন ও নাই।

আমার মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডা জলে স্নানের অভিজ্ঞতা ছিল। বেশী ঠাণ্ডায় হাত কোন কাজ করিতে চায় না। হাতের আঙ্গুলগুলি বেশ ফাঁক ফাঁক ভাবে না-খোলা, না-বন্ধ অবস্থায় কিরূপ যেন স্বাধীন আচরণ করে। না পারা যায় হাত সম্পূর্ণ খুলিতে, না পারা যায় মুষ্টিবদ্ধ করিতে, না পারা যায় আঙ্গুলের ফাঁক বন্ধ করিতে। সব আঙ্গুল স্বাধীন এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে পড়িতে হয়।

সর্দারজী ট্যাপের নীচে বালতি বসাইল। হোটেলের বালতি। সচরাচর আমরা বাড়ী ঘরে বড় বালতি বলিতে যে মাপের বালতি বুঝি, তার তিনগুণ না হইলে ও দ্বিগুণ বড় এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। দেখিতে দেখিতে বালতি জল পূর্ণ হইয়া গেল। আমি স্নানে প্রস্তুত হইতেছি। কোথায় লাগে যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি। ম্যাঙ্কিক্যাপ, দস্তানা, মাফলার, জুতা মোজা তাঁবুতে রাখিয়া আসিয়াছি। তারপরও গায়ে যা আছে যথেষ্ট একটি একটি করিয়া জ্যাকেট, সোয়েটার, সার্ট, প্যান্ট খুলিতেছি আর ঠাণ্ডা কাহাকে বলে বুঝিতেছি। শেষ সময়ে গায়ের গেঞ্জি খুলিব। পূর্ব অভিজ্ঞতায় আণ্ডারওয়ার খুলিয়া কোমরে গামছা বেড় দিলাম। সন্দেহের ছায়া মাত্র ছিল না স্নানের পর ভিজা

আণ্ডারওয়্যারের ডুরি খোলার মত শক্তি আঙ্গুলে থাকিবে না। এরূপ ঠাণ্ডায় ভিজা আণ্ডারওয়্যারের ডুরি খোলা যে কত বড় কাজ অনভিজ্ঞকে বুঝানো অসম্ভব।

মনের কোন কোণে এতদিন দুঃখটি লুক্কায়িত ছিল কে জানে? এখন মনে হইল আমার জীবনে গণ্য করার মত কোন রেকর্ড নাই। না পড়াশুনায়, না খেলাধূলায়। আজ স্নান করিয়া একটি রেকর্ডের মত রেকর্ড সৃষ্টি করি না কেন?

কি খেয়ালের বসে পায়ে, হাতে, পেটে, পিঠে, মাথায় জল ঢালিতেছি ত ঢালিতেছিই, এক সময় বালটির জল শেষ হইল। অপেক্ষা করিলাম। বালটি জলপূর্ণ হইল। আবার, আবার, সমস্ত শরীরে পুরা বালতি জল একএকবার মগ ভর্ত্তি করি ও গায়ে ঢালি। আমার মহানস্নান শেষ হইলেন। দ্রুত জলধারা হইতে একটু দূরে আসিয়া এতটুকু দেরী না করিয়া একটানে কোমর হইতে ভিজা গামছা খুলিলাম। অনুভব করিলাম হাতে তখন ও শক্তি আছে। গামছা দুহাতে নিংড়াইতেছি। গামছা হাতে লইয়া নিংড়ানোর সময় আমার গায়ে প্রথম জন্মদিনের পোষাকের উপর ও ছিল, কোমরে তাগা, গলায় পৈতা। আমার সম্মুখে সর্দারজী বসা, কেহ কেহ জলের জন্য এদিকে আসিতেছে। আমার সম্মুখে শেষনাগের রাস্তায়, তীর্থযাত্রী, ঘোড়াওয়ালা। কুলী (যদি ও সংখ্যায় খুবই কম) চলাচল করিতেছে। আমি নির্বিকার। এই পোষাকেই ধীরে সুস্থে মাথা মুছিলাম, বুক, পিঠ, হাত-পা সব মুছিলাম। আমি এই জন্মদিনের পোষাকে এত নির্বিকার ছিলাম যে লোক চলাচলের দিকে পিছন ফিরিয়া পাহাড়ের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ানোর প্রয়োজন ও বোধ করি নাই। গামছায় জল মুছিয়া জামা পেন্ট গায়ে দেই। জামার উপর সোয়েটার। আরাম আহ্। আরাম। সত্যিই খুব আরাম লাগিতেছে। কালের লতিতে, নাকের আগায় ঠাণ্ডা বাতাসের আঘাত ও খুব আরাম দিতেছে। এতক্ষণ সর্দারজীর কথায় বিশ্বাস হয় নাই কিন্তু স্নানের পর অনুভব করিতেছি সর্দারজী কিছুমাত্র বাজাইয়া বলে নাই সত্যি খুবভাল লাগিতেছে, এমন কি কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাসও।

পাঠক, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটু ধৈর্য্য ধার দাও, আমি "আরামটি" আরও যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে বুঝাইতেছি। মনে কর, কোন গ্রীষ্মের দুপুরে প্রচণ্ড গরমে তুমি অসহায়ভাবে আই ঢাই করিতেছ। গরমে কোন কাজ করা দূরের কথা তিষ্ঠিতে পর্যন্ত পারিতেছ না। এমন সময় কেহ যদি তোমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যায় একং চারটি বড় জলন্ত কয়লার চুলার মধ্যবর্তী স্থানে

দশ মিনিট বাঁধিয়া রাখিয়া পূর্বস্থানে আনিয়া ছাড়িয়া দেয় তবে যেখানে দশ মিনিট আগেও গরমে অস্থির হইয়া পরিয়াছিলে, সে স্থানে বেশ "আরাম" পাইবে।

আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় "আরাম" শেষনাগে স্নান। তবে আরাম অনুভব হইয়াছিল, সে কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হইবে।

স্নান শেষে হোটেলে আসিয়া তাঁবুর মধ্যে উনানের নিকটে বসিলাম। সর্দারজী স্নান সারিয়া আসিয়া মিলিটারী কায়দার সেলুটে আমায় অভিনন্দিত করিল। সর্দারজীর এ আরেক বাতিক। কোন কিছু বলিলেই হইল জবাব দেওয়ার আগে, বসা অবস্থাতেই হউক আর দাঁড়ানো অবস্থাতেই হউক, সেলুট করিত। সেলুট দেওয়ার অভ্যাসটি সম্পূর্ণ ছাড়িতে না পারিলে ও শেষনাগের কাহিনী শুনার পর তার ব্যবহারে, পূর্বেই বলা হইয়াছে আমার প্রতি একটা সম্ভ্রম ভাব ছিল। খাওয়া দাওয়া শেষে প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ নূতন উদ্যমে গল্প শুরু করিলাম। আমি খাতা কলম লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিলাম। সর্দারজীকে সাবধান করিলাম,—

: দেখ সর্দারজী একটা কথা মিথ্যা বলিবে কিংবা বাড়াইয়া বলিবে তবে খুব খারাপ পরিণামের জন্য তৈয়ার থাকিও যা যা জিজ্ঞাসা করি সোজা জবাব দিও।

: আপনি লেখক? বই লিখবেন? আমাদের কথা, আমার হোটেলের কথা লিখবেন?

: তোমার এত কথার দরকার কি? এখন বল তোমার নাম আর ঠিকানা।

: নাম—চরণ সিং, ভিলেজ—চিত্তিসিংপুরা, পোষ্টাপিস্—হরদুৎরাও, জিলা—অনন্তনাগ—কাশ্মীর।

: বেশ, এবার বল কত বৎসর যাবৎ এখানে যাত্রা মরশুমে হোটেল ব্যবসা কর।

: গত সাত বৎসর যাবৎ।

: একটানা সাত বৎসর?

: একটানা সাত বৎসর। পত্রিকায় লিখবেন না বই? আমি চরণ সিং উত্তর সঙ্গে সঙ্গে খাতায় লিখিতেছিলাম।

: দেখ সর্দারজী, আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। আমার প্রশ্নের পালা শেষ হইলে তুমি যত খুশী প্রশ্ন করিও আমি জবাব দিব। আমার কথা বুঝিতেছ?

সর্দারজী শুধুমাত্র সেলুট করিয়া জানাইয়া দিল যে ভবিষ্যতে আর কোনরূপ অবাধ্যতা করিবে না। সব কথার সাফ সাফ জবাব দিবে।

: এখন শোন, এই শেষনাগ হ্রদে শেষনাগ থাকেন ; তুমি শুনিয়াছ ?

: শুনিয়াছ ? শুনিয়াছ কি ? দেখিয়াছি। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

: কয়বার ?

: তিনবার।

: তিনবার ?

: তিনবার।

আচ্ছা এবার আমি আর কোন প্রশ্ন করিতেছি না। তুমি মন হইতে শেষনাগ সম্বন্ধে বল।

: গত সাত বৎসর আর এবার লইলে আট বৎসর যাবৎ এখানে যাত্রী চলাচলের সময় হোটেল চালাই। অন্যান্য হোটেলের মতই আমারটিও হোটেল এবং "টি-ষ্টল", বিছানার ব্যবসাও করি। এখানে দুইমাস যাত্রী চলাচল করে। হরপূর্ণিমা হইতে যাত্রী চলাচল শুরু হয় এবং রাখিপূর্ণিমায় শেষ। রাখী পূর্ণিমায় "ছড়ি-সাহেব" অমরনাথ গুহায় থাকেন। ছড়ি সাহেব হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রী সহ শেষনাগ হইতে চন্দনবাড়ী রওয়ানা হওয়ার পর আমরা ও হোটেল গুটাইয়া দেশে চলিয়া যাই। গত সাত বৎসরে আমি তিনবার হ্রদের জলে শেষনাগ দর্শন করিয়াছি। আরও অনেকবার দেখার সুযোগ হইয়াছে কিন্তু দোকান ছাড়িয়া যাইতে পারি নাই। হ্রদের জলে শেষনাগের দর্শন মিলিলেই প্রথমে দুই একজনের "জয় অমরনাথ" ধ্বনি শোনা যায়। খুব দ্রুত ঐ দুই একজনের ধ্বনি বহুলোকের সম্মিলিত ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, সঙ্গে কোলাহল। আমরা দূর হইতে বুঝি হ্রদের জলে শেষনাগ দর্শন দিতেছেন। শেষনাগ দর্শনের সুযোগ আমার জীবনে বহুবার আসিয়াছে, আরও আসিবে, তবে এ দোকানের জন্য মাত্র তিনবার দেখিয়াছি। আমার বিচারে যদি কেহ এখানে দুইমাস থাকেন তবে সে অবশ্যই শেষনাগ দর্শন পাইবে। আমি কোন সময়ই—সম্পূর্ণ নাগ দেখি নাই। জলের উপর একহাত, ছয় মুখ। মহাত্মার মুখে শুনিয়াছি প্রত্যেকে এখানে স্নানকরা জরুরী।

ধীরে ধীরে হোটেলে লোক বাড়িতেছে। প্রত্যেকেই আগ্রহের সহিত আমার লেখা দেখিতেছে, চরণ সিং এর বক্তব্য শুনিতেছে। শ্রোতা বা দর্শকের মধ্যে আমার পাশে বসা দুইজন শিখ ছিল। তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

ঃ আপনার নাম ?

ঃ গবীর সিং।

ঃ এখানে কি কাজ করেন ?

ঃ কুক্।

ঃ আপনি দেখেছেন ?

ঃ হঁ্যা, আমি তিনবার তিনবার দেখিয়াছি অপর শিখ ভদ্রলোক আমার প্রশ্নের উত্তরে জানাইল—নাম কর্নেল সিং "খালসা-জনতা-হোটেলের ম্যানেজার বলুন আর কুকই বলুন সবই সে। গত পনরো যাবৎ এখানে আসিতেছে। কম করিয়াও দশবার শেষনাগ দর্শন করিয়াছে। তারপর আমি চরণ সিং এর মারফৎ কয়েকজন কুলী ও ঘোড়াওয়ালাকে ডাকাইলাম। কুলী বা ঘোড়াওয়ালা সবাই মুসলমান। আশ্চর্য্য। অতি আশ্চর্য্য। প্রত্যেকেই দৃঢ়ভাবে দাবী করিল। তাঁহারা শেষনাগ দর্শন করিয়াছে এবং অনেকেই কয়েকবার। একজনের বর্ণনার সঙ্গে আরেক জনের বর্ণনার খুব একটা হেরফের ছিল না। তবে শেষনাগের মাথার সংখ্যা এক একজনে এক একরূপ বলিল। চন্দন সিং বলিয়াছে ছয় মাথা, বেশীর ভাগ লোকই দাবী করিয়াছে পাঁচ মাথা, দুইজনে বলিয়াছে সাত মাথা, কয়েকজন তিন মাথা, শুধুমাত্র একজন বলিল এক মাথা। লক্ষ্য করার মত আর একটা অদ্ভুৎ জিনিষ মাথার সংখ্যা সম্বন্ধে কেহ নিজ দাবী ছাড়িতে নারাজ।

আমার লেখার সময় আপনা হইতেই দোকানে একটি দৃশ্য রচিত হইতেছিল। যাহারা হোটেলে আসিতেছে, তাহারা চুপচাপ বসিয়া যাইতেছে। সাত আটজন কুলী ও ঘোড়াওয়ালা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। এতলোক একত্রে কি করিতেছে দেখার জন্য কেহ কেহ আগাইয়া আসিয়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া যাইতেছে। চুপচাপ দাঁড়াইয়া যাইতেছে। জটলা বাড়িতেছে। হোটেলের বেচা বিক্রি লাটে উঠার জোগাড়। আসর ভাঙ্গার জন্য খাতা বন্ধ করিয়া বলিলাম

ঃ সর্দারজী, চা।

হঁ্যা এতক্ষণে যেন অনেকের খেয়াল হইল ঠিকই ত। চা এর দরকার। চরণ সিং এর খেয়াল হইল, চা বিক্রি করিলে পয়সা। গবীর সিং এর খেয়াল হইল কাজ করিতে হয়। কর্নেল সিং আমাকে "চলি" বলিয়া তার "খালসা-জনতা-হোটেলের উদ্দেশ্যে পা বাড়াইল।

এতক্ষণ আমার পাশে চরণ সিং এর হোটেলের খদ্দের এক ইউরোপীয়ান বসা ছিল। সেও অন্যদের মত সমান আগ্রহে চুপচাপ সব কিছু লক্ষ্য করিতেছিল। আসর ভাঙ্গার পর যখন আমরা কয়েকজন মাত্র হোটেলে উনানের নিকটে বসিয়া চা পান করিতেছিলাম, তখন ঐ সাহেব আমার নিকট

জানিতে চায় এতক্ষণ আমি লোকদিগকে কি জিজ্ঞাসা করিলাম, আর খাতায়ই বা কি লিখিলাম ?

: শোন সাহেব, ঐ যে হ্রদটি এর নাম শেষনাগ হ্রদ। জান ত ?

: জানি।

: ঐ হ্রদের জলে একটা সাপ আছে।

: একটা কেন অনেকগুলি সাপ থাকিতে পারে। হ্রদটি বেশ বড়।

: তোমার মাথা। হ্রদ ছোট বড়র কথা হইতেছে না। শিবের নাম শুনিয়াছ ত ?

: অবশ্য, অমরনাথ লর্ড শিবা।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, লর্ড শিবা। এখন শিবার কথা শোন। কোন কোন মূহুর্ত্তে শিবের গলা জড়ানো একটি সাপ থাকে, লক্ষ্য করিয়াছ ?

: ওহ হ্যাঁ।

: এই সাপের নাম শেষনাগ। লোকে বিশ্বাস করে, শিবের গলার সে সাপ এখানে জীবন্ত অবস্থায় আছে।

: বল কি সত্যি !

: তুমি ত এতক্ষণ বেশ মনোযোগের সহিত আমাকে লক্ষ্য করিতেছ দেখিলাম। আমি আগেই শুনিয়াছিলাম, খুব একটা বিশ্বাস হয় নাই। এখন এখানে আসিয়া এতলোককে তোমার সামনে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—সবার এক জবাব তাহারা নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। দেখ, এখানে আমি কুলী, ঘোড়াওয়ালা, হোটেলের কুক, ম্যানেজার, এমন কি মালিক, সর্বশ্রেণীর লোককে —জিজ্ঞাসা করিলাম। সবাই এক কথা বলে। তাহারা দেখিয়াশে। আরও আশ্চর্য্যের কথা সাপটির একাধীক মাথা, কেহ বলে পাঁচ, কেহ সাত, কেহ তিন এরূপ। এখন তুমি বল এতলেকের কথা তুড়ি মরিয়া জড়াইয়া দেই কিভাবে ? কিভাবে ? এখন পাঁচটা বাজিতেছে। আরও ঘণ্টা দুয়েক দিনের আলো থাকিবে। আমি হ্রদে যাইতেছি। কপালে থাকিলে দর্শন মিলিলে ও মিলিলে ও মিলিতে পারে।

গায়ে জ্যাকেট, তার উপরে প্ল্যাষ্টিক সীটের ওয়াটার প্রুভ বাধিতেছি। উদ্দেশ্য পরিষ্কার আমার পোষাক পরা শেষ হওয়ার আগেই দেখি সাহেব আমার সঙ্গে বাহির হওয়ার জন্য পোষাক পরিয়া প্রস্তুত। দুজনে হোটেল হইতে বাহির হই। বলিলাম, : দেখ সাহেব, লর্ড শিবার সাপ হউক আর না হউক এতলোক যখন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে দাবী করিতেছে তখন অবশ্য একটা কিছু আছে।

: একটা কিছু কি বলছ ? এমন একটা কিছু মার আকৃতি অবশ্যই সাপের মত। এমন ত কেহ বলে নাই হাতীর মত ? কিংবা ঘোড়ার মত ? তুমি কি প্রশ্ন করিতেছিলে বুঝি নাই। তাহার কি জবাব দিয়াছে তাহাও বুঝি

নাই। তবে একটা জিনিষ লোকগুলি চোখ মুখ লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় একজন যখন বলে, অন্যরা তাহা অনুমোদন করে।

ঃ আরে অন্যে অনুমোদন করিল কি করিল না বড় কথা নয়, এখন বল' প্রাণী বিজ্ঞানের কোথায় আছে পাঁচ মাথাওয়ালা সাপ?

ঃ আমার জানা নাই।

ঃ আমি ত নিজের চক্ষে দেখিলেও জলে ভাসমান পাথর কিংবা সংগীত-রত বাঁদর এর মত ব্যাপারটা গোপন করাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি।

সাহেবের প্রত্যেকটি কথা আজও গীর্জার পবিত্র ঘণ্টা ধ্বনির মত কানে বাজিতেছে,—

ঃ শোন, হিমালয় সম্পূর্ণ জানিয়াছি, এ কথা বলার অধিকার এখনও সভ্যতার দাবীদার আধুনিক বিশ্ব অর্জন করে নাই।

দুইজন পাশাপাশি বসিয়া শেষনাগ হ্রদ দেখিতেছি। দুজনেই চুপচাপ। দীঘিতে মাছ ধরার সময় একই মাচায় বসিয়া দু-ব্যক্তি জলে ছিপ ফেলিয়া যেমন চুপচাপ বসিয়া থাকে আমরাও সেরূপ চুপচাপ আছি। কোন সময় মেঘ, কোন সময় বৃষ্টি, কোন সময় কুয়াশা একটা না একটা অসুবিধা চলিতেছিল। আমি প্রায় সাতটা নাগাদ বৃষ্টির জন্যও বটে আবার অন্ধকার হইয়া আসিতেছে দেখিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসি। আসার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম

ঃ তুমি যাবে না?

ঃ তুমি যাও, আমি আর একটু থাকি।

ঃ আমি প্রায় দেড় ঘণ্টা হ্রদের নিকটে ছিলাম। মেঘ, বৃষ্টি, জল, পাহাড়, বরফ ছাড়া শেষনাগ বা ঐ জাতীয় কিছু দেখি নাই। আমার আধ ঘণ্টা পর আরও আধ ঘণ্টা পর আরও আধ ঘণ্টা হ্রদের নিকটে থাকিয়া সাহেবেরও একই অভিজ্ঞতা অস্বাভাবিক কিছুই নজরে আসে নাই।

রাত্রে খাওয়ার আগে চরণ সিং এর যে তাঁবুতে খাটিয়া আছে সে তাঁবুতে বিছানা অর্থাৎ লেপ তোষক দেওয়ার জন্যে বলিলাম। উদ্দেশ্য বিছানা ঠিক-ঠাক করিয়া খাইতে বসিব। খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র দেরী না করিয়া লেপের নীচে। কিন্তু চরণ সিং এর কথায় সত্যিই রাগ হইল। তার এ কি ব্যবহার? সব খাটিয়াই ভাড়া দিয়া দিয়াছে।

ঃ কি বললে. আমি দুপুর হইতে আছি। তখনই জানাইয়াছিলাম আমার খাটিয়া দরকার। আর তুমি আমার জন্যে একটাও না রাখিয়া সব ভাড়া দিয়া ফেলিয়াছ।

যত কথাই বলি না কেন সে সেলুট করে আর হাত দিয়া নিজের মাথা দেখায়।

ঃ আমি আপনাকে সারারাত মাথায় রাখিব। ঘুমের কোন চিন্তা নাই। দায়িত্ব আমার।

ভগবান আছেন। সে রাতে আলাদা তাঁবুতে থাকিলে আর দেখিতে হইত না। পূর্বেই বলিয়াছি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আগাম শেষনাগে স্নান করা। রাত দশটায় হোটেলের বেচা বিক্রি শেষ হইলে উনানের নিকট আমার বিছানা পাতা হইল। এরচেয়ে আরামের স্থান হইতে পারে না। আমার হাঁপানীর দোষ আছে। রাত্রে প্রতি শ্বাসে সে কি শব্দ। একবার এ কাতে শুইত আরেকবার ও কাতে। শ্বাসের শব্দ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। সঙ্গে "নিও-এপিনাইট" ট্যাবলেট আছে। এখনই খাইব কি আর একটু দেখিব চিন্তা কবিতেছি। শ্বাসের অসুবিধা আরও বাড়িতেছে। হিক্কা আরম্ভ হয় নাই ঠিকই তবে আর শুইয়াও থাকা যাইতেছে না। মনে মনে চিন্তা করিতেছি যদি হাঁপানী বাড়ে তবে এখন হইতে ফিরেতে হইবে। লোকালয় বলিতে পাহালগাম।

যাইতে তুইদিন। হাঁপানীর টান লইয়া বরফ, তুষারপাত, বৃষ্টি, মেঘ, পাহাড ইত্যাদির মধ্যে দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে এতটা পথ যাওয়া অসম্ভব। অসম্ভব। পথেই মরিয়া থাকিব। এই স্থান হইতে ঘোড়ায় একদিনে গুহায় যাওয়া যায়। হিক্কা উঠিলেও সঙ্গে সঙ্গে মরিব না। মরিতে হয় অমরনাথের পথে মরি না কেন। হার স্বীকার করিয়া ফিবাপথে মবাব চেয়ে আগাইয়া যাইতে যাইতে মবা কিংবা অমরনাথ গুহায় তুষার লিঙ্গের পাশে মরিয়া পড়িয়া থাকি না কেন? এক সময় শ্বাস কষ্টের জন্য আর বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারি নাই। রাত বারটা সাড়ে বারটা নাগাদ। দেখিলাম রান্নার তাঁবুতে আট দশ জন অঘোবে ঘুমাইতেছে। আমি উঠিয়া কিছু শুকনা লাকড়ি উনানে দিলাম। উনানে জ্বলন্ত কাঠ কয়লা ছিল। আমাব বিছানায় আসিলাম। সারারাত্র শোওয়া-বসা করিলাম। শেষরাত্রের দিকে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল। কোন সময় যেন ঘুমাইয়া গেলাম। সেরাত্রে খাটিয়াওলা তাঁবুতে থাকিলে আগুনের সুবিধা পাইতাম না। সশব্দ শ্বাস প্রশ্বাস টানে পরিণত হইল। বাবে বারে নিজের অক্কেলকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। তখন ঐ ববফ-গুডা জলে স্নান না করিলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হইত?

ষষ্ঠ অধ্যায়

আজ ১৯শে আগস্ট মঙ্গলবার। ভোরেয় বাতাস আমার মনে নূতন উদ্যম সৃষ্টি করিল। যত উদ্যমেই সৃষ্টি হউক না কেন গতরাতের শ্বাসকষ্ট আমার সাহস অনেক ছোট করিয়া দিয়াছে। চরণ সিং এর কথায় বুঝা যায় চোখে মুখে অনিদ্রা জনিত ক্লান্তির ছাপ পড়িয়াছে।

: আপনার শরীর ভাল ত?

: ভালই

: রাতে ঘুমাইতে অসুবিধা হয় নাই?

দেখ সর্দারজী, আজ আর [illegible]

আপনি প্রস্তুত হন। ঘোড়ার চিন্তা আমার। [illegible]

ঠেকিতেছে না। মরি বাঁচি অমরনাথ ত যাই। খুব দুর্বল দুর্বল লাগিতেছে। পাহালগামে ফিরিতে গেলেও দুইদিন।

ঘোড়ার দরদাম চরণ সিং ঠিক করিয়া দিল। এখন রওয়ানা হইয়া দুপুরে গুহায়। গুহা হইতে আজই সন্ধ্যায় শেষনাগে ফিরিব। যাতায়াতে চব্বিশ মাইল। ঘোড়ার ভাড়া একশত টাকা ঘোড়া ও ঘোড়াওয়ালা পছন্দ হইল।

একজন দুইজন করিয়া পদযাত্রীরা রওয়ানা হইতেছে। পদযাত্রীর ঘণ্টাখানেক পর ঘোড়ার যাত্রা আরম্ভ হয়।

আজ আমার মির্জাপুরী সাথীরা প্রায় সবাই ঘোড়ায় যাইতেছে। সীয়ারাম মুনীম্ সস্ত্রীক হাঁটিতেছে, সঙ্গে অবশ্যই মহাবীর প্রসাদ। ডাক্তারবাবু ও তাঁর স্ত্রী ঘোড়ায়, পণ্ডিতজী ঘোড়ায়, লাল্লু ড্রাইভার ও তার স্ত্রী ঘোড়ায় এমনকি মামী নিজে একটি ঘোড়ায় উঠিয়াছেন এবং নিজের পতিদেবতা মামাকে অন্য আর একটি ঘোড়ায় উঠাইয়াছেন। পরমানন্দে তাহারা আগে হইতেই ঘোড়ায় আসিতেছে। সকালে যথারীতি আপু পরোটা দিয়া প্রাতঃরাশ সারিলাম। আমার ঘোড়া ও হোটেলের সম্মুখে দাঁড়ানো ঘোড়াওয়ালাকে দেখিয়া আমার আবার মেজাজ খারাপ হইয়াছে। পূর্বে যে বয়স্ক ঘোড়াওয়ালা দেখিয়াছিলাম এখন দেখি ঘোড়াওয়ালাদের সর্দার আগের ঘোড়াটি ঠিকই রাখিয়াছে, কিন্তু লোকটি বদল করিয়া দিয়াছে। এ ঘোড়াওয়ালা নেহাৎ বালক, বয়স তের চৌদ্দের বেশী কিছুতেই নয়। এর ভরসায় মহাগুণাশ অতিক্রম করা? এর ভরসায় সমস্ত পথ ঘোড়ার পিঠে থাকা? নিজের দুর্বলতা ত আছেই জীবনে কখনও ঘোড়ায় চাপি নাই। আর এই রাস্তায় একটা বালক কিনা আমার ভরসা। ভয় হইতেও রাগ জন্ম নিতে পারে। তবে সর্দারের কথার খেলাপে সত্যি সত্যি রাগ হইল। কথা নাই বার্তা নাই এক ঘোড়াওয়ালা দেখাইয়া ঠিক যাত্রার মুহূর্তে ঘোড়াওয়ালা বদল। সোজা হোটেল মালিক চরণ সিংকে বেশ রাগত স্বরে অভিযুক্ত করিলাম,—

ঃ দেখ সর্দারজী দেখ, এ বালককে আমার ঘোড়াওয়ালা দেখায় নাই। তুমিই সব ঠিক করিয়া দিয়াছ। তুমিই বলিলে এক শত টাকা, আমি কোনরূপ দরাদরি না করিয়া তাহাতেই রাজি হই। নিজে ঠিক করিলে আশি পঁচাশি টাকায় স্বচ্ছন্দে ঘোড়া পাইতাম। জানি তোমরা ঘোড়া ঠিক করিয়া ঘোড়াওয়ালার নিকট হইতে কমিশন খাও। কমিশন সম্বন্ধে জানা থাকা সত্ত্বেও শুধু রাস্তা ঘাটে বিশ্বাসী লোক দরকার চিন্তা করিয়া তোমার মাধ্যমে ঘোড়া ঠিক করিয়াছি। আর এখন যাত্রা শুরু আগেই বেইমানী শুরু। তুমি

বল আমার ঘোড়াওয়ালা বদল হইল কেন? আর এত নেহাৎ বালক। এর মুখ হইতে এখনও আঁতুড় ঘরের গন্ধ যায় নাই। এরই ভরসায় যাওয়া? এরই ভরসায় মহাগুনাশ টপ অতিক্রম করা? ঠিক আছে সর্দারজী আছে সর্দারজী তোমার ঘোড়া আমার দরকার নাই। নিজে ঘোড়া ঠিক করিতে পারি তবে যাইব, আর ঠিক করিতে না পারিলে কাল যাইব।

সর্দারজীর চোখ মুখ দেখিয়া মনে হইল কমিশন খাও বলিয়া আন্দাজে যে ঢিল ছুড়িয়াছিলাম তাহা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। সর্দারজী চুপ মারিয়া গেল। আস্তে আস্তে উঠিয়া আমার বিছানা হইতে একটি কম্বল লইল। কম্বলটি ভাঁজ করিতে হোটেল হইতে বাহির হইয়া ঘোড়ার পিঠে ভাঁজ করা কম্বলটি সুন্দরভাবে বিছাইল। একটি কথাও বলিতেছে না। এমন কি তার স্বভাবসিদ্ধ সেলুট পর্যন্ত বন্ধ। হাতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া কোথায় যেন চলিয়া গেল। দুই মিনিটের মধ্যে সর্দার ও পূর্বের ঐ ঘোড়াওয়ালা ফিরিল। আগের ঘোড়াওয়ালা পাওয়ার পর খামাকা কথা বাড়াইয়া সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমান কাজ হইবে না বিবেচনা করিয়া যাত্রা শুরুর শেষ প্রস্তুতি হিসাবে মাথায় ম্যাঙ্কিক্যাপের উপর ও গায়ে নন্দুব জ্যাকেটের উপর প্লাষ্টিক সীট্ বাঁধিলাম। কাঁধের সাইড ব্যাগে আজ টর্চ লইলাম। কে জানে গুহাব ভিতর কিরূপ আলো পাইব? অন্ধকার হইয়া মেঘে ঢাকা থাকিলে, কিংবা ঘন কুয়াশায় যদি গুহাব ভিতর অন্ধকারে ভাল দেখা না যায় তবে টর্চ ভরসা। অজন্তা, ইলোরার গুহা অভ্যন্তবে দেখিয়াছি বেশ অন্ধকার। পরিষ্কাব আকাশেই অজন্তা ইলোরাব ভিতবে কতটুকু আলো পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে আমার বেশ জানা আছে।

ঘোড়াওয়ালাদের সর্দ্দার কিংবা হোটেলের সর্দ্দারজী কাহারো সঙ্গে কথা বাড়াইয়া লাভ নাই চিন্তা করিয়া যাত্রা শুরু করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম। মাইল খানেকও যাইতে হয় নাই মহাগুনাশ এর পাদদেশে পৌঁছিলাম। এখানে ওয়াবজান হইতে যাত্রীরা মূল অমরনাথের পথে পড়িতেছে। আমরা শেষনাগের যে স্থানে ছিলাম, সেখানে যেমন তাঁবু হোটেলদি আছে, সেরূপ থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ওয়াবজানেও আছে। যাত্রীগণ ইচ্ছা করিলে শেষনাগ বা ওয়াবজান যে কোন জায়গায় থাকিতে পারেন। ওয়াবজানে আমি থাকি নাই তবে শুনিয়াছি সেখানে সবসময় পাগলা বাতাস বয়, আর বাতাস প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওয়াবজান সম্বন্ধে কিছু কাহিনী প্রচলিত আছে কাহিনীগুলি নিম্নরূপ,—

বহুযুগ আগে এখানে এক দৈত্য থাকিত। এই দৈত্য যে কোন সময় নিজ দেহকে প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝায় রূপান্তরিত করিয়া প্রাণীদিগকে দৈত্যের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য বিষ্ণু শেষনাগকে পাঠায়। শেষনাগ স্রেফ দূর হইতে দৈত্যের প্রাণবায়ু বর্জিত অবস্থায় দৈত্য পরিয়া থাকে। প্রাণবায়ু-বর্জিত

দেত্য, বায়ু-বাজত দেত্য, বায়ু-বাজত, বায়ু-বজন, ওয়ায়ু-ওয়াজান ওয়াব-জান। কেহ কেহ ওয়াব-জানকে ভাও জানও বলে।

অন্য আরেক কাহিনীতে আছে, সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এক শিবভক্ত দৈত্য এখানে বাস করত। দেবতার তার অত্যাচারে অস্থির ছিল। দেবতাগণ এই দৈত্যের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিষ্ণুর স্মরণ লয়। বিষ্ণু শেষনাগকে পাঠিয়ে দৈত্যকে বধ করেন। কাহিনী যেমনই হউক নামের মিল পাওয়া গেলেও এ স্থানে বহুনাম যথা, ওয়াবজান, ভাওজান, বায়ু-জান বা বায়ু-ব্যজন।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা এ স্থানের নাম "বায়ুজান, ফায়ুজান" কিছুই না, স্রেফ "বাপজন।"

কিশোর কুলী জীবনে প্রথমে বারের মত পৌঢ় পিতার সঙ্গে তীর্থযাত্রার মাল লইয়া এপথে যাইতেছে। চন্দনবাড়ী আসিয়াই হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে, বাপ কাকার মুখে এ রাস্তার গল্প শুনিতে যত রোমাঞ্চই জাগুক বাস্তব অনেক কঠিন। চন্দনবাড়ীতে প্রথমরাত্রি কাটাইয়া দ্বিতীয়দিন পিশু ঘাঁটি অতিক্রম করার পর কিশোরটির একমাত্র ইচ্ছা গ্রামে ফিরার, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

"যাইব সাগরে" বসিয়া সবার অমতে, সবার অনিচ্ছায় নৌকায় জোর করিয়া বসিতেও সময় লাগে না, আবার জল, জল শুধু জল দেখিয়া চিত্ত বিকল হইতে ও সময় লাগে না।

এ কিশোরটির ও হয়ত বা এরূপ চিত্ত বিকল হইয়া থাকিবে। হয়ত পৌঢ় পিতা ও অন্যান্য বয়স্কের নিষেধ না শুনিয়াই বাপের সঙ্গে রওয়ানা হইয়াছে এবং এবং অর্ধপথ হইতে গ্রহে ফিরার জন্য বায়না ধরিয়াছে। দ্বিতীয় রাত্রি শেষনাগ কাটানোর পর মহাগুনাশের পাদদেশে আসিয়া যখন শুনিল এ পাহাড় পিশু-ঘাঁটি হইতেও অনেক বড় তখন বাপকে কাকুতি-মিনতি,—

: বাপজান, যাত্রীর মালসহ তুমি যাও আমি এখানেই থাকি। বাপজান, আমি এখান হইতে একাই গ্রামে ফিরিতে পারিব। বাপজান, এবার আমাদের ক্ষেতে ফসল ভাল হইয়াছে। আলগা পয়সা রোজগার না করিলেও চলিবে। বাপজান, জান আমার সমস্ত শরীরে ব্যাথা, বাপজান আমার জ্বর হইয়াছে ইত্যাদি হাজারো যুক্তি আর প্রতি কথায় "বাপজান—বাপজান" বলা।

বাপবেটার কথোপকথনের সময় হয়ত কোন তীর্থযাত্রী জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবে— : খোকা, এ জায়গার নাম কি ?

খোকা বা কিশোরটি নিজেও জানে না এ স্থানের কি নাম। প্রশ্নের জবাব দেওয়ার গরজও তাহার নাই। সে সমানে বাপজান, বাপজান বলিয়া চলিয়াছে। তীর্থযাত্রী বাপজান শুনিয়া ধরিয়া লইয়াছে এ স্থানের নাম বারজান। এই বাপজান পরবর্ত্তীকালে লোকমুখে ওয়াপজান, তারপর ওয়াবজান হওয়ার সম্ভাবনা।

ওয়াবজান থাকুক। আমি ঘোড়াওলার প্রো, থো, ব্রো এবং হোস্ শুনিতে শুনিতে মহাগুণাশের পাদদেশে আসিলাম। আজ ভোর হইতেই আমাকে কিরূপ যেন ভয়ে পাইয়াছে। এখনই ১৪,৫০০ ফিট উচ্চতায় যাইতে

হইতেছে। এ উচ্চতায় ভাল মানুষেরও শ্বাসকষ্ট হয়। জানি না আজ কপালে কি আছে? ঘোড়া একটু জোরে চলিলে কিংবা অন্য ঘোড়াকে অতিক্রম করার কালে আমার বুকের ভিতরটা ছেৎ ছেৎ করিয়া উঠেতেছে। এক একবার মনে হইতেছে, ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটি। প্রয়োজন বোধে ঘোড়ায় চাপিলেই চলিবে। হয়ত পা মাটিতে থাকিলে ভয় কিছুটা কমিলে ও কমিতে পারে। বুকের ভিতর ঢুকঢুক করিতেছে। আমি ঘোড়ায়। মহাগুণাশের চড়াই ভাঙ্গিতেছি। সকালের রৌদ্র খুবই আরাম দিতেছে। অনেক নীচে দিয়া নদী সশব্দে প্রচণ্ড বেগে বহিতেছে। বরফের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এখন এমন কোন্‌দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাইবে না, না নীচে, না উপরে, না ডাইনে, না বাঁয়ে, না সম্মুখে, না পশ্চাতে যে দিকে বরফ নাই। আমি ঘোড়ায় উপর ভয়ে জড়সড়। এরপরের কাহিনী কিভাবে উপস্থাপন করিব বুঝিতেছিনা। এ দৃষ্টি ভ্রম ও নয় আবার কিভাবেই বা সত্য হয়। সাত বৎসর হয় মা বাবাকে হারাই মৃত্যুর সময় বাবার বয়স ৮৪ ও মা এর বয়স ৭১। আমি দেখিলাম, আমি স্পষ্ট দেখিলাম যে কোন স্পষ্ট জিনিসের মতই স্পষ্ট-রাস্তার একপাশে মা অন্য পাশে বাবা। আমার নিকট হইতে কোন সময় তাঁদের দূরত্ব দশ হাত কোন সময় বা বিশ পঁচিশ হাত। মা ও বাবার দুজনেরই শরীরের উপরের অর্ধাংশ। দুজনেই হাসি মুখে আমার দিকে তাকাইয়া আছেন। আমি আগাইতেছি তাহারা পিছাইতেছেন। প্রতিমা মণ্ডপে আনিতে কিংবা পূজার পর বিসর্জনের সময় প্রতিমাকে পিছমুখ করিয়া নেওয়া হয়। সেইরূপ মা বাবার উপরের অর্ধেক শরীর মাটি হইতে ২।৩ হাত উপরে থাকিয়া আমার দিকে মুখ করিয়া সব সময় পিছাইতেছেন। হাওয়ার উপর তাঁদের শরীর। আমি যত আগাইতেছি, হাওয়ার উপর তাঁহারা পিছাইতেছেন। মা এর মুখে শুনিয়াছিলাম,—

সব তীর্থ বাব বার। অমরনাথ একবার॥

মা এর কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তায় আসিল, তোমার সে "অমরনাথ একবার" এ যাইতেছি। গভীর আরামদায়ক চিন্তার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। মা এর মুখেও দেখি সে কি অপূর্ব হাসি। হাসির বাহ্যিক প্রকাশ খুবই মৃদু কিন্তু গভীরতা সীমাহীন। জীবিত অবস্থাতে ও এই দেব দুর্লভ হাসি মা এর মুখে বেশী বার দেখি নাই। আমি একবার মা এর দিকে একবার বাবার দিকে তাকাইতেছি। বাবারও হাসি হাসি মুখ। তুলনা মূলকভাবে মায়ের আনন্দ যেন বেশী। তাদের শরীরের মাপ তাঁহারা যতখানি ছিলেন ততখানিই বেশীও নয়, কম ও নয়। শরীরের মাপ সমান থাকিলেও গণ্য করার মত ব্যতিক্রম তাঁদের বয়স। মৃত্যুর আগের অর্থাৎ ৮০।৮২ বৎসরের বাবার প্রতিচ্ছবি নয়। অনেক কম বয়সের। বাবার ৫৫-৬০ বৎসর বয়সে বাবাকে যেরূপ দেখিয়াছি, অনেকটা সেই বয়সের বাবা। মায়ের সম্বন্ধেও একই কথা। মৃত্যুর সময়ের শরীর নয়, তার অনেক আগের শরীর।

মা ও বাবাকে দেখার পর হইতেই আমার ভিতর হইতে একটা আনন্দ, একটা খুসি খুসি ভাব-এর স্রোত আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কোন সময় দেখিলাম একদিকে শুধু মা, অপর দিকে বাবার প্রতিচ্ছবি নাই, কোন সময় হয়ত কাহারও প্রতিচ্ছবি নাই, আবার পর মুহূর্ত্তেই স্থান বদল করিয়া অর্থাৎ এতক্ষণ যেদিকে বাবাকে দেখিয়াছি এবার সেদিকে মায়ের, আর মায়ের দিকে বাবার প্রতিচ্ছবি। কোন সময় আমি ইচ্ছা করিয়া অন্যদিকে তাকাই, পাহাড়ের নীচে, নদী কিংবা গাছ দেখিলাম। ক্ষাণিকপর সম্মুখদিকে তাকাইয়া মনে মনে চিন্তা করি, "দেখিত এবারও তাহাদিগকে দেখা যায় কিনা।"

সন্ধ্যায় একটির পর আরেকটি তারা যেমন আকাশে ফুটিয়া উঠে, দ্বিতীয় তারা দেখার জন্য যেমন আকাশের এদিক সেদিক খানিকক্ষণ তাকাইতে হয় সেরূপ মা-কে দেখার পর এই খানিকক্ষণ এদিক সেদিক দেখার পর বাবার প্রতিচ্ছবি কিংবা বাবাকে প্রথম দেখিলে পর মা এর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। লুকোচুরী খেলার মত অবস্থা। এই আছে, হঠাৎ কোথায় মিলাইয়া যায়, আবার ইচ্ছা হইলে দুজনে এক সঙ্গেই অবিভূত হন, ইচ্ছা হইলে একজনের পর আরেক জন। ইচ্ছা হইলে পূর্বস্থানে, ইচ্ছা হইলে স্থান বদল করিয়া, কিন্তু মুখে সব সময় হাসি, মৃদু হাসি।

এদিকে আমার বাহ্যজ্ঞান এতটুকু ঘাটতি হয় নাই। আমি সবকিছু দেখিতেছি, বুঝিতেছি। প্রয়োজন বোধে অন্যের সাথে কথাও বলিতেছি। পিষু-ঘাঁটিতে পরিচয় দুইটি যুবককে এলাচ দিলাম, নিজেও কয়েকটি মুখে পুরিলাম। আমি পাহাড়কে পাহাড়, নদীকে নদী, ঘোড়াকে ঘোড়া, বরফকে বরফ, গাছকে গাছ, পাথরকে পাথর যথাযথ বুঝিতেছি। ব্রো, থ্রো প্রো—এবং হোস্ শুনিতেছি আবার একই সঙ্গে মা বাবাকেও দেখিতেছি। এ অবস্থায় অনেকক্ষণ গেল।

: বাবুজী আমরা টপে।

: কি বললে?

: এই জায়গাটা মহাগুণাশ্ পর্বতের টপ। চৌদ্দ হাজার পাঁচ শত ফিট।

: কত ফিট?

: চৌদ্দ হাজার পাঁচশত ফিট।

: ধর, ধর, বলিয়া ঘোড়াওয়ালাকে ঘোড়ার একদিকে ধরিতে বলি, অপর-দিকে ঘোড়া হইতে মাটিতে নামি। এই টপ? ১৪,৫০০ ফিট?' এখানে ত কিছুই নাই। বড় বড় পাথর আছে। বরফ আছে। আর কি? টপে ত একটা কিছু করা দরকার, যেন মনে থাকে। না, করার মত এখানে কিছুই নাই। ঠিক আছে।

টপ ত? টিপ লাগাই। হাত মোজা খুলিয়া এক টিপ নস্য লইলাম। যাক্ টপের সাথে টিপ এর ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে। টপে আদৌ দেরী করি নাই। আবার ঘোড়ায় চাপিলাম। এবার খুব ধীর গতিতে উৎরাই। এতক্ষণ কোথায় যেন ছিল আবার আমার সম্মুখে রাস্তার দুই পার্শ্বে মা ও বাবার প্রতিচ্ছবি। সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। একই রূপ। সেই হাসি হাসি মুখ। পঞ্চতরণীর দেড় দুই মাইল আগে আমি শেষবারের মত মা ও বাবার প্রতিচ্ছবি দেখি। আশ্চর্যের কথা তারপর হইতে গুহা, এমন কি গুহা হইতে পাহালগাম আসা, মাত্র পাহালগাম কেন, আগড়তলা বাসায় আসা পর্য্যন্ত বোধকরি একবারের তরেও মা মা বাবার কথা কিংবা ঐ প্রতিচ্ছবির কথা মনে আসে নাই।

মহাগুণাশের পাদদেশ হইতে মা বাবাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয় যে কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল আজও জানি না। পঞ্চতরণী গুহা কিংবা পথে মা বাবাকে না দেখিলেও সারাপথে ভয়ের লেশ মাত্রও ছিল না।

সে দিন কি দেখিলাম এ যেমন আমার বুদ্ধির বাহিরে, কাহাকেও বিশ্বাস করাইতে পারিব এরূপ আশাও আমার নাই।

এগারটা সাড়ে এগারটা নাগাদ পঞ্চতরণী আসিলাম। এখানেও বেশ কয়েকটি তাঁবুর হোটেল। তুষার ঝড় হইতে রক্ষা পাওয়ার সরকারী বন্দোবস্ত সেই পাথরের দেওয়াল, উপরে টিন এরূপ কয়েকটি যাত্রী আস্তানা, হয়ত অন্য-স্থানের এরূপ আস্তানার ন্যায় এগুলিও ব্যবহারের অযোগ্য। এখানে ভিতরে গিয়া দেখি নাই। এমনিই আন্দাজ করিতে পারি। জ্বালানী কাঠির কয়েকটি স্তূপ। সরকারী বন্দোবস্ত শুনিলাম ছড়ি যাত্রার সময় তীর্থ যাত্রীর নিকট বিক্রী করা হয়। দূর দূর হইতে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়া স্তূপ করা হইতেছে। নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রী হয় প্রতি কেজি দুই টাকা। এখানে আর একটি জিনিষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে জ্বালানী কাঠ বলিতে আমরা শুকনা কাঠ বুঝি। গাছ কাটিয়া কিংবা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া, সদ্য কাটা গাছের চেলি কিংবা সদ্য ভাঙ্গা ডাল দিয়া রান্না করা অসম্ভব। কিন্তু এখানে, কি অদ্ভুৎ, গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়াছে, তখনও ডালের মাথায় ঘন সবুজ পাতা। কোনরূপে ডালটিকে উনানে গুজিলেই হইল, দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মনে হয় যেন ভাঙ্গা ডালটি অনেকক্ষণ পেট্রোলে ভিজানো ছিল, সদ্য কাটা গাছের চেলি সম্বন্ধেও একই কথা। জ্বলন্ত চেলি দেখিয়া কিছু বুঝা যায় না, কিন্তু ডাল দেখিলে বেশ বুঝা যায়, অবাক হইতে হয়, একি! একদিকে ঘন সবুজ পাতা আর অন্যদিকটি যে কোন ভাল জাতের শুকনা লাকড়ি হইতেও ভাল জ্বলিতেছে।

এখান হইতে গুহা চার মাইলের উপর সাত কিলোমিটার। তখন পর্য্যন্ত জানিতাম, এরপর গুহা পর্য্যন্ত থাকা খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। এখান হইতে রওয়ানা হওয়ার পর এক কাপ চা খাইতে হইলে আবার পঞ্চতরণীতে ফিরিলে পর চা পাওয়া যাইবে। অতএব কিছু খাওয়া উচিৎ। সামনের হোটেলের মালিক মুসলমান দেখিয়া "নাস্তা" দিতে বলিলাম। এপথে তিন স্থানে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত আছে। চন্দনবাড়ী, শেষনাগ, পঞ্চতরণী, সর্বত্র দেখিলাম হোটেলওয়ালা হয় মুসলমান নয় শিখ। আমার মির্জাপুরী সঙ্গীরা ভুলেও মুসলমান হোটেলে এক কাপ চা ও খাইত না। আমার এরূপ কোন বাদ-বিচার ছিল না। এখানে সামনের হোটেলওয়ালা মুসলমান দেখিয়া বলিলাম "নাস্তা দাও" শিখ হোটেলওয়ালা হইলে বলিতাম "চায়কে সাথে খোরাসা খানা ভি দেনা ভাই।"

এই হোটেলগুলির সামনে আসতে আসার আগেই কয়েকটি কচি ছড়া পার হইতে হইয়াছে। এগুলির কোনটির জলের গভীরতা চার আঙ্গুল, কোনটির আধ-হাত, কোনটির হয়ত টেনেটুনে এক হাত। এরূপ ছয় সাতটি ছড়া। ফটিক স্বচ্ছ জল। ছড়াগুলি পাশাপাশি। একটি ফুটবল খেলার মাঠের যে দৈর্ঘ্য তার দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যে অতিক্রম করিতে যতখানি পথ যাইতে হয় ততখানি পথের মধ্যেই ছয় সাতটি ছড়া পড়ে। শুনিলাম, প্রত্যেক ছড়াতে স্নান করা বিধি।

এই ছড়াগুলিই পঞ্চতরণী। পঞ্চতরণীতে স্নান করার বিধি থাকিলেও শুধু আমি কেন, আমার মত কোন সাধারণ তীর্থযাত্রীকেই স্নান করিতে দেখি নাই। যে সমস্ত যাত্রী কোন কারণে এখানে থাকেন তাহাদের কেহ কেহ স্নান করিলেও করিতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে সবগুলি ছড়াতে স্নান করিয়াছিলেন।

"আসিবার পথে স্বামিজী এই যাত্রার প্রত্যেকটি বিধান পালন করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মালা জপ করিতেন, উপবাস করিতেন এবং পর পর পাঁচটি নদীর বরফের মত ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়াছিলেন, এই কঙ্করময় নদীগর্ভগুলি আমরা যাত্রার দ্বিতীয় দিনে অতিক্রম করিয়াছিলাম।"

আমার এতটুকু সন্দেহ নাই "পর পর পাঁচটি নদী" বলিতে ভগিনী নিবেদিতা পঞ্চতরণীর কথাই বলিয়াছিলেন, এখানে বুঝা যায় শুধু স্বামী বিবেকানন্দই স্নান করিয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় স্বামীজি সঙ্গে থাকা সত্বেও স্নানের ধারে কাছে যান নাই। ভগিনী নিবেদিতা নিজে স্নান করিলে "ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়াছিলেন" না বলিয়া "(আমরা) ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়াছিলাম" লিখিতেন। কিন্তু "আমরা যাত্রার দ্বিতীয় দিনে অতিক্রম করিয়াছিলাম,"—কি

ভাবে ? প্রথম রাত্রী "সরল বৃক্ষের বনে" অর্থাৎ চন্দন বাড়ীতে ছিলেন। দ্বিতীয় দিনে পঞ্চতরণী ? এক দিনেই পিশু-ঘাঁটি ও মহাগুণাশ টপ অতিক্রম। স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা হয়ত সম্ভব কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা ? তিনি ঘোড়ায় ছিলেন এরূপ কোথাও বলেন নাই। এ পথে ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত মাথায় করিয়া ২৬ কিলোমিটার পথ একদিনে হাঁটা, আমার বিবেচনায় অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ভগিনী নিবেদিতার লেখায় এ পথের বিশদ বিবরণ থাকিলেও যশপাল, শেষনাগ, ওয়াবজান, বিশেষত শেষনাগ হ্রদ বিস্ময়কর ভাবে অনুপস্থিত। ২৬ কিলোমিটার একদিনে হাঁটা কিংবা পথ বর্ণনায় শেষনাগ হ্রদের অনুপস্থিতি একটি মাত্র সিদ্ধান্তই লইতে পারি। আমরা এখন যে পথে চন্দনবাড়ী হইতে শেষনাগ হইয়া পঞ্চতরণী যাই তখন অন্য কোন সংক্ষিপ্ত পথে চন্দনবাড়ী হইতে পঞ্চতরণীতে যাওয়া যাইত, এবং এই সংক্ষিপ্ত পথে শেষনাগ পড়িত না।

স্বামী বিবেকানন্দ সিষ্টার নিবেদিতার সময়ের সংক্ষিপ্ত পথ হারাইয়া গেলেও নূতন পথের লাভ শেষনাগ হ্রদ। নূতন পথে আমার লাভ আরও বেশী। মহাগুণাশ টপ হইতে উৎরাই এর পথে একদল লোককে অতিক্রম করি। এদল তীর্থযাত্রীর দল নয় একবার দেখিয়াই যে কেহ বলিতে পারে। স্ত্রী পুরুষ শিশু মিলাইয়া দলে পঁচিশ-ত্রিশ জন মানুষ। পনর ষোলটি ঘোড়া। ঘোড়ার দুইদিকে চাপানো প্রচুর মাল। মনে হয় ছালায় ভর্ত্তি। ছালা বলিতে পাটের তৈরী চট হইতে বানানো থলি বুঝি। এদের ছালাও চটের ছালার মতই বড়, কিন্তু বৈশিষ্ট্য চট হইতে তৈরী নয়। প্রথমে উল হইতে কম্বল, কম্বল হইতে তৈরী ছালা, রশি বা দড়ি পাটের বা নারিকেলের ছাবড়ায় তৈরী হয় এইটুকু জানি। এদল দেখার পর জানিলাম শুধু মাত্র উল দিয়াও দড়ি বানানো যায়, অন্য যে কোন দড়ির মতই ব্যবহারযোগ্য। দড়িতেও ডিজাইন, সাদা-কালো, লাল-নীল, সবুজ হলুদ কত রং-বেরং-এর নমুনার দড়ি। দুইটি মূল উলগুচ্ছকে পাক দিয়া রশি বা দড়ি বানানো হইয়াছে। প্রতি দড়ির এই মূল উলগুচ্ছগুলি বিপরীত রং-এর। একটি কালো হইলে অপরটি সাদা এইরূপ। এরূপ যে কোন দড়িতে উল্টা পাক দিয়া খুলিলে পর একটি সাদারং-এর উলের সূতা ও অন্যটি নির্ভেজাল কালোরং-এর উলের সূতা পাওয়া যাইবে। তাদের সেই কম্বলের তৈয়ারী ছালারই বা কত ডিজাইন। যেখানে সেখানে পুরানো ছালা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেই সেই ছেড়া স্থানে রং-এর সামঞ্জস্য রাখিয়া কম্বলের টুকরা দিয়া সুন্দর সুন্দর তালি দিয়াছে। তাছাড়া ঘোড়ার পিঠে বা কপালে আমরা প্রায় এক ইঞ্চি পাশ চামড়ার বেল্ট দেখি। তাহারাও ঘোড়ার এরূপ বেল্ট বাঁধিয়াছে তবে

চামড়ার নয় উলে তৈয়ারী, অপূর্ব ডিজাইন ও কালার ম্যাচিং। দলের মানুষগুলি যেমন বড় বড়, ঘোড়াগুলিও তেমনি। ঘোড়ার দু-পাশে কম্বলের তৈয়ারী ছালায় মাল মধ্যে ছোটরা কোন কোনটি নেহাৎ শিশু, আক্ষরিক অর্থে দুগ্ধ পোষ্য শিশু। ঘোড়ার উপর উলের তৈয়ারী দড়ি দিয়া আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা আছে। কিছুতেই পড়িবে না। "এদলের লোকদের গায়ের রং পরিষ্কার বা খুব পরিষ্কার" বলিয়া কিছুই বুঝাইতে পারিব না গায়ের রং দুধে আলতা শুনিয়াছি। দুধে আলতা গায়ের রং বলিতে কি বুঝায় এঁদের দেখলে বুঝা যায়। সত্যি সত্যিই এক লিটার দুধে আড়াইশ আলতা ঢালিলে যে রং হইবে এঁদের গায়ের রং সেরূপ। লাল ভাবটা খুব বেশী। বড়দের চেয়ে যেন বাচ্ছাদের, গায়ের রং আরও ফরসা, আরও উজ্জ্বল। বাচ্চা সর্বত্রই বাচ্চা। স্বভাবও একই। যত কায়দা করিয়াই ঘোড়ার পিঠে এদের উলের তৈয়ারী দড়িতে বাঁধা হউক না কেন অপরিচিত মানুষ অর্থাৎ আমাদিগকে দেখিয়া জালের মত বিছানো দড়ির বাঁধের মধ্য হইতে উঁকি-ঝুকি দিয়া দেখিতেছে। দেব শিশু শুনিয়াছি, দেখি নাই, দেব শিশু দেখিতে হয়ত অনেকটা এরূপ সুন্দর। শিশুদের স্বাস্থ্য ও অতুলনীয়। চোখ নাকের গড়ন টানা টানা, মঙ্গোলীয়ন ধারায় থ্যাবরা নয়। "ননীর পুতুল" বলিয়া বেশী আহ্লাদি ছেলে মেয়েদের অনেকে ব্যঙ্গ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ শিশুদের দেখিলে সত্যিই ননীর পুতুল বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় দিল্লী আগ্রার প্রখর রৌদ্রে যদি ক্ষাণিকক্ষণ এই শিশুদের রাখা হয় তবে মাখনের মত এরাও স্রেফ গলিয়া যাইবে। এখানে শীত অত্যন্ত বেশী। এ শীত আমরা প্রয়োজনীয় পোষাকে ও ঠেকাইতে পারিতেছি না। আর এ দলের কেহ কেহ বিশেষতঃ মেয়েরা গরমে অস্থির। গরমের জন্য মুখে ওহ্, আহ্, ইত্যাদি নানারূপ শব্দ উচ্চারণ করিতেছে।

ঘোড়াওয়ালা, কুলী তাদের নিকট হইতে জানিলাম—তাঁহারা গুর্জ্জর। লাডাক—লেহ্ অঞ্চলের অধিবাসী। এখন গরমকাল। নীচে অর্থাৎ কাশ্মীর, পাঞ্জাব—হরিয়ানা অঞ্চলে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাইতেছে। প্রতি বৎসরই এ সময় তাঁহারা দলবদ্ধ ভাবে সমতল অঞ্চলে যায়। সচরাচর প্রতি দলে এক একটি গ্রামের অধিবাসী ও তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ। আবার দুই-তিন মাস পর সমতল হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিয়া নিজ নিজ গ্রামে দলবদ্ধ ভাবে ফিরিয়া যায়।

পঞ্চতরণী বলিতে এ পথে যে স্থানকে বুঝায় তাহা ১২,০০০ ফিট উচ্চতায় পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত একটি ছোট সমতল ভূমি। ক্ষেত্রটিতে যে ছয় সাতটি ছড়া

আছে সবগুলি পশ্চিমবাহী। অতএব পূর্বদিক উচু। পূর্ব দিকের পর্বতটির নাম ভৈরব পর্বত। কেহ কেহ ভৈরব ঘাট বা ভৈরব-ভালও বলেন। প্রবাদ মতে এই পর্বত মহাদেবের জটা। আর আশে পাশে থাকা পাহাড় নাকি অভিশাপগ্রস্থ রুদ্রগণ। প্রতি সন্ধ্যায় এই রুদ্রগণ ডমরু বাজাইয়া দেবাদিদেবের আরতি করিতেন। কি এক অজ্ঞাত কারণে এক সন্ধ্যায় ডমরু বাজানো হয় নাই। আর তাতেই মহাদেব রুষ্ট হয়ে রুদ্রদিগকে অভিশাপ দেন—"পাথর হয়ে যাও", রুদ্রগণ পাহাড়ে পরিণত হলেন। এই সেই পর্বত যেখানে শিব অভিশাপে প্রস্তরিভূত রুদ্রগণ বিরাজ—করিতেছেন।

পঞ্চতরণী ছাড়াইয়া গুহার দিকে আগাইতেছি। সামনে পাকদণ্ডির পথ। খুব কঠিন উৎরাই। এখন অনেক নীচে দিয়া পশ্চিমবাহী পঞ্চতরণী বহিয়া যাইতেছি। তখন ও চূড়ায় আসি নাই। চূড়া দেখা যাইতেছে। এমন সময় নজরে আসিল একটি বোর্ড।

"Look Ahed
You are near the goal."

আর Near the goal! মনে খুব একটা প্রতিক্রিয়া হয় নাই। চলিতেছি। শান্তিদার বর্ণনা মত সেই বিপদজনক স্থান যেখানে বসিয়া বসিয়া স্কি করার ঢং-এ অতিক্রম করিতে হয় তার নিকটবর্তী হইতেছি। আমার মন অনেকটা বিকার-শূন্য। মনে এতটুকু ভয় নাই, নাই কোন আলাদা সাহস, আমি কিরূপ যেন ভয় সাহস গণ্ডির উর্দ্ধে নয় বাহিরে। পর্বতটির চূড়ায় আসিলাম, দেখলাম অন্যদিক হইতে তীর্থযাত্রীসহ কয়েকটি ঘোড় অকল্পনীয় খাড়া পথে পর্বতশীর্ষে অর্থাৎ আমরা যেস্থানে আছি, সে স্থান অভিমুখে আসিতেছে। বানতাল পথে আসা তীর্থ যাত্রীর দল। কোনরূপ রাস্তা নাই বলিলেই হয়, তার উপর কি অসম্ভব খাড়া। সমতল অঞ্চলের কোন ঘোড়া, কোন মাল বা পিঠে সওয়ারী ছাড়াও এপথে পর্বত চূড়ায় আসিতে পাড়িবে না। আর এখানকার ঘোড়া পিঠে মানুষসহ, না অবলীলায় নহে, উপরে উঠিতেছে। এ রাস্তায় ঘোড়ার পিঠে থাকা ও যথেষ্ট ভয়ের কারণ। বেশ ঝুকি লইতে হয়। স্বাভাবিক সময়েই অমরনাথের পথে প্রতি বৎসর বেশ ভাল সংখ্যক তীর্থযাত্রী ও ঘোড়া মারা যায়। পায়ে হাঁটা পথে যেখানে সেখানে মৃত ঘোড়ার হাড় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। এখন স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিলাম, পাহালগাম, চন্দনবাড়ী, শেষনাগের পথ হইতে বনতালের পথে অমরনাথ যাত্রীকে অনেক অনেক বেশী ঝুঁকি বহন করিতে হয়।

বানতলের পথে অমরনাথ দর্শন করাকে কাশ্মীর সরকার সমস্ত কারনেই নিরুৎসাহিত করেন।

আমি পথের শেষে পর্বতের চূড়া হইতে দেখিতেছি, নীচে পঞ্চতরণী ও অমরগঙ্গার সঙ্গম। অমরগঙ্গার উৎস গুহার নিকট, আর দেড় মাইল দূরে এখানে সঙ্গমে শেষ। নদীর উপরে প্রায় সবটা জমিয়া রহিয়াছে। জমানো বরফের নীচে দিয়ে জল বহিতেছে।

এই চূড়া হইতেই সর্বপ্রথম গুহামুখ দেখা যায়। অন্য কেহ দেখাইয়া দিলে গুহামুখ চিনিতে সুবিধা হয়। নিজে নিজে দেখিয়া গুহামুখ বাহির করা কঠিন। একটি বোর্ড,—"YOU HAVE"

1. Travelled ?0 miles from Pahalgam
2. Crossed Mahagunas Top 14,500 ft

H. T. P. D. W.

এখানে একটি কথা পরিষ্কার করিয়া রাখিতে চাই। আমি পথে বোর্ডে যেমন বানান দেখিয়াছি ঠিক তেমনটি রাখিয়াছি।

ইংরেজী বড় অক্ষর ও ছোট অক্ষর

(Small Letter ও Capital Letter) সম্বন্ধে ও একই কথা।

পর্বতের চূড়া হইতে নামিতেছি। প্রায় এক দেড় মাইল লম্বা বরফের চাঁই। ঘোড়াওয়ালা সাবধানে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আস্তে আস্তে উৎরাইটি পথটিতে ঘোড়াটিকে সাহায্য করিতেছে। আমাকে ঘোড়ার উপর হইতে নামিতে বলে নাই, আমি ঘোড়ার উপর আছি, যথাসম্ভব পিছন দিকে হেলিয়া রহিয়াছি এই যা। বসার ব্যতিক্রম, কিছুক্ষণ এভাবে নামার পর এ পথের শেষ উৎরাইটি ও অতিক্রম করিলাম। এবার সোজা রাস্তা—সবটা রাস্তাই বরফ। দুদিকে সুউচ্চ পবত। পর্বতের অর্ধেকের বেশী সাদা বরফে ঢাকা। সোজা বা সমতল রাস্তায় অনেকখানি গেলে শেষ চড়াই ও গুহা। অনেকখানি আসিয়াছি। গুহার নিকটে আবার বরফ নাই। রাস্তার ডান দিকে একটি বড় তাঁবু, কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসী দেখলাম। একজন সাধু আমার মত প্রত্যেক, প্রত্যেক ঘোড়াওয়ালাকে একই কথা বলিতেছে,—

"বাবার ভাণ্ডারা চলিতেছে। দর্শন শেষে প্রসাদ লইয়া যাইও।"

শুনিলাম তীর্থযাত্রী চলাচলের দুইমাস এই মহাত্মা এখানে প্রত্যহ ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করেন। যে কেহ পেট ভরিয়া খাইতে পায়। এবং চেষ্টা করিয়াও কোন তীর্থযাত্রী মহাত্মাকে নমস্কারী বাবদ কোন পয়সা ইত্যাদি দিতে পারে না।

এই মহাত্মা কোন যাত্রীর নিকট হইতে এক পয়সা না লইয়াও রোজ প্রচুর সংখ্যক তীর্থযাত্রী বা ঘোড়াওয়ালা খাবার যোগাইয়া যাইতেছেন।

এ মহাত্মার তাঁবুর পাশে কয়েকটি বায়ু—সেনার তাঁবু। একটি "হেলিপেড" তৈয়ার করা হইয়াছে। শুনিলাম ২২শে আগষ্ট প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এখানে আসিতেছেন। তারই প্রস্তুতি। হেলিপেড তৈয়ারীতে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে একরকম পাথর পাওয়া যায়—বেশ সাদা রং-এর। সাধারণ পাথরে তৈয়ারী হেলিপেড। মনে হয় মধ্যস্থানে ইংরেজী 'H' অক্ষরের ন্যায় বড় একটি 'H' সাদা রং-এ আঁকা। বাস্তবে বায়ুসেনারা কোনরূপ রং ব্যবহার করেন নাই, যেখানে যেখানে প্রয়োজন সাধারণ রং-এর পাথর উঠাইয়া ঐ ঐ স্থানে এখানকার সহজলভ্য সাদা পাথর বসাইয়া দিয়েছেন মাত্র।

এখন সব স্পষ্ট দেখিতেছি। কাহারা গুহায় যাইতেছেন, কাহারা দর্শন শেষে ফিরিতেছেন। সব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। যে পর্বতের মধ্যে পবিত্র গুহা, সে পর্বতের পাদদেশে আসিলাম। একদিকে দুই-তিনটি অস্থায়ী চায়ের দোকান। সব দোকানী মুসলমান। ইতস্তত: বড় বড় পাথর ছড়ানো আছে। প্রায় দেড় মাইল পথ বরফের উপর দিয়া ঘোড়ায় আসিতে আদৌ কোন অসুবিধা হয় নাই। ডানে বাঁয়ে সুউচ্চ পর্বত, আগাগোড়া বরফে ঢাকা।

এখানে অর্থাৎ এই দেড় মাইল বরফের পথ অতিক্রম করার সময় কানে এক সুতীব্র "কক্ কক্" আওয়াজ শুনি। "কক্ কক্" ধ্বনি পর্বতে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। চারিদিকে তাকাইয়াও এই ভয় উৎপাদনকারী শব্দের উৎস নির্ণয় করিতে পারিতেছিলাম না। এইটুকু মাত্র বুঝা যাইতেছিল দ্রুত শব্দের উৎস উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতেছে। আধ মিনিট কি তারও কম সময়ের ব্যাপার। এই কক্ কক্ ধ্বনি শুনিয়া কিরূপ যেন হকচকাইয়া গিয়াছিলাম—আমি একা নই, আমার মত সব যাত্রীর একই অবস্থা। ঘোড়াগুলিও এদিক ওদিক দেখিতেছে। লক্ষ্য করিলাম ঘোড়াওয়ালাও পশ্চিম দিকের পাহাড়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে। এ পথে অর্থাৎ পঞ্চতরণীর পর হইতে কোন কুলী নাই। যে সমস্ত তীর্থযাত্রী সমস্ত পথ হাঁটিয়া যাতায়াত করেন, তাহারাও থাকার ব্যবস্থা পঞ্চতরণীতে করেন, সঙ্গের বিছানাদি পঞ্চতরণীতে থাকে। এই পঞ্চতরণীর পর গুহা পর্যন্ত ঘোড়াওয়ালা থাকে, রাস্তায় কোন কুলীর দেখা পাওয়া যায় না। তা যাই হউক,—ঘোড়াওয়ালারা প্রথম দেখে—ঘোড়াগুলি একটু থমকাইয়া দাঁড়াইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘোড়াওয়ালা দেখানোর পর দেখিলাম নেহাৎ ছোট ছোট দুইটি বেজি আকৃতি জন্তু। দেহটি বড় জোর এক হাত, সম পরিমান লম্বা

মোটা লেজ। চার পায়ে চলে, তবে বসার ভঙ্গিটি চমৎকার, অনেকটা ক্যাঙারুর ঢং-এ বসে। ঘোড়াওয়ালারা জানাইল এ জন্তুর নাম 'বেক্রু' অত্যন্ত বিপদজনক। মানুষ আক্রমণ করে, এমন কি মানুষ মারে পর্যন্ত।

"এতটুকু বপু থেকে এত শব্দ হয়।" আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথ বেক্রু দেখেন নাই।

চারিদিকে ছড়ানো বড় বড় পাথর। মধ্যে ছোট ছোট পাথরের উপর হাঁটা রাস্তা। গুহার অনেক নিচে পর্বতের পাদদেশে ঘোড়াওয়ালা আমাদিগকে বাকী পথ পায়ে হাঁটিয়া যাইতে বলিয়াছে। সবাই ঘোড়াওয়ালার পরামর্শমত সুবোধ বালকের ন্যায় তাদের নির্দেশ পালন করিতেছি। গুহার যত নিকটবর্তী হইতেছি ততই উত্তেজনায় উন্মাদনায় কিরূপ যেন হইয়া যাইতেছি, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ অনেকখানি শিথিল হইয়া আসিতেছে। এ এক অদ্ভূত অবস্থা। ব্যাখ্যায় বুঝানোর ব্যাপার নয়। কি বলিব? কিভাবে বিষয়টি পরিষ্কার করিব। কেহ যদি বলে এই পথটুকু দু'হাত উপরে তুলিয়া হাঁটা এখানকার রীতি বা নিয়ম, তবে কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া তাহাই করিতেছি, কিংবা তখন যদি আমার অন্যকে ধাপ্পা বা বোকা বানানোর মত মনের জোর থাকে এবং বলিতে পারি "এ পথটুকু দুহাত উপরে তুলিয়া হাঁটুন, তবে আমি নিঃসন্দেহ, সবাই ঐ পথটুকু দু'হাত উপরে তুলিয়া হাঁটিবেন। কেন হাত উঠাইব? হাত না তুলিলে কি হয়? এরূপ প্রশ্ন কোন তীর্থযাত্রী করিবেন না।

তীর্থযাত্রী যতই গর্ভগৃহের নিকট বা মূল লিঙ্গের নিকটবর্তী হইতে থাকে ততই যেন বেশী পরিমাণে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। কেহ কেহ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলেন। গর্ভগৃহে বা লিঙ্গের নিকট এরূপ অদ্ভূত আচরণের কোন ব্যাখ্যাই তাঁহারা গুহা হইতে বাহির হওয়ার পর দিতে পারেন না। গুহাতে কেহ কেহ আপনা হইতে শিবস্তোত্র, কেহ বা কালীস্তোত্র, যাঁর এরূপ কোন স্তোত্র জানা নাই তিনি ওঁ জবাকুসুম করিতেছেন। তার চেয়েও খারাপ অবস্থা কাহারও কাহারও হয়। তাঁদের শরীর টলে, পা কাঁপে, মুখে গুঁ-গুঁম্—একপ্রকার অর্থহীন অদ্ভুত আওয়াজ সমানে করিয়া যাইতেছে। ঘুমে কথা বলা বা কোন আওয়াজ করা, কাহারও কাহারও অভ্যাস থাকে, সাধারণ ভাবে আমরা বলি "বোবায় ধরা", এরূপ বোবায় ধরা কহাকেও ঘুম হইতে জাগাইলে সে যেমন অসহায় দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া লজ্জিত হয়, অনেকটা সেরূপ লজ্জিত হইয়া জনৈকা, পথের পরিচিতা তীর্থযাত্রী আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বীকার করিয়াছেন "কি দেখিয়াছি, আর কি করিয়াছি বা কি বলিয়াছি, আমি এখন কিছুই বলিতে

পারিব না, কাহাকেও দেখিয়াছি, এককোণে চক্ষু মুদিয়া চুপ করিয়া আছেনত আছেনই, যেন এখানে দেখার কিছুই নাই। কেহ হয়ত বিনা প্রয়োজনেও একবার এদিক, একবার ওদিক করিতেছেন। স্বাভাবিক হাঁটা বা চুপ করিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকা একরূপ, আর অস্বাভাবিক এদিক ওদিক করা বা ঘাড় কাত করিয়া, বুকের কাছে দু'হাত জোড় করিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকা দেখিলে বুঝা যায়! আরও আছে, অত্যন্ত পরিচিত লোকের সাথেও অনেকে অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করেন, এমনকি ডাকিলেও, এমন বড় বড় গোল গোল চোখে তাকান যেন জীবনে প্রথম দেখিতেছেন। আবার গুহার বাহিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে, কথায়, গলার স্বরে, চাহনিতে স্বাভাবিক হইয়া যায়। আমি নিজের কথা বলিতে পারি, অমরনাথ গুহা। শুধুমাত্র বিশ্বের বিস্ময় তুষার লিঙ্গের জন্য নহে, কবুতরের উপস্থিতির জন্যও সাধারণ তীর্থযাত্রী, কিংবা বিশেষজ্ঞকে কম বিস্ময়বিষ্ট করে না, সাধারণ নিয়মে এত উপরে কবুতর থাকিতে পারে না, এত ঠাণ্ডা কবুতরের সহ্য হওয়ার কথা নয়, আর গুহায় থাকিলেও খায় কি? পূজা-আচ্চার কথা বাদ দিলে তুষার লিঙ্গ ও কবুতর উভয়ই দ্রষ্টব্য। গুহায় কবুতর সম্বন্ধে কত কথা শুনিয়াছি। শান্তিদাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ভগিনী নিবেদিতার লেখাও পড়িয়াছিলেন। কিন্তু গুহায় প্রবেশ করার পর কবুতরের জন্য সন্ধানি দৃষ্টি দিয়া এদিক ওদিক তাকাই নাই। দুদিন পর পাহালগামে ফিরার পর লালু সীয়ারাম মুনীম্ এর কথায় মনে মনে আফসোস হয়" তাই ও গুহায় কবুতরের কথা একবারও মনে পড়িল না? "সীয়ারামের দুঃখ সে দুইটি কবুতরের দর্শন পায় নাই, মাত্র একটি দেখিয়াছে।" আমার এই ধারণা হওয়ার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে যে, গুহার ভিতর আমিও নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো বা শিথিল হওয়ার প্রক্রিয়া তীর্থযাত্রীর উপর ধীরে ধীরে তাঁর অজ্ঞাতে হয়। কাহারও হয়ত গুহায় প্রবেশকালে, কাহারও হয় গুহায় প্রবেশ করার পর। গুহা হইতে বাহির হওয়ার পর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যখন ফিরিয়া আসে তখন ঝট্ করিয়া আসে, এক মুহূর্ত্তের ব্যাপার। কেহ হয়ত গুহামুখ হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব ক্ষমতা ফিরিয়া পান, কাহারও হয়ত অনেকক্ষণ ঘোর থাকে। অনেকটা ঘুমের মত। ধীরে ধীরে নরম হইতে হইতে কোন সময় যে ঘুমাইয়া পড়ি, নিজেরাও বলিতে পারি না, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গে মুহূর্ত্তমাত্র সময়ে। ঘুম ভাঙ্গামাত্র বুদ্ধি-বিবেচনা পূর্ণ-শক্তিতে ব্যবহার-উপযোগী।

আমি এখন গুহার নিকটে। গুহা বা তুষার লিঙ্গ বর্ণনার পূর্বে তাই নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার অবস্থা বিস্তারিত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

গুহার নিচে ছোট্ট ছড়া। বরফ গলা জল পাথরের বাধা অতিক্রম করিয়া প্রবল বেগে নাচিতে নাচিতে নিচে নামিতেছে। অমরগঙ্গা। খুব পবিত্র জল। তীর্থযাত্রীদের কেহ কেহ শেষ চড়াইয়েই আগে এদিক সেদিকে একটু বিশ্রাম করিতেছে। চড়াই বলিতে খানিকটা হাঁটা পথ বাকিটা সিঁড়ি। আমিও ঘোড়া হইতে নামার পর একটু হাত পা টানটুন দিতেছি। চারিদিক দেখিতেছি, এমন সময় মেয়েলী স্বরে কানে আসিল অনুরোধ, আন্তরিকতায় পূর্ণ।

: বঙ্গালীবাবু, নাহা লো।

চাহিয়া দেখি মির্জাপুরী দলের লালু ড্রাইভারের স্ত্রী। আমার কিছু আগে এখানে আসিয়াছেন। এখন বিশ্রাম করিতেছেন, দম লইয়া শেষ উৎরাই ভাঙ্গিবেন।

: নাহা লো? নাহা লো কেই সে?

একবারের তরেও মনে হয় নাই গতকাল শেষনাগে স্নান করিয়া সারারাত কষ্ট পাইয়াছি। একবারও মনে হয় নাই, গত রাত ভয়ে ভয়ে কাটাইয়াছি। আদৌ যাত্রায় আগানো সম্ভব না সেখান হইতেই পাহালগাম ফিরিতে হইবে। একমাত্র জল ঠাণ্ডা এছাড়া কোনরূপ ভয়ভীতি তখন আমার ছিল না।

: না, স্নানের আর দরকার কি? এমনিই গুহায় যাইতেছি।

: বাঙালীবাবু, নেহি, নেহি এই সে যানা। থোরাসা নাহা লো।

লালু ড্রাইভারের স্ত্রী একটি ষ্টেনলেস—ষ্টীলের গ্লাস হাতে লইয়া আমাকে সে কি কাকুতি-মিনতি। সেই আমাকে ছড়ার নিকট নিয়া একটি পাথরে বসাইল। আমি জুতা-মোজা খুলিলাম, পরণে পেন্ট ঠিকই আছে, যথারীতি প্রতি পায়ে নিচের দিক দিয়া তিনটি ভাজ বা ফোল্ড করা। গায়ে শুধুমাত্র সিঙ্গলপ্লাই উলের হাফ হাতা সোয়েটার। এই আমার স্নানের পোষাক, ভাঁজ করিয়া ঘাড়ে গামছা দিলাম। কথায় বার্তায় বুঝা গেল লালু ভাইয়ার স্ত্রী আমার স্নানের পোষাক দেখিয়া বেশ দুঃখিত হইয়াছে। তবু মন্দের ভাল চিন্তা করিয়া মানিয়া লইয়াছে। এবার স্টেনলেস্ ষ্টীলের গ্লাসটি আমার হাতে দিল। ঐ গ্লাস দিয়া ছড়া বা অমরগঙ্গা হইতে জল লইয়া হাত পা ধুইলাম। বাঁ হাত জলে ভিজাইয়া হাফ্ সোয়েটারের ভিতর শরীরের ডান দিক, আবার ডান হাত জলে ভিজাইয়া সোয়েটারের নিচে শরীরের বাঁদিক বুলাইলাম। দুই গ্লাস জল মাথায় দিলাম। এ স্নানের অনুভূতি এক কথায় পরিষ্কার করিতে চাই। মাথায় যখন জল ঢালি তখন মনে হইতেছিল যে কোন বিদ্যুৎ চালিত করাৎ কলের

করাতের নিচে মাথা দিলেও অনুভূতি এর চেয়ে এমনকি একটা গণ্য করার মত হেরফের হইত ?

স্নান শেষ করিয়া নিকটেই বড় দেখিয়া একটি পাথরের উপর বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছি। হঠাৎ অনুভব করিলাম কে যেন আমার চোখে মুখে সর্ব শরীরে ধূলা দিয়া ঢিল দিতেছে। ধূলা নয় কালি, সাদা সাদা, কোন কোনটি তিন চারটি বালুর যতখানি ভর ততখানি ভরবিশিষ্ট। প্রত্যেকটি কণা শরীরে বা পাথরে পড়িয়াই যেন একটু লাফায়। কিছুক্ষণ পরে বুঝিলাম এ বরফের গুড়া। এত ছোটও বরফের গুড়া হয়। কোন বৃষ্টি নাই, আকাশে মেঘের ছিঁটে ফোটাও নাই। উপরন্তু পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায় দুপুরের রৌদ্র। কয়েক মিনিট সমানে বরফ গুঁড়া পড়ার পর প্রকৃতি আবার যথারীতি স্বাভাবিক। এক আধমিনিট পরও আকাশ দেখিয়া বুঝার কোন উপায় নাই, কিছুক্ষণ আগে বরফ পড়িয়াছে। মাথায় হাত দিয়া বরফের গুড়া ঝাড়িলাম। মনে মনে হাসিলাম, হয়ত আমার স্নান পছন্দ হয় নাই তাই প্রকৃতি দেবী স্বহস্তে স্নান করাইলেন।

স্নানের পর গুহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইতেছি। মনে পড়িল বেলপাতা, সাইড—ব্যাগ, সাবান গামছা, টর্চ, কিছু শুকনা খাবার। তাইত বেলপাতা কৈ ? ইস্ পাহালগামে রহিয়া গিয়াছে। কি আর করা।

কে যেন মাতব্বরের মত গোছাইয়া বলিয়াছিল, "অমরনাথ গুহার নিচেই অনেক পাহাড়ী ফুলের গাছ আছে। ঐ ফুল দিয়া তুষার লিঙ্গের পূজা দিতে হয়। আরও বলিয়াছিল, "যখন যাহা প্রয়োজন, প্রকৃতি ঠিক সময়ে তাহা যোগান দেন।"

বেলপাতা নাই। ফুলের সন্ধানে চারিদিক দেখিলাম, ফুল গাছ বা অন্য কোন গাছ ত দূরের কথা ঘাস ও নাই। পূজা দিতে চলিয়াছি, ফুল বেলপাতা নাই, আশ্চর্য্য তৎজন্যে মানে একবার ও আফসোস্ হয় নাই। ঠিক আছে, আমার কাছে যা আছে, তা দিয়েই পূজা দিব। পূজার জন্য পাহালগাম হইতে আলগা এক প্যাকেট কিসমিস্ ও কিছু কাজু ও খোলসহ আখরোট ছিল। আর ও কি কি যেন ছাই ভস্ম চিন্তা করিতে করিতে গুহার সিঁড়িতে আসিলাম। অনেক সিঁড়ি। অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গুহামুখে আসিতে হয়। কতগুলি সিঁড়ি গণনা করি নাই। গুহায় প্রবেশের সময় বা গুহা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় কোন সময়ই কয়টি সিঁড়ি অতিক্রম করিতেছি গণনার কথা মনে আসে নাই। কোন কোন যাত্রী অর্ধেক সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সিঁড়িতেই বসিয়া পড়িয়াছেন—

ভাবখানা "আর পারি না, যাইতে হয় তোমরা যাও। আমি এখান থেকেই শিবকে প্রণাম করিতেছি। তোমরা ফিরার সময় আমাকে লইয়া নামিও।" অনেকে পরিবারের বা দলের বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের তুদিকে তুজনে ধীরে ধীরে একটির পর আর একটি সিঁড়ি অতিক্রম করিতে সাহায্য করিতেছে? এমনও দেখিয়াছি, মুসলমান ঘোড়াওয়ালা বৃদ্ধ যাত্রীকে ধরিয়া ধরিয়া গুহা পর্যন্ত আনিয়া দিয়াছে। আমি গুহা মুখে আসিলাম। বেলা প্রায় ১টা। ঘড়ি দেখি নাই বা ঘড়ি দেখার কথা খেয়াল হয় নাই।

যতখানি খেয়াল ছিল বলিতেছি।

আজ ১৯শে আগষ্ট ১৯৮০ ইং ২রা ভাদ্র ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ মঙ্গলবার শুক্লা অষ্টমী। শেষবারের মত মনেব অবস্থা তথা বিচার বিবেচনা শক্তি সম্বন্ধে পাঠককে স্মরণ করাইয়া পবিত্র অমবনাথ গুহা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জানাইতেছি। গুহার প্রবেশের পূর্ব হইতে শেষ কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করার সময় হইতেই অন্তরের অন্তস্থল হইতে একটি বেদনার রাগ যেন ধ্বনিত হইতেছিল। গুহা প্রবেশের পর মনে বেদনা বাড়িল বই কমে নাই। এত সাধারণ যাত্রী কেমন সুন্দর সুর করিয়া শিব স্তোত্র মুখস্থ বলিতেছে, আর আমি, আমি কিনা এতই হতভাগা ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও একটি শিবস্তোত্র জানি না।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের "ভরতকোষ" (১ম খণ্ড, পৃঃ ১০১) এর কথা মনে হইল। সেখানে লেখা আছে, অমরনাথ—কাশ্মীরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ। ইহা পহলগ্রাম হইতে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) দূরে অবস্থিত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহুযাত্রী এই তীর্থে সমাগত হন। এখানে একটি নৈসর্গিক গুহার অভ্যন্তরে ডলোমাইট (চূনাপাথর) পাথরকে আশ্রয় করিয়া যে স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ তিথি অনুযায়ী হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইয়া থাকেন বলিয়া কথিত আছে, তাহার নাম অমরনাথ বা অমরেশ্বর।

গুহাটি প্রায় ৫১৮২ মিটার (প্রায় ১৭০০০ ফুট) উচ্চ তুষারাবৃত শিখরের পশ্চিমদিকে অতি মনোরম পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার স্থানীয় নাম কৈলাস। অমরগঙ্গা নামে সিন্ধুনদের ক্ষুদ্র উপনদী গুহার পশ্চিম দিকে শ্বেত মৃত্তিকারী উপর দিয়া প্রবাহিত। এই মৃত্তিকা অঙ্গেলেপন করিলে পাপ স্খালন হয় বলিয়া যাত্রীরা বিশ্বাস করেন। নদীর পাশ দিয়া গুহায় যাইবার রাস্তা। গুহার ব্যাস ১৫ মিটার (প্রায় ৫০ ফুট) উচ্চতা ৮ মিঃ (প্রায় ২৫ ফুট)। গুহার প্রবেশ দ্বার হইতে প্রায় ৬-৮ মিটার (২০-২৫ ফুট) ভিতরের দিকে গুহার শেষ প্রান্তে লিঙ্গমূর্তি অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ৯১ সেন্টিমিটার (৩ ফুট)। যোনিপীঠের পরিধি প্রায় ২ মিটার (৭-৮ ফুট) উচ্চতা প্রায় ৬১ সেন্টিমিটার (২ ফুট)। যোনিপীঠের মধ্যস্থল হইতে উত্থিত

সর্পাকৃতি তুষারপিণ্ড দ্বারা লিঙ্গমূর্ত্তি বেষ্টিত। কথিত আছে, অমাবস্যা হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে পূর্ণিমায় এই মূর্তি পূর্ণ উচ্চতা লাভ করে। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন ঐ ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অমাবস্যায় লিঙ্গমূর্ত্তির কোন চিহ্নই থাকে না। লিঙ্গমূর্ত্তির দুই দিকে বরফের দুইটি স্তূপ আছে, ইহাদের একটি পার্বতী অন্যটিকে গণেশের প্রতীক বলিয়া মনে করা হয়।

সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের "হিমালয়ের তিনতীর্থ" গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় দেখিয়াছি, বিরাট গুহা। দৈর্ঘ্যে ১৫০ ফিট প্রস্থে ৫৫ ফিট আর উচ্চতায় ৪৫ ফিট। দক্ষিণমুখী গুহা,......। ১২,৭৩০ ফিট উচুতে অবস্থিত এই গুহা। কৃত্রিম নয়, স্বাভাবিক গুহা।

অমরনাথ গুহা গাইড্ বুকে আছে, "সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২,৭৩০ ফিট উচ্চতায় অমরনাথ গুহা অবস্থিত। এই গুহা ৬০ ফিট লম্বা ২০ হইতে ৩০ ফিট বিস্তার এবং ১৫ ফিট উচ্চ। স্বাভাবিক গুহা।

এ সমস্ত জ্ঞানগর্ভ তথ্যের কথা ছাড়িয়া আমার তখন যে অনুভব হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। গুহাটি বড়, - বেশ বড়। অজন্তা কিংবা ইলোরার সবচেয়ে বড় গুহাটি হইতেও এই গুহা অনেক বড়। গুহার মেঝে যত বড় তাহাতে স্বচ্ছন্দে বেশ বড় বড় তিনটি কোঠা হয়, পাঁচটি কোঠা করিতে গেলে কোঠাগুলি ছোট ছোট হইয়া যাইবে। গুহার প্রবেশ মুখে মেঝে হইতে চালার বা ছাদের যে উচ্চতা গুহার পিছন বা শেষ অংশে সে উচ্চতা অনেক কম। অর্থাৎ উচ্চতা গুহামুখে যতটা, গুহার পিছনের দেওয়াল অংশে অনেক কম। আবার দুই পাশের দেওয়ালের যে উচ্চতা, গুহার মধ্যে উচ্চতা অনেক বেশী। উপরের ছাদটি সম্মুখ হইতে পিছনে বা দক্ষিণ হইতে উত্তরে একচালা ঘরের ন্যায় ক্রম নিম্নাভিমুখী ; আবার ছাদটি ধনুকের মত বাঁকিয়া পূব ও পশ্চিম দেওয়াল দুইটিতে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে।

গুহায় প্রবেশ করিলেই বাঁদিকে ছয়-সাতটি বড় বড় মঞ্চ বা বেদী। কোন কোনটি চৌকি বা খাটের সমান আবার কোনটি হয়ত দুই হাত পাশ দুই হাত লম্বা। আয়তক্ষেত্রকারই বেশী। প্রত্যেকটি বেদী এক একজন সন্ন্যাসী দখল করিয়া রাখিয়াছেন। সন্ন্যাসী বসা অবস্থায় আছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে যজ্ঞের বিভূতি বা ধূনির ছাই।

তীর্থযাত্রী তুষারলিঙ্গ, পার্বতী, গণেশ পূজা বা প্রণামের পর প্রত্যেক সাধুকে প্রণাম করে, প্রণামী দেয়, লক্ষ্য করিলাম প্রণামী পাঁচ-দশ পয়সাই বেশী, কদাচিৎ টাকা দুই টাকার নোট প্রণামী হিসাবে পড়ে। বহু তীর্থযাত্রী প্রণামের পর

মাথা আগাইয়া দেয়, সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রীর কপালে বিভূতির তিলক পরাইয়া দেন। লক্ষ্যণীয়, সাধু সন্ন্যাসীদের সবার বয়স কম মনে হইল। এই পঁচিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে।

দুই বেদী হইতে দুই সন্ন্যাসীর মজাদার কথোপকথন শুনিয়াছি।

: এ সমস্ত তীর্থযাত্রী কতদূর হইতে, কত কষ্ট করিয়া, কত পয়সা খরচ করিয়া এখানে আসিয়াছে, আর সন্ন্যাসীকে এত কম দেয় কেন?

: সব শঙ্করের ইচ্ছা।

আরেক সন্ন্যাসী এক মোটাসোটা বয়স্কা মহিলাকে পাকড়াও করিয়াছেন। সন্ন্যাসী কি শুধু পয়সা চাহিতেছেন? না রস সৃষ্টির জন্য বলিতেছেন কিংবা তাঁর চাহিদা আরও অনেক গভীরে, একটু মাতৃস্নেহ, কে বলিবে?

: এই মা, 'আরও পয়সা দাও; এই মা, কম করেও পঞ্চাশ পয়সা পূর্ণ কর; দেখ মা, পঞ্চাশ পয়সা পূর্ণ না করিলে কিন্তু ফিরা পথে তুষার ঝড়ে পড়িবে। এই মা, দেও না, পঞ্চাশ পয়সা পূর্ণ করে দাও।

সেই বয়স্কা মহিলার মুখে মৃদু মৃদু হাসি। ফিরা পথে তুষার ঝড়ে পড়িবে শুনিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছেন।

গুহার ভিতরের আবহাওয়াই কিরূপ স্বর্গীয় যেন। "ফিরা পথে তুষার ঝড়ে পড়বে", দুষ্ট ছেলের দুষ্টুমি ভিন্ন কিছুই নয়, বুঝিতে মহিলার এক মুহূর্তও লাগে নাই। সন্তানের আবদার ও মাতৃস্নেহের এক স্বর্গীয় মিলন প্রত্যক্ষ করিয়া আমার আত্মা পরিশোধিত হইল।

গুহামুখ অঞ্চলটা শুকনা। বাকী অংশ ভিজা স্যাতস্যাতে। উপরে অর্থাৎ ছাদে সব সময় ঘাম হইতেছে ও থেকে থেকে এক একটি বড় বড় জলের ফোঁটা পড়িতেছে। গুহার পিছন অংশে, উত্তর দেওয়াল সংলগ্ন অঞ্চলে একটি বেশ বুক সমান উঁচু প্রায় পাঁচ হাত লম্বা ও আড়াই তিন হাত পাকা একটি বেদী। এই বেদীটি লোহার রেলিংএ ঘেরা, তবে রেলিং এর মধ্য দিয়া লোক চলাচলের জন্য ফাঁক বা দরজা আছে। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুইটি দরজা। দরজার নিকট বেদীতে উঠার জন্য দুই দিকেই কাঠের সিঁড়ি। বেদীর পশ্চিম দিকে দেওয়াল ভেদ করিয়া একটি অতি ক্ষীণ জলধারা নিচে নামিয়া আসিতেছে। তীর্থযাত্রী, সাধু সন্ন্যাসী সবাই এই জলকে খুব পবিত্র জ্ঞান করেন। অমর গঙ্গা। সবার সুবিধার জন্য কে যেন একটি ছোট টিনের পাত ঐ জলধারার নিচে সুন্দর ভাবে লাগাইয়া রাখিয়াছে। টিনের পাত বাহিয়া খেজুর গাছের রসের মত ফোঁটা ফোঁটা পবিত্র বারিবিন্দু নিচে পড়িতেছে।

আমি জলধারার নিকট গেলাম। আমার বাঁ দিকে তিন সাড়ে তিন হাত লম্বা, দুই হাত পাশ (যেখানে পাশ সবচেয়ে বেশী) ও মুট—হাত উচ্চতায় বিশিষ্ট একটি বরফের চাঁই। পার্বতী। এই পার্বতী। পার্বতী হিসাবেই ভক্তের পূজা প্রণামী পাইতেছে। ডানদিকে লিঙ্গ, তুষার লিঙ্গ। যার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় আমি এখানে আসিয়াছি। আমার মত শত শত যাত্রী আসিয়াছেন। শত সহস্র বৎসর ব্যাপী সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী আসিতেছেন। সেদিন শুক্লা অষ্টমী, তুষার লিঙ্গ পূর্ণ হয় নাই। শুক্লা প্রতিপদে বরফ জমিতে শুরু করে। তারপর প্রত্যহ একটু একটু করিয়া বরফ বাড়িতে থাকে। পূর্ণিমায় বৃদ্ধির পূর্ণ অবস্থা। তুষার লিঙ্গের উচ্চতা তখন সবচেয়ে বেশী। আবার পূর্ণিমার পর হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রতি তিথিতে তুষার লিঙ্গের উচ্চতা একটু একটু করিয়া কমিতে কমিতে অমাবস্যা তিথিতে গুহার মেঝেতে কোন জমানো বরফ থাকে না, তুষার লিঙ্গ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া যায়। লিঙ্গের এই হ্রাস-বৃদ্ধি রাত-দিনের তাপাংকের সহিত সম্পর্কশূন্য। মনে করি শুক্লা তৃতীয়াতে যত ডিগ্রি গরম তার চেয়ে বেশী গরম চতুর্থীতে, চতুর্থী থেকে বেশী গরম পঞ্চমীতে ইত্যাদি, তবু দেখা যাইবে শুক্লা পক্ষে তৃতীয়াতে লিঙ্গ যতখানি উঁচু ছিল, চতুর্থীতে কিংবা পঞ্চমীতে গরম আরও বেশী হওয়া সত্ত্বেও বরফ আরও বেশী বেশী জমিতেছে, অর্থাৎ তুষার লিঙ্গ উঁচু হইতেছে। কৃষ্ণপক্ষে বিপরীত গতি লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ কৃষ্ণা ষষ্ঠী যত শীত তার চেয়ে বেশী শীত যদি কৃষ্ণা সপ্তমী বা কৃষ্ণা ষষ্ঠীতেও হয় তবু, শীতে বরফ জমার পরিবর্তে বরফ গলে অর্থাৎ তুষার লিঙ্গের উচ্চতা কমিতে থাকে। এই হ্রাসবৃদ্ধি শুধু তুষার লিঙ্গেরই নয়, তুষার লিঙ্গের দুদিকে আরও দুইটি বরফের স্তূপ, পার্ব্বতী ও গণেশ, একই নিয়মে অর্থাৎ পূর্ণিমাতে পূর্ণ অবস্থা ও অমাবস্যায় অদৃশ্য, শুক্লাপক্ষে বৃদ্ধি, কৃষ্ণপক্ষে হ্রাস।

মূল তুষার লিঙ্গের নিকট যাইতে হইলে একটি কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া মঞ্চে বা বেদীতে উঠিতে হয়। নীচু হইতে দেখিলাম চৌদ্দ পনের জন পুণ্যার্থী, মহিলাই বেশী, লিঙ্গ ঘিরিয়া পূজারীর নির্দেশ মত ও পূজারীকে অনুসরণ করিয়া পূজারীর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া লিঙ্গ—পূজা করিতেছেন। পুণ্যার্থীর ভিড় থাকা সত্ত্বেও লিঙ্গ দর্শনে এতটুকু অসুবিধা হইতেছে না।

আমি মঞ্চে উঠিলাম। আগে লিঙ্গ দেখি। তুষার লিঙ্গের নিকট হাঁটু মুড়িয়া বসিলাম। প্রায় দেড়হাত উচু, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ দু-হাতে বেড় পাইবে না এরূপ ব্যাস বিশিষ্ট বিশ্বের বিস্ময় প্রকৃতির দান তুষার লিঙ্গ। রং সাদা, ধব্ ধবে সাদা বলিতে যে সাদা রং বুঝি সেরূপ সাদা নহে, নীলাভ সাদা, অনেক

তীর্থযাত্রী পূজার পর ঘি-এর প্রদীপ জালাইয়া দিয়া গিয়াছেন, সেগুলি এখনও জ্বলিতেছে। কেহ কেহ জলন্ত ঘৃত প্রদীপ সহ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে আরতি করিতেছেন। ঘি এর প্রদীপ মানে সচরাচর বাড়ী ঘরে কিংবা দেব-মন্দিরে যেরূপ প্রদীপ দেখিয়া অভ্যস্থ সেরূপ কোন প্রদীপ নয়। তীর্থযাত্রী বাড়ী হইতে বাহির যাওয়ার সময় ছোট ছোট তুলার দলাতে বেশী করিয়া ঘি মাখাইয়া লয়। এখন আরতির সময় ঐ তুলার দলাগুলিকে শঙ্কুর আকার করিয়া কোন কাষ্ঠ খণ্ডে, বা সুবিধাজনক পাথরের টুকরায় বসাইয়া আগুন জালানো হয়—তাহাই ঘৃত প্রদীপ।

তুষার লিঙ্গের পাদদেশে জলন্ত প্রদীপ বা জলন্ত প্রদীপ সহ আরতিরত ভক্তবৃন্দকে দেখিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে নিজের সুখ দুঃখের কথা নিজের প্রার্থনার কথা জানাইব কি, মহাদেবের দুরবস্থা দেখিয়া সহানুভূতিতে যেন মন ভরিয়া উঠিল। চিন্তা করিলাম, ভক্তির এই উৎকট প্রকাশ দেবাদিদেবের কতক্ষণ সহ্য করার শক্তি ধরেন? ভক্তির এই অতিশয্যে গণেশ কোন-সময় গুহা ছাড়িয়া সটকাইয়া পড়িয়াছেন, অর্থাৎ তুষার লিঙ্গের এক পাশে পার্বতী, অপর পাশে গণেশ, বা দু-পাশে দুইটি বরফের স্তূপ। গণেশের স্তূপটি আমার গুহা প্রবেশের পূর্বের গলিয়া গিয়াছে। পার্বতী যাই যাই করিয়াও বিরূপ পরিস্থিতিতে, হয়ত বৃদ্ধ স্বামীর চিন্তায়, যাইতেছেন না। পূজারীর মুখে শুনিয়াছি পার্বতী সকালে যত বড় ছিলেন, এখন অনেক ছোট হইয়াছেন। শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়ত পার্বতীকে ভক্তবৃন্দের ঠেলায় গণেশের পথই অনুসরণ করিতে হইবে। পরে শুনিয়াছি গতবার অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে শ্রাবণী পূর্ণিমায় যাঁহারা দুপুর দেড়টা দুইটার পর গুহায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নাকি স্বয়ং দেবাদিদেবকেও গণেশ ও পার্বতীর পথ অনুসরণ করিতে দেখিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা গুহায় প্রবেশের পর কোন তুষার লিঙ্গ দেখেন নাই—সব গলিয়া জল হইয়া গিয়াছিল।

আগে শুধুমাত্র শ্রাবণী পূর্ণিমায় তীর্থযাত্রী গুহায় প্রবেশ করিত। তখন তুষার লিঙ্গ পূর্ণরূপ ধারণ করিতে পারিত। এখন আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুইমাস, কমবেশী সব সময় যাত্রী চলাচল করে। শুধুমাত্র মানুষের উপস্থিতির কারণেও কোন গুহায় বা বদ্ধস্থানে গরম বাড়ে বা শীতের প্রকোপ কম হয়। তা ছাড়াও মন্ত্রোচ্চারণ, গুহায় যাত্রীদের কথা বলা, সর্বোপরি জলন্ত প্রদীপের আরতি। এ সমস্ত কারণে এখন আর আগের মত তুষার লিঙ্গ বড় হয় না। আমি শুক্লা অষ্টমিতে দেড়হাত তুষার লিঙ্গ দেখিয়াছি। পূর্ণিমায় না হয় তিন হাত, বড় জোড় পাঁচ ফুট

উঁচু হইবে। আগে অর্থাৎ যখন শুধুমাত্র শ্রাবণী পূর্ণিমার লোকে গুহায় যাইত তখন তুষার লিঙ্গের উচ্চতা ৮/৮½ ফুট, পার্বতী ৭/৭½ ফুট ও গণেশ ৬½/৭ ফুট মত থাকিত।

আমি লিঙ্গ পূজার প্রস্তুতি নিতেছি। আমার সাইড-ব্যাগ হইতে কিস্‌মিসের প্যাকেট বাহির করিলাম। দক্ষিণা বাবদ একটি দশ টাকার নোট। দু-তিন টাকার ভোগ আর দশ টাকা দক্ষিণা বেমিল মনে হইতে পারে। আমার অভিজ্ঞতার আলোকে জোর গলায় বলিতে পারি, পাঠক, তুমি যদি পঁচিশ টাকার ভোগ আর দুই টাকা দক্ষিণা দিয়া পূজা দিতে চাও, আর আমি যদি একই সময়ে দুই টাকার ভোগ আর দশ টাকা দক্ষিণা দিয়া পূজা দিতে যাই, তবে আমিত পূজারীর অনেক বেশী কৃপা পাইব, আমার বিগ্রহ দর্শন ইত্যাদি তোমার চেয়ে অনেক ভালভাবে সম্পন্ন হইবে।

কেদারনাথ মন্দিরে প্রথমদিন বিকালে যখন একটি ছোট নকুলদানার প্যাকেট সহ উপস্থিত হই তখন কেদারনাথের শৃঙ্গাররূপ, আরতি চলিতেছে, আরতি চলাকালীন ভোগ নেওয়া হইতেছে না, আরতির পর ভোগ দেওয়া যাইবে। যাত্রী তথা দর্শক তথা ভক্তবৃন্দ হাত জোড় করিয়া কেদারনাথের আরতি দেখিতেছেন। আমার দেরী পোষাইতেছিল না। চারিদিক সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখিলাম। মূল গর্ভগৃহে একট তের চৌদ্দ বছরের পাণ্ডাকে চোখের ইশারায় ডাকিয়া নকুলদানার প্যাকেটটি ও নগদ একটি নূতন দুই টাকার নোট দিলাম। ছেলেটি নীরবে দুই টাকার নোটটি কোমরে গুঁজিয়া আমাকে নিয়া এরূপ স্থানে দাঁড়া করাইল যেন বিগ্রহটি বা পাথরটি এবং ছেলেটির কার্য্যকলাপ আমি ভালভাবে দেখি। আমি দেখিলাম প্যাকেট হাতে সে বিগ্রহের নিকট গেল। প্যাকেট ছিঁড়িয়া কিছু নকুলদানা বাহির করিয়া নিকটে রক্ষিত পাত্রে রাখিল। ঐ পাত্র হইতে কিছু লইয়া প্যাকেটে পুরিল, আবার কেদারের পাথর হইতে কিছু ফুল বেলপাতা লইয়া প্যাকেটে ঢুকাইয়া আস্তে আস্তে হাঁটিয়া আমার নিকট আসিল। সবার অলক্ষ্যে একসময় চুপচাপ প্যাকেটট ফিরত দিল। এ যদি পূজা হয় তবে তখন আমি পূজা দিয়াছি। অবশ্য পরদিন ভালভাবে পূজা, দর্শন, স্পর্শ বা আলিঙ্গন করিয়াছি। পূজার দক্ষিণা দেওয়া না ঘুষ দেওয়া। পাণ্ডার জ্বালায় বিগ্রহের প্রতিই ভক্তিশ্রদ্ধা রাখা কঠিন। মন্দিরের এ চিত্র ভারতের সর্বত্র। দক্ষিণ ভারত কিছুটা ব্যতিক্রম। সেখানে টিকিট কাটিয়া বিগ্রহ দর্শন করিতে বা ভোগ দিতে হয়। এক এক জাতের টিকিটের এক এক দর। সাধারণ দর্শন,

বিশেষ দর্শন, বা সাধারণ ভোগ, বিশেষ ভোগ এরূপ বিভিন্ন—শ্রেণীর দর্শন ও ভোগের টিকিটের দরও ভিন্ন ভিন্ন। দক্ষিণ ভারতে একটা মস্ত সুবিধা, পাণ্ডার জুলুম নাই বললেই চলে। পূজার দক্ষিণা বাবদ কাহারও নিকট একটাকা, কাহারও নিকট হইতে দশ টাকা আদায় করার কোন অসুবিধা দক্ষিণ ভারতের মন্দির সমূহের পাণ্ডাদের নাই। তবে? তবে, কথা এখানেও আছে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কাহারও কোন কথায় কোন কাজ হইবে না।

ত্রিবান্দ্রাম, অনন্তপদ্মানাভনম্ মন্দির। নারায়ণ শোওয়া অবস্থায় আছেন। নাভি হইতে মৃণাল, মৃণালের শেষ মাথায়, পদ্ম, পদ্মে বসা অবস্থায় ব্রহ্মা। বিশাল মূর্ত্তি, গর্ভগৃহের কয়েকটি বড় বড় দরজা আছে। নারায়ণ মূর্ত্তি এত বড় যে, সাধারণ দর্শনার্থীকে যেখানে দাঁড়া করানো হয় সেখান থেকে কোন সময়েই সবটা মূর্ত্তি দৃষ্ট পথে আসে না। মূর্ত্তির মাথা, এক দরজায় দেখিলে, অন্য দরজা দিয়া নাভিদেশ তথা ব্রহ্মা ও অন্য আরেক দরজা দিয়া মূর্ত্তির পা দেখিতে হয়। সন্ধ্যায় যাত্রীর ভীড়ও হয় প্রচণ্ড। একটা ঠেলাঠেলি। জনা সাত-আট জন পাণ্ডা মূর্ত্তির দিকে পিছন দিয়া এবং যাত্রীদিগের দিকে মুখ করিয়া যাত্রী ও বিগ্রহের মাঝামাঝি স্থানে মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়ায়। এ পাণ্ডাদের আবার এজেন্ট আছে। এজেন্ট যাত্রীদের নিকট ভালভাবে বিগ্রহ দর্শন করাইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া পয়সা লয়, পয়সার একটা অংশ পাণ্ডাকে দেয়। পাণ্ডা চক্ষের পলকে পয়সা কয়টি কোমরে ভাঁজে গুজিয়া রাখে। এজেন্ট ও পাণ্ডার চোখের ইশারায় আলাপ সালাপ। আলাপ শেষে এজেন্ট হাত দিয়া দেখায় কাহাকে কাহাকে ভালভাবে মূর্ত্তি দর্শন করাইতে হইবে। এ সময়ে ঐ ঘুষ দাতা যাত্রীদের ও পাণ্ডার দৃষ্টি আকর্ষণ করার সে কি আকুতিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি।

নগদ টাকার মূল্য সর্বত্রই আছে, তবে দেবালয়ে বেশী—এই যা।

তুষার লিঙ্গের সম্মুখে আমি বসা অবস্থায়, এক হাতে একটি দশ টাকার নোট অন্য হাতে কিস্‌মিসের প্যাকেট। লিঙ্গের দুই পাশে দু-জন পূজারী বা পাণ্ডা, মার্তণ্ডের ব্রাহ্মণ। জীবনে বহু রকমের বরফ দেখার অভিজ্ঞতা আছে, কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক। প্রাকৃতিক বরফের মধ্যেও আবার বলা যায় শিলাবৃষ্টির, তুষার পাতের, তুষার কণার, গ্লেসীয়ার—নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়া রহিয়াছে, কোথায়ও হয়ত বা নদীর জলে বরফের টুকরা ভাসিয়া আসিতেছে, পর্বত চূড়ায় পর্বত গাত্রে, পর্বত পাদদেশে বরফ দেখিয়াছি। কিন্তু তুষার লিঙ্গের বরফের সাথে অন্য কোনরকম বরফের—না কৃত্রিম না প্রাকৃতিক—কোন মিল নাই। সাদা

নয় নীলাভ। তুষার লিঙ্গের বাহির অংশ দুই তিন আঙ্গুল বা এক দেড় ইঞ্চি বরফ স্বচ্ছ। প্রাকৃতিক বিস্ময় এই তুষার লিঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনার অতীত। যতক্ষণ সম্ভব শুধু দেখিতেই ইচ্ছা করে। তুষার লিঙ্গের দিকে একবার তাকানোর পর আর অন্যদিকে চোখ ফিরাইতে মনে লয় না, শুধু লিঙ্গের দিকে তাকাইয়া থাকিতেই মন চায়। লিঙ্গটি গোল ও মসৃণ, একেবারে থামের মত। কাহার মুখের যেন শুনিয়াছিলাম। তুষার লিঙ্গের রহস্য ভেদ করিতে বৈজ্ঞানিকগণ এখন সমর্থ্য হইয়াছেন। ঠাণ্ডা বাতাস গুহায় প্রবেশ করে। গুহার যেস্থানে তুষার লিঙ্গ হয়, সেস্থানে ঐ ঠাণ্ডা বাতাস একটি পাক খায়, নদীর ক্রোড়ের মত অবস্থা হয়। তাহাতেই তুষার লিঙ্গের সৃষ্টি। স্বীকার করি আমি বৈজ্ঞানিক নই, কিন্তু আমি কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন নই, একথা কিভাবে স্বীকার করি? আমার কাণ্ডজ্ঞান বলিতেছে, বাতাসের পাকে তুষার লিঙ্গের সৃষ্টি—মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা, মিথ্যা ব্যতিত কিছুই নয়। বাতাসের পাকে তুষার লিঙ্গের ফর্মুলা যাহারা দেয় তাহারা বৈজ্ঞানিক নয়, তাহারা অন্যকে ধাপ্পা দেয়, তাহারা ধাপ্পাবাজ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধাপ্পাবাজ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর বা কলিতে, কোন কালেই তাদের তুল্য ধাপ্পাবাজ এ জগতে আসে নাই। যদি তুষার লিঙ্গের সৃষ্টি বাতাসের পাকেই হইত তবে প্রতি বৎসর গুহার নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট ব্যাসে হইত না—আর তা এত মসৃণই বা কিভাবে হয়?

পূজায় মনোযোগ দিলাম। প্যাকেটটি পূজারীর হাতে দেই, পূজারী প্রসাদ করিয়া আবার আমার হাতে ফেরত দেয়। নোটটি পূজারীকে দিলাম। মনে মনে লিঙ্গের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলাম—"ঠাকুর, সবটা টাকা আমার নয়, এর মধ্যে মিঠুর পাঁচ টাকা আছে। মিঠুর পাঁচ টাকা পথেই কাঁচা টাকায় বদলাইয়া আলগা করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু অতিযত্নে পাহালগামেই বহিয়া গিয়াছে। এখনও তুমিই একটু কষ্ট করিয়া ভাগ করিয়া নিও। আমি ৮ই আগস্ট বিকাল ৩টায় সিটি অফিসে রিপোর্ট করি। সেদিন দুপুরের দিকে মীরা খবর পায় আমি আজই অমরনাথের উদ্দেশ্যে ফ্লাই করিতেছি। সিটি অফিসে পৌঁছিয়া দেখি সামন্ত হাজির।

: কি ব্যাপার?

: না, মীরা আপনাকে পাঁচ টাকা দিতে বলিয়া দিয়াছে। অমরনাথে, আর অমরনাথে সম্ভব না হইলে, যে কোন দেবালয়ে মিঠুর নামে এই পাঁচ টাকা দিবেন।

পথে সেই পাঁচ টাকা কাঁচা টাকায় বদল করিয়া একটি খামে আলগা করিয়া অতিযত্নে রাখিয়াছিলাম। গুহায় প্রবেশের পর—পূজা দেওয়ার সময় খেয়াল হয়—তাই ত, মিঠুর টাকা? ইস্ পাহালগামে রহিয়া গিয়াছে। ভুল আমার। তাই দেবতার নিকট স্বীকারোক্তি—"ঠাকুর, সবটা টাকা আমার নয়, এর মধ্যে মিঠুর পাঁচ টাকা আছে।"

পূজার পর বলিলাম—"আমি লিঙ্গ স্পর্শ করিব।"

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, এদিকে আস।

আমি হাত মোজা খুলিয়া দু-হাতে লিঙ্গ স্পর্শ করিলাম। কি যে একটা অনুভব? মাথায় চুল হইতে পাদমূল পর্যন্ত একটা অদ্ভুত শিহরণ, মনে হইতে লাগিল হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া যেন হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াছে, বাড়িয়া গিয়াছে রক্তের চাপ, মনে হইতে লাগিল এক মুহূর্তে যেন আমার সবগুলি ইন্দ্রিয় এককভাবে ও যৌথভাবে অনেক বেশী সক্রিয় অনেক বেশী সতেজ। আমি যেন দেহের মধ্যে গলিয়া রহিয়াছি। একবার হাত উঠাইয়া আবার স্পর্শ করিলাম। আমার মনেও নিশ্চয় কোন ক্রিয়া হইতেছিল কিন্তু 'মনের সে ক্রিয়াকে ভাষায় রূপ দেই আমার সে শক্তি নাই। "ভারতকোষ—৫ খণ্ড" শিব ব্যাখ্যায় ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কিংবা "পৌরাণিক অভিধানে সুধীরচন্দ্র সরকার যে প্রতিবেদন রাখিয়াছেন তাহাতে আমার তখনকার মনোভাব অনেকখানি ফুটিয়াছে। ব্যাখ্যাটি মুখস্থ থাকিলে আমি তখন চিৎকার করিয়া মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায় বলিতাম,—

"হে শঙ্কর, তুমি রজত গিরি সদৃশ, চন্দ্রকলা তোমার ভূষণ, তুমি চারি হস্তে মৃগ, ধর, অভয় ধারণ করিয়া আছ, তুমি প্রসন্ন ও পদ্মাসীন, তোমাকে চতুর্দিক হইতে দেবগণ স্তব করিয়া থাকেন, তুমি বিশ্বের আদি, বীজ ও নিখিল ভয়নাশক সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংশের নিয়ামক। অনেকে তোমাকে ভারতীয় দেবদেবীর চিন্তার আদিমতম নমুনা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে বৈদিক যুগের বহুপূর্ব হইতে সিন্ধু সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত দেব হিসাবে তুমি বন্দিত। অনার্য বলিয়াই বৈদিক যাগযজ্ঞে তোমার হবির্ভাগ ছিল না। দক্ষ এই কারণেই আয়োজিত যজ্ঞে তোমাকে আমন্ত্রণ জানায় নাই। এই যজ্ঞায়োজন পণ্ড হইলে অন্যতম যজ্ঞরূপে তোমার স্বাকৃতি লাভ ঘটে। আবার অনেকে তোমাকে বৈদিক রুদ্র, পূষা এবং সোমের বিবর্তিতরূপে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাণ ও তন্ত্রের শিবতত্বে তোমার মহিমা স্বপ্রকাশ। তোমায় প্রণাম।

"হে শঙ্কর, তুমি ত্রিমূর্তির অন্যতম। প্রলয়ের তমোগুণে রুদ্রমূর্তিতে বিশ্ব সংসার হরণ কর সেইজন্য তুমি হর। মহাকাল তোমারই নামান্তর। তুমি বিরূপনেত্র হেতু 'বিরূপাক্ষ', ত্রিনয়ন হেতু 'ত্রিলোচন'।" মৃত্যুঞ্জয়ী বলে 'মৃত্যুঞ্জয়', অগ্নিনেত্রে কামদাহ হেতু "স্মরহর", পিনাক তোমার ধনু তাই তুমি "পিনাকী", মস্তকে তোমার জটাজুট হেতু তুমি "কপর্দী"। ডমরু তোমার প্রিয়বাদ্য, কৈলাস তোমার প্রিয়ধাম। প্রমথগণ তোমার প্রিয় সহচর। হলাহল পানে নীলকণ্ঠ হেতু তুমি "নীলকণ্ঠ", তোমায় প্রণাম।

পূজার পর বেদী হইতে অন্য সিঁড়ি বা পূর্বদিকের সিঁড়ি দিয়া গুহার মেঝেতে আসিলাম। এবার গুহার তিন দিকের দেওয়াল লক্ষ্য করিলাম। গুহাটি ভালভাবে দেখিতেছি। লিঙ্গের পিছনে দেওয়াল হইতে যে সংকীর্ণ একটি জলধারা নিচে নামিয়া আসিতেছে। তাহাতে অমরনাথের পবিত্র বারি লওয়ার চরণ সিং-এর নিকট থেকে কেনা একটি বোতল ধরিলাম। কেনার সময় সন্দেহ হয় বোতলটি মদের, আর পরিষ্কারও নয়। ঐ জলধারাটি অমরগঙ্গা। আমি হাতে কোষ করিয়া জল লই। মাথায় ছোঁয়াই, এক দুই গণ্ডুষ জলপান করি। স্বাভাবিক ঠাণ্ডা জল, উল্লেখ করার মত জলের কোনরূপ বৈশিষ্ট্য তখন দেখি নাই। আমি বোতলটি জলপূর্ণ করি। বোতলের মুখ লাগাইয়া সাইড ব্যাগে রাখি। কিন্তু ঐ জলই আমাকে যে খেলা দেখাইয়াছে, তার ব্যাখ্যা আজ পর্য্যন্ত আমার নিকট পরিষ্কার নয়, অন্যকে কি করিয়া বিশ্বাস করার জন্য বলি?

পাহালগামে আসিয়া দেখি অর্ধেক বোতল খালি, অর্ধেক বোতলের জলে আমার দুইটি কম্বলই ভাজে ভাজে ভিজিয়া রহিয়াছে। নিজের উপর রাগ হইল, বোতলটি ভালভাবে না আনার জন্য। চরণ সিং-এর উপর রাগ হইল। "বেটা পয়সা নিয়া খালি মদের বোতল দিলি, তা মুখটা একটু দেখিয়া দিলি না?" সিদ্ধান্ত নিলাম এ জল এখানেই শেষ করিব। গুরুদ্বারাতে জনৈক বৃদ্ধ শিখ ভদ্রলোককে একান্তে জিজ্ঞাসা করি, আমার নিকট অমরনাথ গুহার অমর গঙ্গার জল আছে তিনি নিবেন কিনা। আমার কথাশুনা মাত্র তিনি দু-হাত মাথায় মুছিতে মুছিতে আসিলেন। এক বৃদ্ধা ও যেন কি করিয়া আমার কথা শুনিয়া ফেলে, তিনিও আসিলেন। যথার্থ ভক্ত। বিনম্র ভাবে দু-জনেই বাঁ হাতের উপর ডান হাত কোষ করিয়া দাঁড়াইলেন। আমি হাসিয়া জানাইলাম বোতলটিই তাহাদিগকে দিয়া দিব। চোখ-মুখ দেখিয়া বুঝা গেল তাঁহারা বেশ অবাক হইয়াছেন। বোতলটি দেওয়ার আগে কি মনে করিয়া একটু জল মাথায়

দেই ও এক কোষ জল পান করি। এ কি? চমকাইয়া উঠিলাম। নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। নিজের নাককে, নিজের জিহ্বাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কোথা থেকে এ গন্ধ। এ স্বাদ। কস্তুরী মৃগনাভি ভিজানো জলেও এ গন্ধ আসিবে না, তার চেয়েও মনোরম এবং বেশ চড়া গন্ধ। কস্তুরী মৃগনাভি দিয়া না হয় গন্ধ কিছুটা বুঝাইলাম কিন্তু স্বাদ? স্বাদ ব্যাখ্যা করি কি দিয়া? আমি একান্ত অসহায়। এ স্বাদের ধারে কাছে আসিতে পারে এমন কোন পার্থিব বস্তুর নাম আমার জানা নাই। জানিনা একেই অমৃতের স্বাদ বলে কিনা। বিস্ময়ের যখন কিছুটা স্বাভাবিক হই তখন আবার বোতলটি ভাল করিয়া দেখি। চরণ সিং-এর নিকট হইতে ক্রয় করা নোংরা মদের বোতল। বোতলটি যে অবস্থায় লইয়াছিলাম সে অবস্থাতেই বোতলে জল ভরিয়া ছিলাম। জলে গন্ধ বা স্বাদ কোথা হইতে আসিয়াছে? আবার বেশ বড় এক কোষ জল হাতে লইয়া মুখে দিলাম, ভিজা হাত মাথায় মুছিলাম। সেই একই অপূর্ব গন্ধ, স্বর্গীয় স্বাদ। মনে একবার কুচিন্তা আসিয়াছিল, এ দুজন ত এক কোষ জল পাইলেই সন্তুষ্ট। কৃতার্থ হয় তাঁহাদিগকে এককোষ এককোষ জল দিয়া বাকী জল নিজের কাছে রাখিয়া দেই, আর একবার চিন্তা করি, মনে মনে ত তাহাদিগকে বোতলটি দিব সংকল্প করিয়াছি এখন আর বাকী জল নিজের কাছে রাখিয়া দেওয়া ঠিক নয়। হিমালয়ের নিজস্ব মাহাত্ম্যও থাকিতে পারে। আমি দ্বিতীয় কোষ জল পান করার পর বোতলটি তাহাদিগকে দিয়া দিই। দুই কোষ জল পানের পর আমার দেহের ভিতর যেন একটা স্নিগ্ধ গন্ধ ম্—ম্ করিতেছিল। প্রশ্বাসের সঙ্গেও যেন একটা শুদ্ধ গন্ধ দেহ হইতে বাহির হইতেছে এরূপ অনেকক্ষণ টের পাইতেছিলাম।

বোতলে জল ভরার পর আবার গুহার দরজায় বা গুহামুখে আসিলাম। গুহার একটি মাত্র দরজা বা গুহামুখ। গুহাটি পর্বতের ভিতরে। অতএব গুহার দুই পাশে ও পিছন দিকে দরজা বা জানালা থাকার সুবিধা নাই। নিজের কোঠা বা ঘরের কথা চিন্তা করুন। যদি একটি মাত্র দরজা খোলা, আর অন্য সব দিকের দরজা-জানালা বন্ধ থাকে তবে খোলা দরজার নিকট অঞ্চলে যে আলো পাইবেন ঘরের অন্যত্র ততখানি আলো পাইবেন না। ঘরের বা কোঠার কোণের দিকে

আলো আরও কম। অমরনাথ গুহার ভিতরেও একই অবস্থা। গুহামুখ অঞ্চলে যতখানি আলো, গুহার যত ভিতরের দিকে যাওয়া যায় আলোও ততই কমিয়া আসে। গুহার পিছন দিকে তুলনামূলক ভাবে আলো কম থাকিলেও সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। আলোর ব্যাপারে অমরনাথ অজান্তা গুহার মত দুরাবস্থা সম্পন্ন নয়। আমার টর্চ আনা নিরর্থক প্রতিপন্ন হইয়াছে। আলো ছাড়াও তাপের বা ঠাণ্ডারও হের ফের ছিল। আমার যেন বোধ হইতেছিল,—ভুল হইলেও হইতে পারে—গুহামুখের ঠাণ্ডা, গুহার অভ্যন্তরের ঠাণ্ডার চেয়ে অনেক কম। আমি যখন গুহায় ছিলাম, তীর্থযাত্রী সবই ছিল তবে ভীড় ছিল না। সচরাচর তীর্থযাত্রী পনের কুড়ি মিনিটের বেশী গুহায় থাকেন না। গুহার ভিতর হইতে গুহার ঠাণ্ডা অনেক কম। আমার চিন্তায় ছিল, এ আসাই তো আসা, আবার কবে এখানে আসি কে বলিবে? আদৌ এ জীবনে আর তারই হইবে কিনা ঠিক ঠিকানা নাই। অতএব যতক্ষণ সম্ভব থাকি। ঘোড়াওয়ালা আসিয়া ডাকাডাকি করিলে গুহার বাহির হইতেছি। গুহার প্রবেশের সময়ই কোন সময় যেন জুতা মোজা খুলিয়া রাখিয়াছি। গুহার ভিতর গুহামুখ অঞ্চলে কিছুটা জায়গা শুকনা, বাকী অংশ ভিজা স্যাত স্যাতে। গুহার ছাদ হইতে সব সময় টস্ টস্ করিয়া জলের ফোঁটা পড়িতেছে। গুহার ছাদও মেঝের মত ভিজা স্যাত স্যাতে। ভিজা ছাদে জলের ফোঁটা গঠিত হইতেছে দেখা যায়। জলের ফোঁটাটি বড় হইতেছে লক্ষ্য করা যায়, ফোঁটটি বড় হইতে হইতে এক সময় নিচে পড়ে। গুহার জল, পবিত্র মনে করিয়া এক ফোঁটা জল মেঝেতে পড়ার আগেই হাত পাতিয়া শূন্যে ধরি, মুখে দিই, মাথায় লাগাই। পরে শুনিয়াছি ভক্তগণ এ জলকে সত্যিই অনন্ত পবিত্র জ্ঞান করেন। শ্রাবণী পূর্ণিমায় এমনও হয়, কেহ হয়ত অনেকক্ষণ চেষ্টার পর ছাদে একটি জলের ফোঁটা তৈয়ার হইতেছে দেখিয়া ঐ ফোঁটাটির ঠিক নিচে ঘাড় যথাসম্ভব পিছনে দিকে বাঁকাইয়া প্রস্তুত হইয়াছেন, ফোঁটা পড়ামাত্র সোজা মুখে লইবেন, এবং ফোঁটা পড়ার সময় তাঁহার নীট লাভ পিছন হইতে একটি মৃদু ধাক্কা। চরম মুহূর্তে মৃদু ধাক্কায় তিনি একটু স্থানচ্যুত হইলেন। ধাক্কাদাতা ফোঁটাটি নিজের মুখে লইয়া লইল। তিনিও তীর্থযাত্রী, ভক্ত, পুণ্যার্থী। আশ্চর্য্য এরূপভাবে স্বার্থপরের মত জল মুখে লইয়া ও কেহ কেহ মনে করে পুণ্য অর্জন হইল।

গুহার ভিতরের দিকে ঠাণ্ডা বেশী। ঠাণ্ডায় হাত পা প্রায় অবশ হইয়া গেলে গুহামুখে আসিতাম। গুহাবাসী সন্ন্যাসীদিগকে দেখিতাম, তাহাদের কথাবর্তা শুনিতাম। পায়ে আবার বোধশক্তি ফিরিয়া আসিলে আবার গুহার ভিতর দিকে যাইতাম। এরূপ ভাবে প্রায় তিন-চার বার গুহামুখে আসিয়া শরীর চাঙ্গা করি আবার ভিতরে যাই। গুহাতে প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিলাম। হাত-পা এত ঠাণ্ডা হয় যে, কি বলিব? কোন কিছুর বা শরীরের কোন অংশের ঠাণ্ডা বা গরম দেখিতে আমরা হাতই ব্যবহার করি। বাঁ-হাতের আঙ্গুল কতটা ঠাণ্ডা হইয়াছে, ডান হাত দিয়া দেখি। এখন সমস্যা, ডান হাতও তো সমান ঠাণ্ডা। একটি ঠাণ্ডা হাত দ্বারা আর একটি সম-ঠাণ্ডা হাতের তাপ অনুভব করিতে গেলে কি আর বুঝা যায়? তবে মনে হইতেছিল, এখন যদি কোন কারণে হাত বা পা কাটে তবে এক ফোঁটাও রক্ত বাহির হইবে না। এরূপ বোধ হওয়ার কি কারণ আমি জানি না। গুহার ভিতরে গুহামুখে শরীর চাঙ্গা করিয়া ও গুহার ভিতর অংশ ঠাণ্ডায় জমিয়া যাইতে যাইতে বেশ লাগিতেছিল। সব কিছুই যেন শিশুর কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখিতে ছিলাম, শেষ দিকে মনে অদ্ভুত চিন্তা আসিল। চিন্তায় মৌলিকত্বে নিজেই চমৎকৃত হইয়া গেলাম। অমরনাথ গুহা, খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দে রাজা রামদেব রাজা শুকদেবকে এই গুহায় আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে এরূপ উল্লেখ আছে। ধরিয়া নিতেছি প্রায় ৩০০০ হাজার বৎসর যাবৎ গুহাটি মানুষের জ্ঞানে আছে, এই ৩০০০ হাজার বৎসরে কাহারও মনে এরূপ সন্দেহ উঁকি দিয়াছে কিনা আমার জানা নাই। এই সন্দেহের কথা প্রকাশ করিলে ভক্তজন ব্যথিত হইবেন কিনা জানি না। সাধু-সন্ন্যাসীগণ ক্রোধান্বিত হইয়া ত্রিশূল উচাইয়া মারিতে আসিবেন কিনা বলিতে পারি না।

প্রাকৃতিক জিনিষ হইতে কৃত্রিম জিনিষের "ফিনিসিং টাচ্" বা সমাপনী শ্রীলেপ অনেক সুন্দর। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে প্রকৃতি অদ্বিতীয়া হইলেও মনে হয় সমাপনী শ্রীলেপে মানুষের স্থান প্রকৃতির উর্দ্ধে, নদীর গমন আঁকাবাঁকা, খালসোজা দীঘির চারপাড় যেরূপ সোজা হয় বা পাড়ের সমাপনী শ্রীলেপ যত সুন্দর, প্রাকৃতিক জলাশয়ের সৌন্দর্য্য বেশী হইলেও সমাপনী শ্রীলেপ দীঘির মত নয়।

গুহা দুই রকমের হয়। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বা মানুষের খোদাই। আমরা ঘর বাড়ী দালান কোঠা তৈয়ার হইতে দেখিয়াছি। সব সময় নীচু হইতে তৈয়ারীর কাজ শুরু হয়, কিন্তু গুহার ব্যাপার আলাদা, গুহা খোদাই-এর কাজ উপর হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে ছাদ, তারপর নীচের দিকে আসিতে আসিতে মেঝে পর্যন্ত। পুকুর বা দীঘি খনন করার মত, প্রথমে উপরের অংশ খনন করিতে করিতে সর্বশেষে নিচের অংশ।

অমরনাথ গুহার গঠন দেখিলাম। গুহার সমাপনী শ্রীলেপ অতুলনীয় সুন্দর। গুহার মেঝে এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো নয়, বেশ সমান মসৃণ। ছাদ বা তিন দিকের দেওয়াল সম্বন্ধেও একই কথা। সমান মসৃণ। দরজার বা গুহা মুখের কিংবা বেদীগুলির গঠন দেখিয়া যদি মানিয়া লইতে হয় এ গুলিও প্রাকৃতিক তবে ভক্তির যে প্রাবল্য বা জোর দরকার, স্বীকার করিতেছি, আমার কিছু ঘাট্‌তি আছে।

৩০০০ হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ শুনিয়া আসিতেছে অমরনাথ গুহা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক গুহা, আর আজ আমার মনে চিন্তা আসিল, "গুহাটি হয়ত মনুষ্যসৃষ্ট। চিন্তার মৌলিকত্ব দাবী করিতেছি। এ চিন্তা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই চম্‌কাইয়া ছিলাম ইহা ও সত্য। আমার বিশ্বাস গুহাটি প্রাকৃতিক নয়, আর গুহাটি যদি প্রকৃতি সৃষ্ট হয় ও তবু ইহা সত্য গুহায় পরবর্তী-কালে মানুষের হাত ভালভাবে লাগিয়াছিল, না হইলে সমাপনী শ্রীলেপ বা ফিনিসিং টাচ্‌, কখনও এত সুন্দর হইতে পারে না।

প্রায় ঘণ্টা খানেক গুহায় কাটাইয়া একই সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিলাম। পর্বতের পাদদেশে কয়েকটি চা-এর দোকান। সব দোকানী মুসলমান। দোকানের চেহারা দেখিয়া বুঝা যায় কেহই যাত্রী চলাচল কালীন দুইমাসব্যাপী দোকান চালাইবে এরূপ প্রস্তুতি লইয়া দোকান খোলে নাই। মনে হইল দু-একদিনের জন্য দোকান খুলিয়াছে। দোকানের বেঞ্চে বসিলাম। দুদিকে পায়ার বদলে পাথর, পাথরের উপর কাঠের তক্তা, তাহাই বেঞ্চ। চারিদিকে ছড়ানো বড় বড় পাথর। পাহাড়ের উপর অংশ বেশ সমতল। পাথরে উঠিয়া অনায়াসে চার পাঁচজন বসিয়া খাওয়া যায়। ডাইনিং টেবিল হিসাবে

ব্যবহার করা যায়। হয়তো স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতা এরূপ কোন পাথরে বসিয়া তুষার লিঙ্গ দর্শনের পর ভোজন সমাধা করিয়াছিলেন। ঐ পাথরের ডাইনিং টেবিলে বসিয়া খাইতে হইলে যথেষ্ট মেহনত করিয়া টেবিলের উপর উঠিতে হইবে। আমি দোকানীর বেঞ্চে বসিলাম। মনে মনে চিন্তা করিলাম, বিবেকানন্দের কালে এরূপ দোকান থাকিলে হয়ত স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাসহ আমারই মত পাথরের উপর বিছানো কাঠের নড়বড়ে তক্তায় বসিয়া চা খাইতেন। স্বর্গীয় পরিবেশে এরূপ চিন্তায় মনে যে কিরূপ শক্তি দেন তাহা ভাষায় বর্ণনা করার নয় শুধুমাত্র অনুভব করার বিষয়।

আমি যে তক্তায় বসিয়া ছিলাম, সে তক্তায় পূর্ব হইতে বসা এক সন্ন্যাসী চা পান করিতেছিলেন। গেরুয়াধারী অল্পবয়স চেহারায় কথাবার্তায় আভিজাত্যের চাপ। দোকানীকে বলিতেছেন এত মিষ্টি দেওয়ার বা এত বেশী পাতা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। লিকার আরও পাতলা, মিষ্টি আরও কম। মুসলমান দোকানী কি বিনম্র ভাবে সন্ন্যাসীর প্রত্যেকটি কথা গুরুত্বসহ শুনিতেছে। দেখিলে মনে হয় যেন সন্ন্যাসী মালিক, আর দোকানী যেন সদ্য বয়-এর চাকুরীতে ঢুকিয়াছে।

চা-এর দোকানে অমরনাথের ফটো, ফটোর বই, গাইড্ বুক, পুতির মালা ইত্যাদি হরেক রকম জিনিষ। দোকানের সংখ্যা সর্ব মোট তিনটি। তাছাড়া আর ও সুন্দর দোকান জাতীয় কিছু, যার নামকরণ এখনও হয় নাই—এখানে আছে।

অমরনাথ হইতে পাথর আনার জন্য এক বন্ধু অনুরোধ করিয়াছিলেন। দেখিলাম, এক কোপীনধারী সাধু কিছু ছোট ছোট সাদরং-এর পাথর সম্মুখে ভাঁজ করা কম্বলে বিছাইয়া বসিয়া আছেন। দোকানের নিকটে অতএব দোকানই তো। সাধুকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম এখানকার বিশেষ এক শ্রেণীর পাথর। শিবলিঙ্গ হিসাবে পূজিত হয়। শালগ্রাম শীলার মতই পবিত্র শীলা। আমি কয়েকটি পাথর হাতে লইয়া কত দিতে হইবে জানিতে চাই।

: তোমার যত ইচ্ছা লয়, কোন দাম নাই। তোমার ইচ্ছা হইলে যে কোন পয়সা দাও।

চা পানের সময় হইতেই ঘোড়াওয়ালা ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে। মুখ ফুটিয়া বলিতেছে না সত্য, তবে বুঝাইতে চাহিতেছে, আর দেরী করা কোন অবস্থাতেই ঠিক হইবে না, যত তাড়াতাড়ি শেষনাগে পৌছিতে পারি ততই মঙ্গল।

পর্বতের পাদদেশে হইতে দুই হাত জোড় করিয়া অমরনাথ গুহাকে প্রণাম করিয়া ঘোড়ায় উঠিলাম। এবার আমার বাঁ দিকে হেলিপ্যাড, হেলিপ্যাড্-এর পর সেই সন্ন্যাসীর ভাণ্ডারা। প্রায় ২৫/৩০ জন যাত্রী, ঘোড়াওয়ালা, সাধু, একজন হিপি বা আমেরিকার পক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেছে। সাধুর আস্তানার ভিতর হইতে এক সাধু আমার মত প্রত্যেক যাত্রীতে যন্ত্রচালিতভাবে একই অনুরোধ একই স্বরে কহিয়া যাইতেছেন।

: বাবা কা ভাণ্ডারা চল রাহি হ্যায়, পরসাদ্ চলতে যানা।

ঘোড়ার উপর হইতেই সাধুবাবাকে একহাতে নমস্কার করিয়া আগাইয়া গেলাম। আবার সেই বিখ্যাত দেড় মাইল ব্যাপী গ্লেসীয়ার বা বরফের চাঁই। বরফের চাঁই। বরফের চাঁই-এর পর ফেরাযাত্রীর প্রথম পর্বত চূড়া বা 'গুহাভিমুখী যাত্রীর শেষ পর্বত চূড়ায় আসিতাম। এখান হইতেই ডানদিকে বানতালের পথ নামিয়া গিয়াছে, এখান হইতেই গুহাভিমুখী যাত্রী প্রথম অমরনাথ গুহামুখ দেখেন, এ স্থানই গুহা হইতে প্রত্যাবর্তনকারীর গুহামুখ দর্শনের শেষ সুযোগ। এখানে আসিয়া আমি ঘোড়ার উপর হইতেই ঘাড় ফিরাইয়া গুহামুখ দেখিতে দেখিতে তুষার লিঙ্গের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিলাম।

প্রায় সোয়া তিনটায় পঞ্চতরণীতে আসিলাম। এখানে দুপুরের খাওয়া রুটি ডাল দিয়া কোনরূপে শেষ করিয়া বেশী দেরী করি নাই। আবার আমার ঘোড়ায় উঠিলাম। ছড়াগুলি অতিক্রম করিলাম। ছড়াগুলি ভৈরব পাহাড় হইতে সৃষ্ট হইয়া পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। ছয় সাতটি ছড়া। যে কারণে এ স্থানের নাম পঞ্চতরণী। গুহাযাত্রা পথে স্বামী বিবেকানন্দ এখানকার প্রত্যেকটি ছড়াতে স্নান করিয়াছিলেন। গুহা হইতে প্রত্যাবর্তন কালে স্বামীজী আবার প্রত্যেক ছড়াতে স্নান করিয়াছিলেন কিনা জানি না। ভগিনী নিবেদিতাও কিছু উল্লেখ করেন নাই।

মনের কি বিচিত্র গতি ? কোন সময় যে কিসের উপর চিন্তা আরম্ভ হয় তার কোন ঠিক ঠিকানা নাই, অন্ততঃ আমার চিন্তায় আসিল কবে কার শোনা, এবং জীবনে একবারই শোনা একটি উপদেশ "মৃতদেহ লইয়া অযথা দেরী করিতে নাই। কোন সময় কোথা দিয়া কি বিপত্তি আসে কে বলিতে পারে ? শাস্ত্রানুগ সময় অন্তে যথাসম্ভব দ্রুত মৃতদেহ সৎকার করা বিধি।"

আমার জীবনে একবার শোনা সেদিনের সে উপদেশ এখন বারে বারে মনে পড়িতেছে। মনে মনে বলিতেছি। "ঠিক যথার্থ। অযথা মৃতদেহ লইয়া দেরী করা যতখানি অনুচিৎ হইবে অমরনাথ দর্শন শেষে শেষনাগের পথে অযথা দেরী করা। পথে ঝড়, বৃষ্টি, তুষার পাত, তুষার ঝড় আসিতে পারে। আমি অসুস্থ হইতে পারি, ঘোড়া বিগড়াইতে পারে। পথে যত দেরী হইবে, এ সমস্ত বিপত্তির সম্ভাবনা ও তত বেশী থাকিবে। মৃতদেহ দ্রুত সৎকারে যতখানি আন্তরিকতার সহিত দ্রুত শেষনাগে পৌঁছি।"

মহাগুনাশের পাদদেশে আছি। এখন দু-চারজন গুহাযাত্রীর সাক্ষাৎ মিলিতেছে। তাঁহারা দু-চারজন গুহাযাত্রীর সাক্ষাৎ মিলিতেছে। তাঁহারা আজ রাত্রে পঞ্চতরণীতে থাকিয়া কাল ভোরে গুহার উদ্দেশ্যে পঞ্চতরণী হইতে রওয়ানা হইবে। গুহামুখী যাত্রী পাইলেই হইল। ঘোড়ার দোলানীর সঙ্গে সঙ্গে শরীর দোলাইতে দোলাইতে ডান হাত একটু উপরে তুলিয়া, প্রবল উৎসাহে সজোরে চিৎকার করিতেছি।" "জয় অমরনাথ"।

আহা ! বেচারারা, মহাগুনাশ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। শরীরে আর শক্তির ছিটেফোঁটাও নাই। তবু তাঁহারা, আমার "জয় অমরনাথের উত্তরে, ক্ষীণকণ্ঠে বলিতেছেন, "জয় অমরনাথ"।

কাহাকেও বলিতেছি, "পঞ্চতরণী বহুৎ নজদিক," কাহাকেও বা, "আপ, আ চুকে হ্যায়"। এরকম প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বলিতেছি, তবে আমার "জয় অমরনাথ" ঠিক আছে, সর্বপ্রথম ডানহাত একটু উঠাইয়া, "জয় অমরনাথ"।

আমি যেমন "জয় অমরনাথ" বলিতেছি, যেমনি পাল্লা দিয়া আমার ঘোড়াওয়ালা, প্রয়োজনে বা প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া সমানে "প্র, ক্র, ক্র, হোস্" করিতে করিতে পথ চলিতেছে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ঘোড়ার ওপর ঘুমাইতে পারিতেন—"বাল্যকালে পাঠ্য বই-এ পড়িয়াছিলাম। তখন একরকম বুঝিয়াছিলাম। বীর বলিতে বীর, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বীর না হইলে "ঘোড়ার উপর ঘুমানোর ন্যায় দুরূহ কাজ অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু এখন কি দেখিতেছি। কোন কোন সময় আমার চোখ ছোট হইয়া আসিতেছে। জোর করিয়া যেন নিজেকে জাগরিত রাখিতেছি।

দুই ঘোড়ায় দুই বৃদ্ধা, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, পথশ্রমে ক্লান্তিতে ঘোড়ার উপর একদম ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। এ পথে সর্বত্র ঘোড়া হাঁটিয়া চলে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে ঘোড়াওয়ালা। কিন্তু এই ঘুমন্ত বৃদ্ধা সওয়ারী লইয়া বিব্রত ঘোড়াওয়ালা, ঘোড়াসহ দৌড়াইতেছে, দৌড়ানোর কারণে ঝাঁকুনি বেশী হইবে, তাহাতে বৃদ্ধার চোখ হইতে ঘুম দুর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। দৌড়ানো অবস্থায় ঘোড়াওয়ালার যদি ঘোড়ার ডানদিকে থাকিয়া বৃদ্ধার ডানবাহু ধরিয়া রাখে, তবে বৃদ্ধা বাঁ-দিকে কাত হইয়া যাইতেছেন, আবার ঘোড়া দাঁড় করাইয়া, বৃদ্ধাকে ধরা অবস্থায় ঘোড়াওয়ালা বাঁদিকে গিয়া বৃদ্ধার বাঁ-বাহু ধরিতেছে ও ঘোড়াসহ দৌড়াইতেছে। বৃদ্ধাকে জাগাইয়া রাখার জন্য ঘোড়াওয়ালার সে কি আকুতি। মুখে বলিতেছে—

: মাতাজী, এ-যে মাতাজি, মাতাজি, এ যে মাতাজি ।

কখনও কখনও শিশুকে দুধ খাওয়াইতে গিয়া মা যেরূপ অসুবিধায় পরেন, বেচারা ঘোড়াওয়ালারা সেরূপ অসুবিধায় পড়িয়াছে। শিশু দুধের বোতলে দু-তিন টান দিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মা মুখে বিচিত্র শব্দ করিতে করিতে শিশুটির হাতে, পায়ে, গালে টোকা দিয়া শিশুকে জাগাইতেছে, শ্রীমান আবার দু-এক টান দিয়া নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় ঘুমাইতেছে। এরূপ অবস্থায় মা যতখানি বিব্রত হন তার চেয়েও বেশী বিব্রত এখন ঘোড়াওয়ালারা।

আমার ঘোড়াওয়ালা অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত ঐ দুই ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে আলাপ করিল। কিন্তু আমার ঘোড়াওয়ালার ব্যবস্থাপত্র শুনিয়া যারপরনাই অবাক হইলাম, আৎকাইয়া উঠিলাম। এখন নাকি ঝড়, বৃষ্টি, তুষার-পাত,

তুষার-ঝড় এর যে কোন একটি আসিলেই আর চিন্তা'র কিছু থাকিবে না। শেষনাগ পর্যন্ত তাঁহারা অর্থাৎ ঐ দুই বৃদ্ধা আর ঘুমাইবে না।

: "মাতাজি, এ-যে মাতাজি, মাতাজি, এ-যে মাতাজি!" করিতে করিতে দুই ঘোড়াওয়ালা তাদের ঘুমন্ত সওয়ারী সহ আমাদিগকে পিছনে ফেলিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে অনেক আগাইয়া গেল।

আমরা স্বাভাবিক গতিতে চলিতেছি। মহাগুনাশের চড়াই আরম্ভ হইয়াছে। মৃদু তুগার-ঝড়ে পড়িলাম। পুলিশী মৃদু নয়। বিশজনের বে-আইনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিতে নিরীহ পথচারী ও সাংবাদিক সহ পঁচিশজনকে আহত করার পরও পুলিশ দাবী করে—মৃদু লাঠি-চালনার ফল। তুষার ঝড় সেরূপ কোন পুলিশী মৃদু নয়, যথার্থই মৃদু। বড় জোর পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। বাতাসের বেগও মারাত্মক রকমের বেশী ছিল না। ঘোড়াওয়ালা বুঝিয়াছিল স্বল্প সময়ের জন্য সাধারণ তুষার ঝড়। হয়ত ঘোড়াটিও বুঝিয়া থাকিবে, ঘোড়াওয়ালা আমাকে ঘোড়া হইতে নামিতে বলে নাই, তুষার-ঝড়ের সময় আমি ঘোড়ার উপরই ছিলাম। ঘোড়াটিকে দাঁড় করানো হইয়াছিল। কিন্তু আমার অন্তর-আত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। আমি দুই হাতে ঘোড়ার ঘাড় বেষ্টন করিয়া উপুড় হইয়া ঘোড়ার পিঠে পড়িয়া আছি। উহ্‌হু পাঁচ মিনিট যে এত দীর্ঘ সময় কে জানিত? তুষার-ঝড়ে না পড়িলে জীবনেও জানিতে পারিতাম না। তুষার ঝড়ের পর সে কি ঠাণ্ডা বাতাস! গায়ে, বিশেষত, ওয়াটার-প্রুফ্‌ জ্যাকেটের দুই হাতার ভাঁজে ভাঁজের জল আমার চক্ষের উপর দেখিতে দেখিতে জমিয়া বরফ হইয়া গেল। আর সেই যে বরফ হইল, প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর শেষনাগে ঘোড়া হইতে নামিয়া, হাত সোজা করিয়া, জ্যাকেটের হাতায় টোকা দিয়া বরফ সরাই।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শেষনাগে চরণ সিং-এর হোটেলের সম্মুখে আসিয়া ঘোড়া হইতে নামি। গা ঝাড়িয়া বরফ পরিষ্কার করারও যেন আর তর সহিতে ছিল না। কত তাড়াতাড়ি চুলার নিকট বসিতে পারি তারই চেষ্টা।

চুলার নিকট দু-রকমের যাত্রী আছেন। প্রথম দলে গুহাভিমুখী আর দ্বিতীয় দলে গুহা হইতে বা দর্শন শেষে প্রত্যাবর্তনকারী যাত্রী।

এখানে শুধু এখানে কেন, এ রাস্তায় সর্বত্র পাহালগামী, চন্দনবাড়ী, শেষনাগ, পঞ্চতরণী সর্বত্র। প্রথম দল দ্বিতীয় দলকে মর্যাদা দেয় সুযোগ পাইলে সেবা যত্ন করে। ঠিক চুলার মুখ বরাবর স্থানটি আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আমি ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। চরণ সিং চা দিল। একটু একটু করিয়া চাঙ্গা হইতেছি, যেন একটু একটু করিয়া প্রাণশক্তি ফিরিয়া আসিতেছে, আর আমি প্রথমে মাথা হইতে মাঙ্কির ক্যাপ খুলিয়া আমার পার্শ্বে চুলার নিকটে বসা একজনের হাতে দিলাম। কিছু বলিতে হয় নাই। তিনি মাঙ্কি ক্যাপের ভাঁজ খুলিয়া আগুনে ধরিয়া ভিজা ক্যাপটি শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর একটু চাঙ্গা হওয়ার পর অন্য আর একজনকে মাফলারটি দিলাম। তিনিও প্রথম ব্যক্তির ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে এবং কোনরূপ নির্দেশের অপেক্ষা না করিয়াই মাফলারটির যথাসম্ভব ভাঁজ খুলিয়া আগুনে শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। জুতো জোড়া খুলিয়া চুলার নিকটে এরূপভাবে রাখিলাম যেন আগুনের তাপ পায়। মোজাগুলিকেও জুতার সঙ্গেই রাখিয়াছিলাম। এক বয়স্কা মোটাসোটা ভদ্রমহিলা, "থাক থাক, ওখানেই শুকাইবে," বলা সত্ত্বেও—বাবার দর্শনপ্রাপ্ত মহা পুণ্যবানের সেবার সুযোগ হেলায় নষ্ট করেন নাই। দুই হাতে দুইটি মোজা লইয়া আগুনে শুকাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, মহিলা গুহাভিমুখী যাত্রী ছিলেন। এতক্ষণে অনেকখানি চাঙ্গা হইয়াছি, অন্যের সাথে কথা-বার্তা শুরু করিয়াছি। জ্যাকেটটি খুলিয়া ভিতরের লাইনিং-এর ভিজা কাপড় শুকাইতেছি।

মাফলার শুকনো হইয়া গিয়াছে। গলায় জড়াইলাম। চরণ সিং-এর এই রাগার তাঁবুতেই আমার বিছানা ছিল। সেখান হইতে একটি করিয়া গরম করিলাম। তারপর গরম কম্বলটি গায়ে সন্ন্যাসীদের কায়দায় বহির্বাস ও চাদরের ন্যায় পরিলাম। এবার প্যান্ট খুলিয়া প্রথমে পায়ের দিকে ভাঁজ খুলি, তারপর প্যান্ট আগুনে শুকাই। এর মধ্যে মোজা জোড়া শুকনো হইয়া গিয়াছে। ভদ্রমহিলার হাত হইতে মোজা লইয়া তাহাকে গা হইতে খুলিয়া সোয়েটারটি দিলাম। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। কিছু না বলা সত্ত্বেও ভদ্রমহিলার বুঝতে কোন অসুবিধা হয় নাই।

এখানে এক মহিলার সঙ্গে পরিচয় হইল। সঙ্গে বার চৌদ্দ বছরের দুই ছেলে ও বৃদ্ধা শাশুড়ী। মহিলা বাঙ্গালী। নিজেই পরিচয় দিল, বাড়ী আসানসোলে, স্বামীর ঘর ধানবাদে—তাহারা অবাঙ্গালী, হিন্দীভাষী। বৃদ্ধা শাশুড়ী বা ছেলে দুইটি বাংলা বুঝিতে পারে, তবে বলিতে পারে না। তাহারা গত রাত পঞ্চতরণীতে কাটাইয়া আজ সকালে তুষার লিঙ্গ দর্শন করিয়া দুপুরে এখানে আসিয়াছে। আমার পিছনে কম্বল বিছাইয়া তাহারা বসিয়াছিল। গায়ে শেষনাগের উপযুক্ত পোষাক, প্রত্যেকের মাথায় মাংকি ক্যাপ ভাঁজ করা অবস্থায় নয়, সম্পূর্ণ খোলা কান, গলা সম্পূর্ণ ঢাকা। দেখার মধ্যে মাত্র তাহাদের চোখ, নাক, ও মুখ নিচের ঠোঁট পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। তাহারা যেখানে বসিয়াছিল সেখানে যথেষ্ট আলোও ছিল না। এখন বিরূপ পোষাকে, বিরূপ আলোয় কাহারও সাথে কিছুক্ষণ আলাপের সূত্রে যদি সাতদিন পর স্বাভাবিক পোষাকে অর্থাৎ শাড়ী ব্লাউজ পরিহিতা অবস্থায় একবার দেখিয়াই মহিলাকে চিনিতে না পারি তবে নিজেকে কোন দোষ দিতে পারি না। কিন্তু ঘটনাটি ঐরূপই ঘটিয়াছিল।

শ্রীনগরে চসমাসাহী দেখিয়া নিচে আসিয়াছি। এক মহিলা হাসিয়া, যেন কতদিনের পরিচয়, এরূপ স্বরে আলাপ আরম্ভ করিল। আলাপ করিতেছি ঠিকই কিংবা বলা যায় আলাপের ঠেকা দিয়া চলিয়াছি, মনে মনে তোলপাড় করিতেছি মহিলাটি কে? কোথায় দেখিয়াছি? কোথায় আলাপ? আগরতলায় নয়ত? বেশীক্ষণ ওস্তাদি করা সম্ভব হয় নাই, মহিলার নিকট ধরা পড়িয়া গেলাম। আমি মহিলাকে চিনিতেছি না। ধোয়াটে কথার জাল বিস্তার করিয়া চলিয়াছে—এরূপ ভান করিতেছি মাত্র, দেখিলাম আমার উপর মহিলার প্রচণ্ড অভিমান।

দাদা সব ভুলে গেলেন?

এমন সময় ছোট ছেলেটি হিন্দীতে মাকে কি যেন বলিল। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু মনে পড়িল, আসানসোলের বাঙ্গালী মেয়ে ধানবাদে শ্বশুড়বাড়ী, "তাঁহারা অবাঙ্গালী"।

কি বলছেন? ভুলে যাব? 'আপনার সাথে সেদিন মাত্র শেষনাগে কত আলাপ করলাম আর আজ এর মধ্যে ভুলে যাব?

ভদ্রমহিলা সত্যি সত্যি আনন্দিত হইলেন। এই হিমালয়ের তীর্থপথ। এই হিমালয়ের তীর্থপথের মহিমা। আধঘণ্টার আলাপে ও কাহারও উপর অভিমান করার মত জোর আসে।

অঃ অঃ কাঃ—১০

কম্বলের ন্যায় কায চাদর পরিয়া খাওয়া সারিলাম। চরণসিং জানাইল, অন্য তাঁবুতে খাটিয়ার উপর আমার লেপ তোষক দেওয়া হইয়াছে। শরীর ও যথেষ্ট পরিশ্রান্ত। বেকার কথা না বানাইয়া এখন আমার শোওয়া কর্তব্য।

আমার কিযে হইয়াছে। এখানে আসার পর প্রথমে মনে হইয়াছিল, আজ আর খাওয়া দাওয়া করারও শক্তি পাইব না। কোনরূপে চোখ বুজিয়া রাত কাটাইয়া দিই। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর মনে হইয়াছিল, খাওয়া দাওয়ার পর অতিরিক্ত পরিশ্রমে এক মিনিটও থাকিতে পারিব না। চক্ষু আপনা হইতেই বুজিয়া আসিবে। আর এখন কোথায় চোখের ঘুম। আমার ভিতরে যেন একটা আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, একটা অদ্ভুৎ সন্তোষী, একটা অব্যক্ত তৃপ্তি। আমি কথা বলিতেছি না, কথা যেন আমার মুখ হইতে আপনা আপনি বাহির হইতেছে। রাত প্রায় ১০ টায় চরণ সিং এর দ্বিতীয় তাঁবুতে নিজের খাটিয়ায় গেলাম। চুলার নিকট হইতে বাহিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডার প্রচণ্ড প্রকোপ বুঝিতে হইল। ভাড়াকরা তোষকের উপর ওয়ারসহ কম্বল মধ্যে আমি, আমার গায়ে আর একটি ওয়ার সহ কম্বল কম্বলের উপর ভাড়াকরা লেপ। শরীরে ফুল সাইস্ উলের মোজা, পেন্ট, গেঞ্জি, জামা, সোয়েটার, জ্যাকেট, মাফলার, ম্যাঙ্কি ক্যাপ, হাতে মোজা।

লেপের নিচে যাওয়ার পর বোধ হইল, লেপ তোষকটি এইমাত্র জলে চুবাইয়া আনা হইয়াছে। কি মারাত্মক ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডায় প্রথমে হাত-পা ক্রমে সর্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। বাপ্ রে! বাপ! এ ঠাণ্ডায় থাকা অসম্ভব। কারণটা কি ?

তাঁবুতে আরও কয়েকজন যাত্রী ছিল। তাহারা লেপের নীচে মাথা নিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। ঠাণ্ডায় থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিলাম। ওঃ হরি। আমার মাথা বরাবর তাঁবুর পর্দা অনেক খানি ফাঁক হইয়া রহিয়াছে। হয়ত তাঁবুতে আসার সময় আমার অসাবধানে এরূপ হইয়া থাকিবে।

এরূপ পরিস্থিতিতে পূব পর্বতের্ চূড়ায় ও পূব আকাশে যে দৃশ্য রচিত হইতে দেখিলাম তাহার পরিণতি দেখার জন্যে যদি ঠাণ্ডার জমিতে হয় আমি ঠাণ্ডার জমার সম্পূর্ণ ঝুঁকি লইয়া ও যতখানি সম্ভব দৃশ্যটি উপভোগ করিব স্থির করিলাম।

শুক্লা নবমী সন্ধ্যার সময়ই আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। পূর্ব দিকের পর্বতের অস্তিত্বের জন্য আমার স্থান হইতে এর আগে চাঁদ দৃশ্য ছিল না। তদুপরি সন্ধ্যার পর হইতে এতক্ষণ পর্যন্ত হয় বৃষ্টি, না হয় ঘন কুয়াশা বা মেঘে আবৃত

আকাশ একটা না একটা অসুবিধা ছিল যার জন্যে এখন শুক্লপক্ষ না কৃষ্ণপক্ষ কিছুই বুঝার উপায় ছিল না।

আর এখন তাঁবু হইতে যতখানি আকাশ দেখা যায়, দেখিলাম আকাশ পরিষ্কার, একদম পরিষ্কার। প্লেনোটারিয়াম বা তারা মণ্ডলের কৃত্রিম আকাশের মত মেঘমুক্ত আকাশ। সমস্ত আকাশে তারার মালা। তারাগুলিও যেন আর ও বড়, আর ও উজ্জ্বল। একমাত্র ভিতর হিমালয়েই এরূপ আকাশের সাক্ষাৎ মেলে।

পূর্বের পর্বতের মাথা সাদা বরফে আবৃত। বরফের ঘনত্ব বা গাঢ়ত্ব মধ্য অংশে অনেক কম। উপরের বরফ যেন স্বচ্ছ, চাঁদ উঠিতেছে, বরফের মধ্য দিয়া আবছা বুঝা যায়। জ্যোৎস্নার রশ্মি যে আলো ছড়াইতেছে তাহাকেই কাব্যের ভাষায় আলোর বন্যা বলে চাঁদের শতকরা 'দশভাগ পনেরো ভাগ দেখা যাইতেছে, জ্যোৎস্নায় পর্বতচূড়ার আকাশের একরূপ, চাঁদের চার আনি পরিমাণ যখন দেখা গেল তখন আবার জ্যোৎস্নায় পর্বত চূড়ার, আকাশের অন্যরূপ। চাঁদের আটআনি পরিমাণ, বার আনি পরিমান দেখা দেওয়ার পর অন্যরূপ। ষোল আনি চাঁদটি দৃষ্টিপথে আসার পর এগুলির আবার অন্যরূপ।

ঐ নৈসর্গিক দৃশ্য ভাষায় বর্ণনার বিষয়বস্তু নয়। মনে হয় ভগবানের দান মানুষের অমূল্য সম্পদ চক্ষু দুইটি ও বিরাট ব্যাপক সৌন্দর্য্যের এক অতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র গ্রহণ করিতে সক্ষম। গ্রহণ নিবৃত্ত কালে যেমন চাঁদের একটি অংশ খোলা ও বাকী অংশ ছায়ায় ঢাকা থাকে। খোলা অংশটি যত বড় হইতে থাকে ছায়াযুক্ত বা রাহুগ্রস্থ অংশটির ঠিক ততখানি অংশই প্রত্যক্ষভাবে কমিতে থাকে। এখানেও চাঁদের এক অংশ দেখা যাইতেছিল। বাকী অংশ পর্বত চূড়ার তুলনামূলক পাতলা বরফের মধ্যদিয়া গ্রহণ নিবৃত কালের রাহুগ্রস্থ চাঁদের অংশের ন্যায় দৃষ্টি পথে আসিয়াছিল।

আমরা সম্পূর্ণ বা গোল চাঁদের গ্রহণ দেখিয়া অভ্যস্থ। আমি নবমী-চাঁদের গ্রহণ নিবৃত দৃশ্য দেখিলাম।

চাঁদ তখনও আমার দৃষ্টিপথের বাহিরে যায় নাই, আমি স্বর্গীয় দৃশ্য উপভোগ করিতেছি। কোন সময় যেন নিজের অজ্ঞাতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সপ্তম অধ্যায়

আজ ২০ শে আগষ্ট, বুধবার। ঘুম ভাঙ্গার পর বিছানায় শোওয়া অবস্থায় আমি। নিজেকে বেশ হালকা বোধ হইতেছে। আজ আর কোন কিছুর জন্য তাড়া নাই। বেশ গদাই লস্কর চালে প্রাতকৃত্যের পর চরণ সিং এর মূল তাঁবুতে আসিলাম। আজ যাঁহারা পঞ্চতরনীর উদ্দেশ্যে রওয়না হইতেছেন তাঁহাদের কেহ কেহ, আমি পথ অভিজ্ঞ দেখিয়া আমার সহিত পথ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, আমার উপদেশ নিতেছেন। এরূপ পরিস্থিতিতে হাতে গরম চা এর গ্লাস লইয়া, তাহাতে মৃদু মৃদু চুমুক দিতে দিতে উপদেশ দিতে বেশ লাগিতেছিল। উপদেশ দেওয়ার ন্যূনতম সুযোগ ও মনের আনন্দে পূর্ণ সদ্-ব্যবহার করিয়া ছাড়িতে ছিলাম।

সকাল আট-টা নাগাদ চন্দনবাড়ীর পথে হাটা আরম্ভ করি, সকালে ডাক্তার বাবু পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তাঁহারা অন্য তাঁবুতে ছিলেন। আমার অনেক আগেই তাঁহারা হাঁটা শুরু করিয়াছেন।

আবার শেষনাগ হ্রদের মাঝ বরাবর রাস্তায় দাঁড়াইলাম। নির্মল আকাশ, আকাশে সূর্য, জলের রং নীল। পাঁচমাথাওয়ালা সাপ দেখার জন্য কিংবা বলা যায় শেষনাগ দর্শনের জন্য সেই ইউরোপীয়ানের ভাষায় হাতীর মত বা ঘোড়ার মত নয় সাপের আকৃতি একটা কিছু দেখার জন্য অধীর আগ্রহে প্রায় আধ ঘন্টা ঠায় একজায়গায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। গুহায় মনোভাবের মত 'জীবনে আর এখানে আসা হয় কিনা কে জানে'? গোছের কোন মনোভাবে আক্রান্ত হই নাই। চরণ সিং দৃঢ় বিশ্বাসের কথা মনে পড়িল, যদি কেহ যাত্রী চলাচল কালে দুইমাস এখানে থাকে তবে সে অবশ্যই শেষ নাগ দর্শন পাইবে। দেখা যাক, আবার না হয় দুইমাস এখানেই থাকিব। এ জীবনেই শেষনাগ সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত করিতে হইবে, চিন্তা করিয়া শেষনাগ দর্শন না পাওয়ার ক্ষোভ দমন করিলাম।

শূন্যমনে শেষনাগ হইতে আবার চলিতে শুরু করি। সাড়ে দশটা নাগাদ যশপাল এখানে চা, বিস্কিট ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম, আবার চলা শুরু। এবার পিশু ঘাঁটির উৎরাই; পিশুঘাঁটির উৎরাই পথে ডাক্তারবাবু পণ্ডিতজীকে অতিক্রম করি, রৌদ্রের তাপ বাড়িতেছে, গরম বোধ হইতেছে। যশপালে পৌঁছার আগেই আমার নিজস্ব কায়দায় বানানো প্লাষ্টিক সীটের ওয়াটার প্রুফ সাইড

ব্যাগে রাখি। শিভর্যাটির উৎরাই নামিতে নামিতে হাতের দস্তানা, মাফলার র‍্যাকস্যাক ব্যাগে ভরিলাম। পর্বতের পাদদেশে বসার অনুকূল গঠন দেখিয়া একটি গাছের গুড়িতে ছায়ায় বসিলাম। উদ্দেশ্য খানিকটা বিশ্রাম ও ডাক্তার-বাবু পণ্ডিতজী আসিলে একসঙ্গে হাঁটা।

পণ্ডিতজী আসিয়া বলিলেন "এতক্ষণে একটি গাছ মিলিল যার নিচে বসা যায়। সত্যি এখানে "সরল বৃক্ষের বন", প্রত্যেক গাছ এত বেশী সরল যে তার নিচে বসিলে গাছের গাছের নিচে বসার সুবিধা পাওয়া যায় না। রৌদ্রে বট-গাছের নিচে আর তাল গাছের নিচে বসার যে ফরাক। অন্যত্র গাছের নিচে বসা আর এখানকার সরল গাছের নিচে বসার সে ফারাক।

আমি পথের পাসে যে গাছটার নিচে বসিয়াছি, তার গঠন বিশেষতঃ মাটি-সংলগ্ন অংশে বসার উপাযাগী। পণ্ডিতজী একটি সুন্দর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন, এখন চন্দন বাড়ী একদম নাগালের মধ্যে, আমরা একসঙ্গে আবার হাঁটা আরম্ভ করি। এবার জ্যাকেটটি খুলিয়া ব্যাগে রাখিলাম। গায়ে জামার উপর শুধু মাত্র সোয়েটার। বেশ গরম বোধ হইতেছে। সেই বিখ্যাত বরফের সেতুর উপর হাঁটিতেছি। গুনিয়া গুনিয়া ৬৫টি সিড়ি ভাঙ্গিয়া সেতুটির নিচে মাটির বা পাথরের রাস্তায় আসিলাম। এখন বরফের উপর ও শুধু সোয়েটারে স্বচ্ছন্দে হাঁটিলাম। ঠাণ্ডার লেশমাত্র বোধ হয় নাই, চন্দনবাড়ী আসিলাম।

কোথা হইতে গোলম মোহম্মদ আসিয়া হাজির।

এ হোটেলে আসুন। বিশ্রাম করার ভাল বন্দোবস্ত।

গোলাম মহম্মদ? তুমি? তুমি কোথা হইতে?

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। গোলাম মহম্মদকে দেখিয়া আমার বিছানার কথা মনে হইল, বিছানা? আমার বিছানা?

শেষনাগে চরণ সিং এর দ্বিতীয় তাঁবুতে খাটিয়ার উপর রহিয়া গিয়াছে। আজ রাত এখানে থাকা। কাল পাহাল গাম। সব বুঝিতেছি, কিন্তু বিছানা ছাড়া কি করিয়া রাত কাটাইব এসম্বন্ধে কিছুই বুঝিতেছি না।

শেষনাগে চা-সহ যখন আসর গরম করিতেছিলাম, উপদেশ দেওয়ার সুন্দরতম সুযোগের পূর্ণ সদব্যবহার করিতেছিলাম। সামান্য বিছানা মনের কোনে উঁকি দেওয়ার কোন সুযোগ পায় নাই। গল্প করিতে করিতে পোষাক—আষাক পরিয়াছিলাম। এক সময় চরণ সিংকে থাকা খাওয়ার পয়সা দিয়া বাঁ কাঁধে ব্যাগ ঝুলাইয়া ও ডান হাতে লাঠি লইয়া চন্দন বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সমস্ত

মন জুড়িয়া ছিল কিম্বা পথে ভাগ্যে থাকিলে শেষনাগ দর্শন হইলেও হইতে পারে।

গোলাম মহম্মদ, আজ যাদের এখান হইতে শেষনাগ যাওয়ার কথা তারা সবাই চলিয়া গিয়াছে, দুপুরের পর ও আর কেহ যাইবে না, না?

কেন? এ প্রশ্ন কেন?

না, শেষ নাগে চরণ সিংকে একটা খবর পাঠাইতাম।

বিছানা? বিছানার জন্য? আমি সব নিয়া আসিয়াছি, তোমার একটা জিনিষ ও রাখিয়া আসি নাই।

গোলাম মহম্মদ চা খাও। এ যে ভাই! দো-চায়ে। গোলাম মহম্মদ আর কি খাইবে বল। আমার ও ক্ষিধা পাইয়াছে।

কতক্ষণ পরে গোলাম মহম্মদ আরও আনন্দের সংবাদ দিল। একটি ট্রাক এখনই আসিবে। মাথা পিছু দশ টাকা। আজই পাহাল গাম যাওয়া যায়। আমরা যে হোটেলে বসিয়া চা খাইতেছি, সেই হোটেলের মালিক সব ঠিক করিয়া দিবে, পরে লক্ষ্য করিয়াছি চা বিক্রীর চেয়ে ও যাত্রী যোগাড়ে যতখানি আগ্রহ তাহাতে একটা জিনিষ পরিষ্কার, যাত্রী পিছু হোটেলে ওয়ালার কমিশন নেহাৎ কম নয়।

আমার ধারণা ছিল, আমাদের হোটেল ওয়ালাই বুঝি ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে তলে তলে বে আইনী যাত্রী বহনের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। ট্রাক আসিলে দেখিলাম প্রত্যেক হোটেল বা চায়ের দোকান হইতেই প্রচুর লোক কাহার আগে কে ট্রাকে উঠিবে তারই প্রতিযোগীতায় মত্ত।

পাঞ্জাব বডি ট্রাক, বডির একদেড় হাত উঁচু স্থানে মাঝে বরাবর একটি বাঁশ বাঁধা আছে। বাঁশের উপর ত্রিপল, দোচালা ঘরের ন্যায় মাথার উপর ত্রিপলের ছাতনী। ট্রাকে আমরা কম করিয়াও সোয়াশ' যাত্রী। মুর্গী বুঝাই বলিলেও লাগ্‌সই শব্দ হইতেছে না।

ট্রাক আসি বটে। রাস্তায় বাঁকের মুখে একবার সামনে একবার পিছনে করিতে করিতে বাঁক পার হইতেছে। বিপদজনক স্থানে অনেকে ভয়ে চক্ষু বুজিয়া থাকিতেছে। গাড়ীর ভিতর নোংরা, হৃদ্দ নোংরা। ধুলায় দম নেওয়া কষ্টকর। একটু মুক্ত বাতাসের জন্য প্রাণ আইঢাই করিতেছে। হাত-পা নাড়ার সুবিধা নাই বলিয়া গা হইতে সোয়েটার খুলিয়া ব্যাগে রাখিতে পারিতেছি না। অসহায় ভাবে গরমে সিদ্ধ হইতেছি। এর মধ্যে কাহারও কাহারও বমি। পাঠকের কল্পনাশক্তির উপর আস্থা থাকায় বমির পরের দৃশ্যের বর্ণনায় আর যাইতেছি না।

ক্রিসলোনের এক মাইল আগে রাস্তায় গাড়ী দাঁড় করাইয়া ড্রাইভার সর্দারজী জানাইল। এখন হাঁটিয়া যাও। যদিও পাহালগাম পর্যন্ত গাড়ীতে পৌঁছানোর কথা, তবু গাড়ী হইতে মুক্তি পাইয়া হাঁটা আরম্ভ করিলাম। ড্রাইভার জানাইল এখন যাওয়ার সময় বড় বড় পুলিশ অফিসার পথে থাকিবে। অতএব সে যাত্রীসহ আর আগানো নিরাপদ মনে করিতেছি না। পুলিশে ধরিলে শুধু তারই নয়। আমাদেরও দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে। কথাটি আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আর সবচেয়ে বড় কথা গাড়ী হইতে মুক্তি পাইয়াছি। ক্রিসলোন হইয়া বিকাল প্রায় ৪টা নাগাদ পাহাল-গামে পৌঁছি।

এ কয় দিনে পাহালগাম যেন অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। পাহালগামের লোক সংখ্যা এখন অনেক বেশী। প্রতি দোকানে খদ্দের বেশী। চা-এর দোকানে কিংবা রাস্তার পাশে হোটেলে বসিয়া খাইতে হইলে দোকানের সামনে অপেক্ষা করিতে হয়। বসার জায়গাগুলি সব সময় লোকে মানে খদ্দেরে ভর্ত্তি থাকে। আজ ফুটপাতে সর্বত্র দোকান, পথে সাবধানে চলাচল করিতে হইতেছে।

পাহালগামে আসিয়া সর্ব প্রথম ক্লোক রুমে আসি। ভীড়, আজ সর্বত্রই ভীড়। ক্লোকরুম হইতে প্রথমেই এখানে রেখে যাওয়া আমার জিনিষপত্র ফিরত লই। যতখানি সম্ভব জামা-কাপড় বদল করা দরকার। আজ বহু লোক মালামাল ক্লোকরুমে জমা রাখিতেছে। আমরা কয়েকজন মাত্র মাল ফিরত লইতেছি। মালসহ বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দেখি। ফুটপাতে গোলাম মহম্মদ বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে—যথেষ্ট পরিশ্রান্ত। পরিশ্রান্ত আমরা সবাই, তবে এ কয়দিনে আজই প্রথম গোলাম মহম্মদকে সত্যিকারের পরিশ্রান্ত দেখি। গরম অসহ্য লাগিতেছে। মালপত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ডাক্তারবাবু তাঁহার গুরুদ্বারাতে উঠিয়াছেন—সেখানে তাঁহাদের নিকট আমার মাল রাখিয়া আসিয়াছে।

"খুব ভাল করেছ। এখন বিশ্রাম করে এগুলিও সেখানে রেখে দিও" বলিয়া তাহাকে সাইড্ ব্যাগ ও ক্লোকরুম হইতে লওয়া মাল দিলাম।

নিকটেই ডাকঘর। ডাকঘরে যাইতেছি। সঙ্গে সাইড্ ব্যাগ নাই, দু-হাত একদম খালি। হাঁটিতে কিরূপ যেন খালি খালি লাগিতেছে। আরে! আমার লাঠি কোথায়? রক্ষিত লাঠিটি চাহিয়াছিল। ইস্, সেই ফিস্লোনের আগে ট্রাক হইতে নামার সময় ভুলবসতঃ লাঠিটি ট্রাকে ফেলিয়া আসিয়াছি।

ডাকঘরেরও প্রচুর লোক এখানে অর্থ্যাৎ পাহালগাম পর্যন্ত মঙ্গল মত পৌঁছিয়াছে। এ খবরটুকু দিয়া প্রিয়জনকে অনেকে টেলিগ্রাম করিতেছেন।

অনেকে চিঠি লিখিতেছেন। প্রায় প্রত্যেকেই একাধিক চিঠি। এত লোকের চিঠি লেখার বহর দেখিয়া আমারও কিরূপ যেন একটা নেশায় পাইয়া বসিল। আমি একে একে ছয়টি চিঠি আগরতলায় লিখি। তারই প্রথমটি শান্তিদায় উদ্দেশ্যে। যে চিঠির উল্লেখ আগে করিয়াছি।

পাহাগগামে পৌঁছার পর ক্লোকরুম ফুটপাতে এবং সবশেষে ডাকঘরে এরই মধ্যে অনেকে আমার পোষাক দেখিয়া, সর্ব শরীরে ধুলা দেখিয়া খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখিয়া বুঝিয়াছে। আমি এই মাত্র অমরনাথ গুহা হইতে ফিরিতেছি। মানুষের শ্রদ্ধা পাইতেছি। বেশ লাগিতেছে।

একটু ভিতরের দিকে খালি দেখিয়া একটি সেলুনে প্রবেশ করি। প্রথমে ভগ্ন হই। মুসলমান নরসুন্দর। খুব আদরের সহিত তীর্থ যাত্রীকে বসাইল। যত্ন ও আন্তরিকতার সহিত মুখ কামাইল। বেসিনের নিকট নিয়া আচ্ছা করিয়া সাবান নিয়া মাথা ধুইয়া দিল। আবার পূর্ব চেয়ারে বসাইয়া মাথা দলাই মালাই করিতে করিতে গল্প করিতেছে। আমি চেয়ারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। এ আন্তরিকতা, এত যত্ন কক্ষনও পয়সায় কেনা যায় না—পয়সার কেনা-বেচার অনেক অনেক উর্দ্ধে এ জিনিষ।

ক্ষৌরকারের সমস্ত কথাই যে আমি মনোযোগের সহিত শুনিয়াছিলাম এমন নয়। সে কি কি বিষয়ের উপর আলাপ করিয়াছিল। আজ তার সবটা মনে নাই। তবে তার একটা কথায় বেশ অবাক হইয়াছিলাম। দেবতার নিকট কি প্রার্থনা করিয়াছিলাম তাহা একান্তই আমার নিজস্ব। এরূপভাবে ব্যক্ত করিলে হয়ত কিছুটা বুঝানো যায়। আমারও দেবতার ব্যক্তিগত ব্যাপার। বেশ খোলা মনে স্বাভাবিক গলায় সে জানিতে চায়—আমি অমরনাথ গুহায় তুষার লিঙ্গের নিকট ভগবান শঙ্করের কাছে কী কী প্রার্থনা জানাইয়াছি।

এখানে এ জিনিষটি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কাহারও সঙ্গে আলোচনায় একটু হৃদ্যতার স্পর্শ লাগিয়াছে মাত্র, তখনই প্রশ্ন, তুমি গুহায় দেবতার নিকট কী কী প্রার্থনা করিয়াছ? মনে আঘাত দেওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না—ব্যঙ্গ করার জন্যও নয়, আবদারের সুরে, শিশুর সরলতায় জানিতে চায়—গুহায় দেবতার নিকট আমি কী কী চাহিয়াছিলাম।

আমি দেবতার নিকট কি চাহিব? আমার যতটুকু খেয়াল আছে আমি বলিয়াছিলাম—হে শঙ্কর এই দশ টাকার সবটা আমার নয়, এর মধ্যে মিঠুর পাঁচ টাকা আছে।

বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া—দাও, দাও, আরও দাও—আমি করি না। বস্তুতঃ

আমার কি চাওয়া উচিত তাহাই জানি না। এক একবার তীর্থযাত্রা বা ভ্রমণে বাহির হওয়ার সময় চিন্তা করি—বিগ্রহের নিকট প্রার্থনা করিব—ঠাকুর, আমার কী চাই আমার কী চাওয়া প্রয়োজন তাহা জানিতে চাই।

একবার যদি নিঃসন্দেহ হই—আমার এই চাই বা চাওয়া প্রয়োজন তবে পরবর্ত্তী কালে কোন বিগ্রহের নিকট প্রার্থনা করিব—ঠাকুর, আমাকে 'ঐ ঐ' জিনিষ বা শক্তি দাও কিন্তু কার্য্যকালে এ সাধারণ কথাটাও আজ পর্যন্ত মনে রাখিতে পারিনাই। আজ পর্যন্ত কোন আনুষ্ঠানিক পূজার পর বলি নাই। "ঠাকুর আমার কী চাই—তাহা জানিতে চাই। বলি নাই—মনে আসে নাই বলিয়া বলি নাই।

বিগ্রহের নিকট বলিয়া—"রূপদাও, জয় দাও, যশ দাও—আমার মনোবৃত্তি অনুসরিণী মনোরমা ভার্য্যা দাও—কিংবা রাজ্য লটারির ফার্ষ্ট—প্রাইজং দেহি" করিতে আমার কোথায় যেন বাধে।

গুহায় প্রার্থনা বিষয়ক কোন প্রশ্ন আমি হাসিয়া পাশ কাটাইয়াছি। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে হাসিয়া পাশ কাটানো সম্ভব হয় নাই। সেদিন জবাব দিয়াছিলাম—মনের মত জবাব।

শ্রীনগরে লাল চকে দাড়ি কামানোর উদ্দেশ্যে এক সেলুনে প্রবেশ করি। দেখি সেলুনে একসঙ্গে দুইজনের কামানোর ব্যবস্থা। কর্মী দুইজন। বড়টি চব্বিশ পঁচিশ, ছোটটি আঠার কুড়ি। অপূর্ব সুন্দর গায়ের রং, চোখ মুখের গড়ন—যথার্থ কাশ্মীরী। কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না—তাহারা দুই ভাই এবং দোকানটির মালিক। বড়টির নিকটে এক খরিদ্দার বসা। খরিদ্দারের দাড়ি কামানোর প্রস্তুতি চলিতেছে। আমি দ্বিতীয় চেয়ারে বসি। ছোটটি আমার পরিচর্য্যা আরম্ভ করিল। নাক দেখিয়াই বলিয়া দিল, "আপনি গুহা হইতে আসিতেছেন?"

আমি হ্যাঁ ব্যঞ্জক মাথা নাড়াইলাম। গালে সাবান মাথার পর ক্ষুরে সমাপনী শ্রীলেপ দিতে দিতে প্রশ্ন করিল—"গুহায় কী কী প্রার্থনা করিয়াছেন?"

একই কথা ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক হয়। সন্দেহ হইতে লাগিল ছেলেটি ব্যঙ্গ করিতেছে না ত?

দেখ হে, গুহায় আমি একটি মাত্র প্রার্থনাই জানাইয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম—হে শঙ্কর, সেলুনে যখন মুখ কামাইতে যাই—তখন ক্ষুরে যেন একটু ধার থাকে। একটু সময় নিলেও খরিদ্দার ভদ্রলোক সর্ব প্রথম কথাটি বুঝিলেন এবং হাত দিয়া গাল হইতে ক্ষৌর কারের ক্ষুর ধরা হাতটি একটু সড়াইয়া উচ্চঃস্বরে হাসি আরম্ভ করিলেন। খরিদ্দারের হাসি বড় ভাইকে কথাটি হজম করিতে সাহায্য করে।

সেও আয়নার নিচে ক্ষুরটি রাখিয়া বেশ প্রস্তুত হইয়া সশব্দে হাসি আরম্ভ করিল। আমি গম্ভীর মুখে একমুখ সাবান সহ চুপচাপ বসা আছি। এবার ছোট ভাইটি হাসি আরম্ভ করিল। সে এক দেখার মত অবস্থা। দোকানে আমরা চারিটি প্রাণী। তিন জন হাসিতেছে। প্রানপন শক্তিতে হাসিতেছে। ছোটটি নিজেকে কিছুতেই ঠিক রাখিতে পারিতেছে না। একবার নিজের মুখ বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিতেছে, একবার বুকে হাত রাখিয়া একটু সম্মুখে ঝুকিয়া হাসিতেছে, হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িতেছে। আবার হাসিতে হাসিতে বাঁ হাঁটুতে বাঁ হাতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে। মানুষ কি পরিমাণ সরল হইলে যে এরূপ হাসিতে পারে তাহা চিন্তা করিতে ছিলাম।

বড় ভাইটি স্বাভাবিক হইয়া খরিদ্দারের মুখ কামানো শুরু করিল। দেখা দেখি ছোটটিও কৃত্রিম গম্ভীর মুখে কাজ আরম্ভ করিল। গালে দুই টান দিয়াই আবার টেবিলে ক্ষুর রাখিয়া সেই দমকা হাসি। বেশ কয়েকবার হাসির জন্য বিরতি দিয়া একসময় আমার মুখ কামানো শেষ হইল। পয়সা দিয়া বাহির হওয়ার সময় আবার বাধ ভাঙ্গা আনন্দে ছোটটি আমাকে জড়াইয়া ধরে। আবার আর এক দফা হাসি। মাথাটি আমার বুকে রাখিয়া মৃদু স্বরে জানাইল, বাবু, তুমি অত্যন্ত খতর নাক লোক।

এখন পাহালগামে পথে চারিদিক দেখিতে দেখিতে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ধীর লয়ে হাঁটিতেছি। আজ শেষনাগে প্রাতরাশ করিয়াছিলাম, যশপালে চা বিস্কিট। চন্দন বাড়ীতে ইচ্ছা করিলে দুপুরের খাবার খাওয়া যাইত। কিন্তু গাড়ী ঠিক হইয়া যাওয়ায় স্থির করিয়াছিলাম একেবারে পাহালগামে গিয়া স্নান করিয়া তাজা দেহ মনে বেশ করিয়া দুপুরের আহার করিব। সেখানে আমি ও গোলাম মহম্মদ অল্প আহার করি। ফ্রিসলোনের এক মাইল আগ হইতে হাঁটিয়া পাহালগাম আসায় আমার সময়ের উপর পূর্ব চিন্তার সবটা গোলমাল হইয়া গিয়াছে। এখন বিকাল হইতেছে। এখন ভরপেট খাইলে রাতের খাওয়া ঠিকমত হইবে না— আবার এদিকে কিছু না খাইলেও চলিতেছেনা। একটি মাদ্রাজী হোটেলে ইডলী ধোসা খাইলাম। রেস্তোরায় প্রচুর ভীড়। এ অসময়েও বসার স্থান পাওয়া দুষ্কর।

সেলুনে ভাল করিয়া মাথা ধোওয়া ও মাথা ম্যাসেজ, কয়েক মিনিটের জন্যে ঘুম—এখন পেটে ইডলী ধোসা আমার পথ ক্লান্তি অনেক খানি দূর করিয়াছে।

গুরুদ্বারাতে আসিয়া সর্ব প্রথম রক্ষিতের মোজা খুলিলাম। খালি পায়ে বা মোজা ছাড়া পায়ে কাপড়ের জুতা পরিয়া পাহালগামে কয়টি দিন কাটাইয়াছি।

গায়ে হাফ্ হাতা গেঞ্জি, তার উপর নস্যুর জ্যাকেট। মাথায় ম্যাক্বিক্যাপের বদলে উলের টুপি। এই আমার পাহালগামের পোষাক। গরম বেশী বোধ হইলে জ্যাকেটের সব গুলি বোতাম খুলিয়া দিতাম। পরনে সেই টেরিওলের প্যান্ট— প্রয়োজন না থাকিলেও যথারীতি নিচ দিক হইতে তিন ভাঁজে গুটানো।

গুরুদ্বোয়ারাতে শুনিলাম যাত্রা বিষয়ক দায়িত্বশীল কর্মচারীগণ এখন হইতে আর কাহাকেও পদ যাত্রা শুরু করিতে দিতেছেন না। মাইকে এ এইমাত্র নাকি জানাইয়াছে। মাইক এর ঘোষনা আমি ও শুনিয়াছিলাম। বলি হারি বুদ্ধি যা হউক। কাশ্মীরী ভাষায় বিজ্ঞাপ্তি, কিছুই বুঝি নাই।

যাত্রার মরসুমে—অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবন মাসে পাহাল গামের অবস্থা "ট্রেন জিটে ক্যাম্পের" ন্যায়। সকালে একদল গুহা অভিমুখে চন্দন বাড়ীর পথে রওয়ানা হন আবার দুপুরে কি বিকালে শ্রী নগর হইতে নূতন গুহাযাত্রী আসিয়া পাহালগামে রাত কাটান। কিংবা গুহা হইতে প্রত্যাবর্তন কারী দু-একরাত এখানে থাকিয়া বিশ্রাম করিয়া সকালের দিকে শ্রীনগরে রওয়ানা হন।

তখনও ছড়ি যাত্রার ব্যাপকতা বুঝি নাই। ছড়ি যাত্রার ব্যাপকতা বুঝায় পর পদ যাত্রীর উপর এই নিষেধাজ্ঞা যুক্তি সঙ্গত মনে হইল। এই নিষেধাজ্ঞা যুক্তি গ্রাহ্য, অনুমোদন যোগ্য। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে ছড়ি যাত্রার সময় অন্ততঃ শেষনাগ হইতে গুহা এবং গুহা হইতে পাহালগাম পর্য্যন্ত—সবটা পথ একমুখী যাত্রী থাকিবে। এ বিপদ জনক পথে ছড়ি যাত্রার সময় দু-মুখী—অর্থাৎ গুহা মুখী ও গুহা হইতে প্রত্যাবর্তন কারী যাত্রী বিশেষতঃ পিশুঘাঁটি কিংবা 'মহাগুনাসের পাকৃডণ্ডির পথে কিংবা পঞ্চতরণী হইতে গুহার রাস্তায় থাকিলে বিপদ ঘটার সম্ভাবনাও অনেক বেশী থাকিবে।

এ নিষেধাজ্ঞার ফলে গুহা যাত্রী এখানে আসিতেছে কিন্তু এখান হইতে চন্দন বাড়ী রওয়না হইতে পারিতেছে না। 'ট্রেনজিট্ ক্যাম্পে অর্থাৎ পাহালগামে লোক সংখ্যা বাড়িতেছে।

রাস্তায় দেখিতেছি, তীর্থযাত্রী মহিলাগণ কাপড়ের জুতা পায়ে দিয়া সলজ্জভাবে তালিম নিতেছেন অর্থাৎ এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করিতেছেন। কোন কোন যাত্রী হয়ত ঘোড়া ঠিক করিয়াছেন। এখন ঘোড়ার উপর বসিয়া নিজেকে রপ্ত করিতেছেন। সবটা একটা আনন্দময় পরিবেশ। সবাই খুশি খুশি। সমস্ত পাহালগামকে মেলায় আনন্দে পাইয়াছে। পাহালগামের বা পাশ্বর্বর্তী গ্রাম সমূহের ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশুকোলে জননী সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হইয়া এদিক ওদিক বেড়াইতেছে। যে লোকটিকে কিছুক্ষণ আগেও ধোপা যেরূপ তাবে

কাপড় নের, অনেকটা সেই কায়দায় কাশ্মীরী শালের বোঝা এককাঁধে ঝুলাইয়া শাল ফিরি করিতে দেখি—এখন সে সুন্দর পোষাক কোট, প্যান্ট, টাই পরিহিত অবস্থায় সুন্দর সাজে সজ্জিতা একটি ছোট্ট মেয়ের হাত ধরিয়া মেলায় আনন্দের ভাগ লইতেছে। সুন্দর পোষাক, সুন্দর চেহারা ও স্বাস্থ্যের লোকটিকে দেখিয়া কে বলিবে—ফিরিওয়ালা—রাষ্ট্রদূত নয়?

এখন সন্ধ্যা হয় হয়, অন্ধকার হয় নাই আজ আর অন্ধকার হওয়ার কোন সম্ভাবনা—নাই বৈদ্যুতিক আলোর নূতন নূতন বন্দোবস্ত সমস্ত রাস্তায় টিউব লাইটের ছড়াছড়ি। টিউব লাইট শুধু রাস্তার পাশেই নয় যেখানে সুবিধা পাইয়াছে—সেখানেই লাগাইয়াছে। আর ফ্লাড্‌—লাইড—সেও অনেক। এক এলাহবাদ কুম্ভমেলায় পর এত ফ্লাড লাইট একসঙ্গে জলা অবস্থায় দেখি নাই। রাস্তায় প্রচুর সরকারী বেসরকারী গাড়ী যাতায়াত করিতেছে। বুঝিতেছি একটা কিছু হইতেছে, কিন্তু ঠিক কি হইতেছে ধরিতে পারিতেছি না। সর্বত্র সবার মুখে একই কথা—"ছড়ি ছড়ি" চা-ওয়ালা ছড়ি বলিতেছে, দোকানদার ছড়ি বলিতেছে, ফিরিওয়ালা ছড়ি বলিতেছে, কুলী, ঘোড়াওয়ালা সবার এক কথা 'ছড়ি, ছড়ি, ছড়ি' এমন কি যখন তাহারা নিজেদের মধ্যে আলাপ সালাপ করে তখন ও আলাপের একটা বড় অংশ জুড়িয়া থাকে ছড়ি। সন্ধ্যার পর খুব দেরী না, করিয়া রাতের খাওয়ার জন্য এক পাঞ্জাবী হোটেলে যাই মনে ছিল আজ তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িব। যথারীতি অস্বাভাবিক ভীড়। হোটেলে রেডিও চলিতেছে। স্থানীয় সংবাদ কাশ্মীরী ভাষায় খবর পড়াশুরু হইল। দেখিতে দেখিতে রেডিওর নিকট ফুটপাতে বেশ বড় জট্‌লা, খাওয়া শুরু করিয়াছেন এরূপ কেহ কেহ খাওয়া বন্ধ করিয়া ছড়ির সংবাদ শুনিতেছেন। আমি কাশ্মীরী ভাষা বুঝি না সত্য, তবে 'ছড়ি" 'এল মোকাম' 'পাহলে গাম'—ঠিকই বুঝিতেছিলাম। স্থানীয় সংবাদে ছড়ি অংশ শেষ হওয়া মাত্র—তখন ও সংবাদ চলিতেছে—যাঁহারা সংবাদ শুনার জন্য খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন তাঁহারা খাওয়া শুরু করিলেন, হোটেলের সম্মুখে ফুটপাতে জট্‌লা অনেক পাতলা হইয়া গেল।

রাতের খাওয়া শেষ করিয়া আজ তাড়াতাড়ি ঘুমাইয়া পড়িব স্থির করিয়া গুরুদ্বারাতে যাই। একি! এত লোক! ঘুমাই কি ভাবে? দেখিলাম মির্জাপুরী সজিরা আমার জন্য স্থান রাখিয়াছেন। যেখানে ত্রিশ বত্রিশ জনের থাকার ব্যবস্থা, সেখানে কম করিয়াও আশি জন। ছেলে, মেয়ে, বৃদ্ধা—হরির লুটের বাতাসার মত—এক জনের উপর আর একজন কোন রূপে পড়িয়া রহিয়াছে। অনেককে বসিয়া বসিয়া রাত কাটাইতে হইবে। ভাঁজ করা কম্বল বিছানা—দেড়

হাত পাশ, চার নাকে চার লম্বা—এর উপর তিন জন বসিয়া রাত কাটাইবে, এরূপ প্রভৃতি নিতেছে। আমরা যাহারা পূর্বে হইতে গুরুদ্বারাতে আছি তাহারা—যে সমস্ত নতুন যাত্রী রাত কাটানোর জন্য এখানে আসিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে অনেকটা আদেশের সুরে নির্দেশাদি দিতেছি। আমাদের ভাব ভঙ্গি অনেকটা—"এস্থানের উপর আমাদের স্বত্ব আছে" এরূপ। রেল স্টেশনে যাত্রী বিশ্রামাগারে পূর্ব হইতে বিশ্রামরত যাত্রী নূতন যাত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের মত।

আমার মত অল্প কয়জন-চূড়ান্ত পরিশ্রান্ত, আমরা চাহিতেছি—কথাবার্তা বন্ধ হউক—পরিবেশ যত তাড়াতাড়ি শান্ত হয় ততই মঙ্গল। তত তাড়াতাড়ি ঘুমাইতে পারি। যাহারা আজ শ্রীনগর হইতে আসিয়াছেন কিন্তু শোওয়ার জায়গা পাইয়াছেন তাঁহারা চাহিতেছেন—কিছুক্ষণ গল্প-গুজব চলুক, তার একটু রাত হোক, তারপর ঘুমাইব। আর যাঁহাদের শোওয়ার জায়গার অভাবে সিদ্ধান্ত লইতে হইয়াছে—বসিয়া বসিয়া রাত কাটাইবেন—তাঁহারা চাহিতেছেন—সারা রাত ধরিয়া হৈ হল্লা গল্প গুজব চলুক। এরূপ পরিস্থিতিতে ঘুম ! আহা, পয়সা খরচ করিয়াও এমন পরিবেশ কোথায় কিনিতে পাই। অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য দেশ ভ্রমণ, এর চেয়ে ভাল ক্ষেত্র ভূ ভারতে যার কোথায় ? চিন্তা করিলাম, রাত ত কাটুক, আগে অভিজ্ঞতা অর্জন হউক, কাল শরীর খারাপ হইলে দেখা যাইবে। তখন না হয় হোটেলের উপর আর না হয় সোজা শ্রীনগরে।

মৃদু স্বরে ডাক্তার বাবু পণ্ডিতজীর সঙ্গে আলাপ করিতেছি।

: বাঙ্গালী বাবু, এখানে থাকা অসম্ভব, চলুন আমরা কাল সকালেই শ্রীনগরে গিয়া বিশ্রাম করি। শরীরে আর দিতেছে না।

: আচ্ছা, এই ঝাণ্ডা' ঝাণ্ডা কি, শুনিতেছি ? সবার মুখে এক কথা, 'ঝাণ্ডা', 'ঝাণ্ডা'।

: ঝাণ্ডা বুঝেন না ? ফ্লেগ, কাল হয় ত সীয়ারাম মুণিম আসিবে। আমাদের একদিন পর তাঁহারা গুহায় গিয়াছেন—আমাদের মত চন্দন বাড়ী হইতে গাড়ীতে ফিরিতে পারিলে কালই এখানে আসিবেন।

আমি বলিলাম, 'পণ্ডিতজী' হাতী মেরাসাথী'—দেখেছেন ?

: আমি সিনেমা দেখি না

: হুম।

আবার বলিলাম, "লালু ভাই, আপনি কি করিবেন।"

: আমি কাল এখানে থাকিতেছি। মামীও থাকিবেন।

হিম শীতল কণ্ঠে বলিলাম—

: আচ্ছা পণ্ডিতজী, আপনি একটু চিন্তা করিয়া বলুন ত, আমি কি আপনাকে-সিনেমা দেখেন কি দেখেন না—এরূপ কোন প্রশ্ন করিয়াছিলাম ? না আপনার কাছে জানিতে চাহিয়াছিলাম।

"হাতি মের সাথী" দেখেছেন ?

পণ্ডিতজী, বিদ্বান, সুরসিক ও যথেষ্ট চট্‌পটে ব্যক্তি। ভদ্রলোকের মানসিক বয়স অনেক কমছিল। এমনিতে বয়স ষাটের কম নয়, কিন্তু মানসিক বয়স ত্রিশ বত্রিশের বেশী নয়।

গুরুদ্বারা ধর্মশালার দোতালায় প্রচুর যাত্রীর বাজারী কোলাহল-নিচুস্বরে আমাদের মধ্যে কথাবাবার্তা চলিতেছে।

আমার তাল কাটা কথায়-অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কথা মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ "পণ্ডিতজী হাতী মেরা সাথী দেখেছেন" কথাটি তাহাদিগকে অসুবিধায় ফেলিতেচিল।

: ডাক্তার বাবু, এক কাজ করুন, আপনি যদি কাল শ্রীনগরে যান তবে লালচকের হোটেলের যে কামরায় ছিলাম, সে কামরা উঠুন। আমরা যে যেদিন যাই—সেখানে উঠিব। ভাড়া দেওয়ার সময় সবাই সমান অংশদিব।

মির্জাপুরী সবাই আমার প্রস্তাই অনুমোদন করিলে পর আবার শুধু মাত্র শুরু করিয়াছি।

: পণ্ডিতজী।

: না ভাই, আমি দেখি নাই।

: ওই দেখুন, আমি বিপরীত দিকের বিছানা দেখাই।

আমার ডানদিকের বিছানায় লালু ড্রাইভার ও তাঁর স্ত্রী, আমার বাঁ দিকের বিছানায় পণ্ডিতজী, ডাক্তার বাবু ও ডাক্তার বাবুর স্ত্রী।

আমার "ওই দেখুন" বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমার নির্দেশিত দিকে একবার মাত্র তাকাইয়া নিজেদের বিছানা গুটাইয়া নিতে নিতে সে কি হাসি। লা ড্রাইভারের স্ত্রী, হাসির শব্দ যাহাতে ভদ্রতার মাত্রা না ছাড়ায় সেজন্য মুখ চাপিয়া বিছানায় শুইয়া হাসে, সে কি হাসি। বড় কঠিন ও করুন অবস্থা। হাসির জন্য না পারিতেছেন শুইয়া থাকিতে, উঠিয়া বসিতেছেন আবার ভদ্রতার খাতিরে সবার দৃষ্টি হইতে নিজেদের লুকানোর জন্য শুইতেছেন। পণ্ডিতজী ডাক্তারবাবু, ডাক্তার গিন্নির একই অবস্থা। হাসিতে হাসিতে শুইতেছেন, হাসিতে হাসিতে বসিতেছেন, বসিয়া বসিয়া হাসিতেছেন, শুইয়া শুইয়া হাসিতেছেন।

আমার বিপরিত দিকের মহিলা মোটা, সোটা বটে। ওহ এমন মোটা মহিলা, জীবনে দেখি নাই। শালগ্রামশীলার নাকি শোওয়া বসা সমান, না, এ মহিলাও কিছু কম যান না। উনি বসিলে যতখানি উচুতে মাথা থাকে, শুইলে পরেও পেট প্রায় ততখাতি উঁচু স্পর্শ করে, আরও বর্ণনা দিতেছি— আমার ধারণা—ধারনাটি খুব বাস্তব সম্পর্ক শূন্য নয়। চিকন চাকন মহিলার ৩২ মাপের ব্লাউজ, সাধারণ মহিলার ৩৪ মাপের ও মোটাসোটা মহিলার ৩৬ মাপের ব্লাউজ লাগে, এ ধারনার আধার লইয়া বলিতেছি—মহিলার ব্লাউজের মাপ ৬০—৬২। মহিলা উলের ব্লাউজ পরিয়া আছেন, আমার বিবেচনায় মহিলাদের ব্লাউজ পরার যে উদ্দেশ্য—তার অনেকখানি এ বাপুর জন্য ব্যর্থ হইতেছে—দেখা যায়। তবে মহিলার বয়স ও মাতৃত্ব ছাপ সম্পন্ন চেহারার জন্য বিশ্রী দেখাইতেছে না, খুব একটা খারাপ লাগিতেছে না। মহিলার একপাসে স্বামী অন্যপাসে কন্যার বিছানা। তাঁহারা তিন জন কায়ক্লেশে যে স্থানটুকুতে শুইয়াছেন—সে স্থানে সাত-আট জন পূর্ণ বয়স্ক লোক লৌক স্বচ্ছন্দে শুইতে পারে। স্বামী ভদ্রলোককে দেখিয়া স্বীকার করিতে লয়, এরূপ ক্ষেত্র-কেই বোধ হয় রাজযোটক বলা হয়। কন্যার শরীর বা স্বাস্থ্য মা-বাবার মুখ বিশেষতঃ মা এর মুখ উজ্জল করিতেছে। দিন দিন কন্যা মা-এর মুখ উজ্জতর করিবে, এরূপ আশা করিলে খুব অপাত্রে আশা স্থাপন করিয়াছি, এখন কেহ বলিবে না।

কন্যাটি বিবাহিতা, আশাকরি কোন পাঠিকা মা বাবার মধ্যে কে কে বিবাহিতা জানিতে চাহিবেন না। যদি মেয়েটির মা বাবা, দুইজনের যে কেহ দাবী করেন হাতী মেরা সাথী, তবে যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি—ভদ্রলোকের কথায় সত্যতা অনেক বেশী স্বীকার করিতে বাধ্য।

কে বেশী মানান সই। মহিলার স্বামী হিসাবে ভদ্রলোক? না ভদ্রলোকের স্ত্রী হিসাবে মহিলা? দুইজনকেই দেখিতেছি, কিন্তু কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। একটি গানের কলি বারে বারে মনে পড়িতেছে "সোনার হাতে সোনার কাঁকন, কে কার অলঙ্কার"?

আমি কল্পনায় ভাসিতে ভাসিতে তাদের বাড়ির নিকটে গেলাম, কল্পনায়— মেয়েটির আট নয় বৎসর বয়সের ছেলেকে সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করি—

খোকা তোমার দাদু দিদা ভাল ত?

মোটামুটি ভাল আছেন।

ছেলেটি কি বলিতে চাহিতেছে ভাল করিয়া দ্বিতীয় বার চিন্তা করিতে হয়।

ক্রমে বাড়িতেছে। ধর্মশালায় দোতলায় কোলাহল করিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ এরই মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। বেশীর ভাগ যাত্রী ঘুমের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এর মধ্যে কে যেন তাল তুলিল গান—গান হউক। গোলমালের মধ্যে শুইয়া চিন্তা করিতেছি—আজ ঘুমের দফারফা, চক্ষু বুজিয়া আছি। এমন সময় গান—ঘুমের শেষ আশাটুকু বিসর্জন দিয়া শুইয়া আছি, ঘরের এক কোণা হইতে এক মধ্য বয়স্কা বিধবা মহিলা একটা ভজন শুরু করিলেন। মহিলার সঙ্গে আর তের চৌদ্দ বৎসরের একটি মেয়ে। মেয়েও সময় সময় মার গানের সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলাইতেছে। সুন্দর! অপূর্ব সুন্দর! ভজন, গুজরাটি—ভাষা। কথার সবটা বুঝিতেছি না। কিছু কিছু বুঝিতেছি। সখা কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের জন্য সুদামার প্রস্তুতি। সুদামার পত্নী সুনীতি স্বামীর হাতে সখার জন্য কিছু কিছু নাড়ু দিতেছে। অর্ধপথে গান থামাইয়া মহিলা চুপ করিয়া গেলেন। সলজ্জভাবে জানাইলেন—"আমার গান হয় ত আপনাদের ভাল লাগিতেছে না, হয় ত গানের কথা বুঝিতেছেন না। গানের প্রভাবে বাজারী কোলাহল সম্পূর্ণ দূর হইয়াছিল। সবাই চুপচাপ গান শুনিতেছিলাম। শান্ত পরিবেশ আবার একসঙ্গে অনেকে কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

না, না, আপনি গান, আমরা বুঝিতেছি।

বহিনজী, আপনার গান, গানের গলা খুব সুন্দর।

আপনার মেয়েটি ও সুন্দর গায়।

এরূপ একসঙ্গে অনেক লোকের হরেক অনুরোধ। পরিস্থিতি আবার কিছুটা স্বাভাবিক হইল একবৃদ্ধ ভদ্রলোক অনেকটা আদেশের ভঙ্গিতে বলিলেন—

বেটি, তোমার গান বহুত আচ্ছা, তুমি গাও। আবার শুরু কর।

এবার আমার বিপরীত দিকের "হাতী মেরা সাথী" মহিলা তার বিছানায় শোওয়া—অবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলেন। জানাইলেন বা ঘরে বোমা ফাটাইলেন।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি গাও। তোমার গান শেষ হইলে আমি গাহিব।

'মেয়ে জানাইল সেও মার সঙ্গে সঙ্গে গাহিবে।

প্রথম মহিলা আবার গান শুরু করিলেন। পথে বন্ধু সুদামার দুঃখ কষ্ট। সখা কৃষ্ণের প্রাসাদে আগমন, অভ্যর্থনা, সখা পত্নী রুক্মিনী সত্যভামার বন্ধুকে সেবা যত্ন। সখা কৃষ্ণের বন্ধু পত্নীর দেওয়া নাড়ু সেবা। গানের কথা, সুর সুন্দর, মহিলার গানের গলা সুন্দর, দরদ দিয়া গাওয়া।

সবাই চুপচাপ গান শুনিতেছিলাম। আমি গান শুনিতে শুনিতে বিছানায়

উঠিয়া বসি। মনে যথেষ্ট ভয়—কি হয়, কি হয়, ভাব। এ মোটা মহিলা সুগ্রীব সোদর কন্ঠা সহ গান আরম্ভ এ জগতে টিকিতে পারিব ত ?

ভীম লোচন শর্মার গানের গুঁতো হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ উপায় দিল্লীর পশ্চিমে বা বার্মার পূর্ব দিকে চলিয়া যাওয়া, কিন্তু এ মহিলার গানের গুঁতো হইতে কি দুনিয়া ছাড়িয়া যাইতে হইবে ?

দেখিলাম অনেকেই আমার মত এক এক করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিতেছেন। হয়ত আমার ই মত শঙ্কিত মনে চিন্তা করিতেছেন—মহিলার গানের সময় এখানে থাকা কতটা নিরাপদ।

রামায়নের একটি দৃশ্য আপনা হইতেই মনে উদয় হইতেছে। রাবনের আদেশে রাক্ষস সেনারা অসময়ে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য যথাসাধ্য ফৌজী বাদ্য বাজাইয়াও ঘুম ভাঙ্গিতে পারিতেছে না। চিন্তা করিতেছি, ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণের ঘরে এ মহিলা গান গাহিলে কাজটি কত সহজ হইত।

চিন্তা করিতেছি, সন্ত অমর নাথ দর্শনপ্রাপ্ত পুণ্যবানকে দু হাত উজাড় করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিতেছেন।

অভিজ্ঞতা অর্জন করার তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছি।

এরূপ পরিবেশে তিন রাত সেখানে ছিলাম।

অঃ অঃ কাঃ—১১

অষ্টম অধ্যায়

আজ ২১ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার। ভোরের ফোটার আগেই আলো কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলেও আলস্যে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিলনা। চোখে ঘুমের জড়তা কাটে নাই। আরও ঘুম হইলে ভাল হইত, শরীরটা অনেক হালকা হইত, আরাম পাইতাম, ঘড়িতে ৭টা বাজিতেছে, পাহাড়গায়ে ভোর, ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিতেছি, সিঁড়ি হইতেই যতটুকু দেখা যায় তাহাতে বুঝিলাম এক রাতেই অনেক বদল হইয়াছে।

গুরুদ্বারা, গুরুদ্বারার উত্তরে গৌরী শঙ্কর মঠ। মঠ ও গুরুদ্বারার মধ্যে বেশ বড় একটি খালি মাঠ। এখন দেখিলাম মাঠে বহু টিউব লাইট ও ফ্লাড—লাইট জ্বলিতেছে। গুরুদ্বারা মাঠটি ও মঠের সম্মুখ দিক বড় রাস্তা সংলগ্ন, পিছনে, বেশ নীচুতে একটি ছোট নালার প্রায় সঙ্গে, রাস্তার পশ্চিমে একটি নীচের রাস্তা, রাস্তার পশ্চিম হইতে লীডার বা লম্বোদর নদী পর্যন্ত খালি ময়দান ছিল, এখন দেখিতেছি ময়দানে টিউব-লাইট ও ফ্লাড লাইটের ছড়াছড়ি। এক রাতে ঐ ময়দানে প্রচুর তাঁবু টাঙ্গানো হইয়াছে। বহু লোক এ সমস্ত তাঁবুতে রাত্রি বাস করিয়াছেন বোঝা হইতেছে। মধ্যে মধ্যে কাপড়ে ঘেরে বেশ কয়েকটি গণ শৌচাগার, কুম্ভমেলায় যেরূপ গণ শৌচাগার দেখিয়াছি। আমি সিঁড়ি দিয়া নিচে আসিলাম। আজ গুরুদ্বারার পায়খানা দুইটিতে বড় লাইন। অনেকে কতক্ষণ লাইনে দাঁড়াইয়া ঘটি হাতে সোজা গুরুদ্বারার পিছনে নালা বরাবর সবেগে হাঁটিতেছেন। ময়দানে যাঁহারা রাত কাটাইয়াছেন তাহাদের এক অংশের ভরসা এই নালা, অন্য অংশ লীডার নদীর তীর।

আমি চা এর খোঁজে বড় রাস্তায় আসিলাম, আজ গুরুদ্বারের নিকটে, কত চা এর দোকান—কাল সন্ধ্যায় এখানে চা এর নূতন দোকান দেখিয়াছি। রাতে আর ও কয়েকটি নূতন দোকান খুলিয়াছে।

এক দোকানের সম্মুখে পাঁচ ছয় জনে বিচিত্র পোষাকে হইয়া অতি সাধারণ যন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে গান গাহিতেছেন, গানের মধ্যে ব্যোম্ ব্যোম্ করিতেছেন। তাহাদের পোষাকের বা মুকুটের জন্য কিংবা গানের জন্য কিংবা ব্যোম ব্যোম্ ধ্বনির

অন্ত কিংবা সবগুলির মিলিত প্রভাবের জন্য প্রায় ত্রিশ বত্রিশ জনের একটি জনতা সব সময় গায়ক দলের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে, গান শুনিতেছে। গায়ক দলের প্রত্যেকের মাথায় মুকুট দেখিয়া স্মরণে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি। এদের কোথায় দেখিয়াছি, কিন্তু কোথায় ? কোথায় ? আমি নিঃসন্দেহ—আমি দেখিয়াছি কিন্তু কোথায় ? আমি দলের সঙ্গে সঙ্গে—শ্রোতা জনতায় সামিল হইয়া ফিরিতেছি —গান শুনিতেছি।

আবার নূতন সমস্যা—শ্রোতাদের কেহ কেহ কি যেন একটা শব্দ সন্তর্পণে দলের লোককে বলিতেছে। বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর শ্রোতাদের উচ্চারিত শব্দটি বুঝিলাম, "জঙ্গম" আমার নিজের মনে প্রশ্ন "জঙ্গম", জঙ্গম কি ?

মনে পড়িল ঠিক, শ্রীনগরে প্রথম দিন লালচকে ট্রেফিক আইল্যাণ্ডে এরূপ মুকুট পরিহিত কয়েক জনকে দেখিয়াছিলাম।

এদল যে দোকানের সম্মুখে গান গায়, সে দোকান হইতে তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হয় ভিক্ষার পাঁচ দশ পয়সা নয়, রীতিমত দুই টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকার নোট। পথ চলতি কেহ কিংবা হয় তো শ্রোতাদের মধ্যে কেহ সময় সময় গায়ক দলের কাহাকেও পয়সা দেয়। পয়সা গ্রহণ করার কায়দা বশিষ্ঠ্য পূর্ণ। গায়কদলের কেহ হাতে কোন দান গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের হাতে, কিংবা ঝুলায় ঘণ্টা আছে: তাহারা ঘণ্টায় দান গ্রহণ করেন। পরে ঘণ্টা হইতে হাতে তুলিয়া পকেটে বা ঝুলায় রাখেন। কোন সময় হয়তো ঘণ্টা হইতে নোটটি তুলিয়া দুইকলি গান গাহিয়া ব্যোম্ ব্যোম্ করার পর নোটটি পকেটে রাখেন।

আমি দলের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ছিলাম। আবার গুরুদ্বারার নরম ঘাসে আসিয়া বসিলাম। এক বয়স্কা পাঞ্জাবী ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। তিনি জম্মু হইতে গতরাতে এখানে আসিয়া এই গুরুদ্বারাতে উঠিয়াছেন। জানাইলেন, শুধু মাত্র ছড়ি যাত্রা দেখার জন্য এখানে আসিয়াছেন। তিনি একা আসিয়াছেন। ছড়ি চন্দন বাড়া করিলে তিনিও জম্মুতে ফিরিয়া যাইবেন।

শুধু মাত্র ছড়ি যাত্রা দেখার জন্য এ বয়সে একা পাহালগামে ছুটিয়া আসিয়াছেন? এখানে এত লোকের সঙ্গে থাকিতে আপনার অসুবিধা হইতেছে না ?

এ আর এমন কি কষ্ট ? হাসিয়া জানিতে চাহিলেন আমি কোথায় খাওয়া দাওয়া করি ?

হোটেলে।

হোটেলে কেন? যতক্ষণ জলকাদাতে থাকিবেন ততক্ষণ গুরুদ্বারার লঙ্গর খানাতে থাওয়া দাওয়া করিও।

দেখুন, তাঁহারা দয়া করিয়া থাকিতে দিতেছেন, এই যথেষ্ট। তার উপর আবার খাওয়া দাওয়া। ওই দেখ, আলাদা স্থানে রান্নার টিনের ছাবড়া বাঁধা হইয়াছে তিয়ান তৈয়ারী হইয়াছে। সবার জন্ত রান্না হইতেছে। সকালে, দুপুরে, রাতে—তিন দফায় খাওয়ানো হইবে।

প্রচুর খরচের ব্যাপার।

দেখ, অন্তত একেবেলা এই রান্নায় স্থান পাওয়ার জন্ত কত দল চেষ্টা করিতেছে।

কত দল মানে?

মনে কয় আজ দুপুরের খাওয়া খরচ জম্মু ট্রাক মালিক সমিতি বহন করিতেছেন। খবর লইয়া দেখ হয়তো রাতের খাবারের বন্দোবস্ত ও খরচাদি পাঠান কোট ব্যবসায়ী সমিতি, কালকের খরচ হয় ত উধমপুরের অধিবাসীগণ বহন করিতেছেন। এই আড়াই দিনের খাওয়ানোর ব্যাপার। কয় বেলা আর হয়। বহু দল বা সমিতি দায়িত্ব নিতে চায়; সবাইকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। এমনও হয়—দলের সংখ্যা ও আগ্রহ দেখিয়া বলিতে হয়—একক ভাবে কোন দলকে সম্পূর্ণ একবেলা দেওয়া অসম্ভব। আপনারা ভাগ করিয়া নিন—অর্থাৎ এক বেলার দায়িত্ব বাধ্য হইয়া একাধিক দল বহন করে।

আমি পর দিন সকালে লালু ড্রাইভারের স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে লঙ্গর খানার চা ও রুটি তরকারী খাই।

বাঙ্গালী বাবু, খাও, মেরী বাত মানো। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা খানা হ্যায় ও।

আমি বহিরে চা রুটি খাইয়াছি। এখানে ঘাসের উপর বেশ আছি।

চা এর কাপ বা এরূপ কিছু আমার কাছে নাই।

কাপ এর দরকার নাই—যাঁদের কাপ টাপ নাই—তাদের মাটির ভাঁড়ে চা দেওয়া হইতেছে। আমি আনিয়া দিতেছি, তুমি এখানেই বসিয়া বসিয়া খাও।

ঠিক আছে, চা আনো! রুটি তরকারীর দরকার নাই।

না, না—তা হয় না। উপর হইতে আমার থালা আনিতেছি—থালে করিয়া

রুটি তরকারী আনিব। এবার লালু ভাইয়ার স্ত্রীর কথার নূতন দৃষ্টি কোন হইতে গুরুত্ব দিতে হইল। আমি মাছ খাওয়া বাঙ্গালী—মছলী খানে বালা। একবার বৃন্দাবনে এক হোটেলে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর হোটেল ওয়ালার সঙ্গে খেজুরে আলাপ বা যথা আলাপ শুরু করি। বলিলাম "টাকা পয়সা মানুষের কত ক্ষতি করে?" আমার কথার উত্তরে ব্রজবাসী হোটেল ওয়ালা মানুষের ক্ষতির যে সুর সেদিন ব্যক্ত করিয়াছিল—তাহা সব সময় আমার মনে জলজল করে। জীবনেও ভুলিতে পারিব না। টাকা পয়সা হইলে, মানুষে মদ খায়, বেশ্যাবাড়ী যায়, এমন কি কখন ও কখন মাছ পর্যন্ত খাইয়া ফেলে—কভি কভি মছলী ভি খা লেতে! কোন আজীবন নিরামিষ ভোজী। মাড়োয়াড়ী গৃহ বধূ যখন নিজের থালায় খাওয়াইতে উদ্যত তখন আমি বিষয়টি উপর দ্বিতীয়বার চিন্তা করিলাম।

এই মগটা লইয়াযাও, মগ এ তরকারী সঙ্গে একটা রুটি আর ভাঁড়ে চা আন। সে তরকারীর স্বাদ এখন ও জিহ্বায় লাগিয়া আছে।

লঙ্গর খানা হইতে রুটি—তরকারি, চা দেওয়ার রীতি মত অবাক করে। শুধু হাতে গেলে মাটির ভাঁড়ে চা—হাতে রুটি তরকারি। থালা বা প্লেট সহ গেলে তিন চারটি রুটি সঙ্গে উপযুক্ত পরিমান তরকারী—চা।

কেহ কেহ এক হাতে ঘটি অপর হাতে থালা লইয়া রন্নার স্থানে যাইয়া জানাইতেছে। তিন জনের চা রুটি দিন, "কেথায় তোমার অন্য দুই জন?" এরূপ কোন প্রশ্ন নাই—ঠিক তিন জনের আন্দাজ চা, রুটি তরকারী দিয়া দিতেছে।

আমার মনে হইল এখন যদি এক হাতে একটি বালতি ও অপর হাতে একটি টুকরী লইয়া গিয়া বলি' "আমরা ত্রিশ জন"। তবে গুরুদ্বারার লঙ্গর খানা হইতে এক বালতি চা এবং এক টুকরী রুটি তরকারী আনিতে পারি।

পরদিন দুপুরে লঙ্গরখানায় খানা গুরুদ্বারার মাঠে সবার সাথে পংক্তিতে বসিয়া খাইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম আমার চেয়ে সহস্রগুণ আর্থিক সংগতি সম্পন্ন শিক্ষিত সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত শিখ ভদ্রলোকগণ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সহ; সাধারণ সাপুড়ে, দোকানের কর্মচারী, কুলী ঘোড়াওয়ালা বা সাধারণ তীর্থ যাত্রীর সহিত একই স্থানে খালে বসিয়া খাইতেছেন, তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম—আমি কোন ছার, এত শুধু খাওয়া নয়। সকাল হইতে লক্ষ্য করিয়াছি মহিলা গণ স্বী নিষ্ঠার সহিত তরকারি কুটিতেছেন—দেখিলে বুঝা যায়—কেহই পয়সার

বিনিময়ে কাজ করিতেছেন না। অন্তরের প্রেরনায় তীর্থযাত্রীর সেবা করার ন্যূনতম সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন। যেন তরকারী কুটায় সুযোগ পাইয়া ধন্য হইতেছেন। খুব নিষ্ঠার সহিত কাটা তরকারী ধুইতেছেন। কেহ কেহ রান্নার ঠাকুরকে সাহায্য করিতে পারিয়া তৃপ্তি পাইয়াছেন।

এ খাওয়া নয় মহপ্রসাদের ভাগ লওয়া। নিজেকে ধন্য করা।

অমুর সেই মহিলার সাথে আলাপের পর কিছু করার নাই দেখিয়া আবার ধর্মশালার দু-তলায় উটি।

রাম দাসজী, আপনি শ্রীনগর যান নাই?

কাল যাইব।

রাম দাস বৃদ্ধ মানুষ, একটু আবেগ প্রবণ। "আমি মির্জাপুরের সবচেয়ে বড় রিক্সা ব্যবসায়ী" বলিতে বলিতে তিনি বসা অবস্থা হইতে প্রায় উটিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

আর এখন বয়স হইয়াছে। এ বয়সে রিক্সার ব্যবসা করা অসম্ভব। আমার সময় কাটানোর কথা। হাতে কোন কাজ নাই। মুখ কামানোর সরঞ্জাম বাহির করিতেছি। আর রামদাসের সঙ্গে আলাপ করিতেছি। আমি একটা দুইটা কথা বলিতাম, রামদাসকে উত্তেজিত করিতাম – রামদাস এক এক দফায় অনেক কথা বলিত, উপযুক্ত সময়ে—"হুম, হ্যাঁ করিতাম। বৃদ্ধ মানুষটি খুব সরল। আমাকে বলে, দেখ তোমার বয়স হইয়া গেলে কক্ষণও রিক্সার ব্যবসা করিও না, একটা রিক্সা ওয়ালাও ভুলে সত্য কথা বলে না। দিনের শেষে যখন রিক্সা জমা দেয়—তখন তাদের কোন কথা বিশ্বাস করিও না। জান না তারা কি পরিমাণ মিথ্যা কথা বলিতে পারে? কোন দিনও বলিবে না— তোমার টাকা নাও, আজ বলিবে এ কারণে, কাল সে কারণে, পরশু স্ত্রীর কারণে, তরশু ছোট ছেলের কারণে নিঃস্ব গেষ্ঠির কারণে—সে সম্পূর্ণ দিন রিক্সা চাইলেতে পারে নাই। রিক্সাওয়ালা সম্পূর্ণ দিন রিক্সা চালাইতে পারে নাই—কিন্তু দোষ তোমার—তুমি কম পয়সা নাও।

"তখন কি করিতে হয় জনে? ঠিক এমনি করিয়া" রাম দাস সত্যি সত্যি আমাকে জাপটাইয়া ধরিল তাদের এদিকের কোমর, সে দিকের কোমরের ভাঁজ হইতে পয়সা বাহির করিতে হয়। রোজ সন্ধ্যায় রিক্সা জমা দেওয়ার সময় প্রত্যেকটি রিক্সাওয়ালার সঙ্গে রীতিমত কুস্তি লড়িতে হয়। কোন এক সময়

আমার ৬৫টি রিক্সা ছিল, তুমি চিন্তা কর রোজ সন্ধ্যায় এক এক করিয়া ৬৫ জনের সঙ্গে কুস্তি লড়া। হোঃ, রিক্সার ব্যবসায় আমার ২৫ বৎসর আয়ু কমাইয়া দিয়াছে। এখন আমার মাত্র একটা রিক্সা। অন্য সব বিক্রী করিয়া দালান তৈয়ারী করিয়াছি এবং দালান ভাড়ার উপর জীবিকা নির্ভর করিতেছে।

রাম দাস তার মনের গোপন ইচ্ছা অত্যন্ত সন্তর্পণে ও নিচু স্বরে আমাকে জানাইল। কাশ্মীরের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কি সুন্দর! পুতুলের মত। চল না একটা বাচ্চা চুরি করি।

আরে রাম দাসজী বল কি?

তোমাকে দেখে বললাম ভাই। চুরি করা যায় না?

এ কামও করিবে না। মুসলমান—সব মুসলমান। দেখো তোমাকে একঘর করিবে। রামদাসজী একদিন শ্রীনগরে আমার কাছে জানিতে চায়—"আচ্ছা বল ত, শ্রীনগরে মানুষ কেন আসে? এখানে ত শুধু বাগান আর বাগান।

আচ্ছা রাদাসজী, কাজের কথায় আস। এখানে গতকাল হইতে লোকমুখে শুধু ঝাণ্ডা নয়, ছড়ি ছড়ি আজ সকালে আবার নুতন কথা শুনিলাম "জঙ্গম"।

ঝাণ্ডা বোঝা না? ঐ যে গুরুদ্বারার সম্মুখে বাঁশের মাথায় উড়িতেছে, আর ছড়ি? ছড়ি বোঝ না? আমরা অমরনাথের পথে হাতে লইয়া যাই নাই। এমনি এমনি করে।

আর জঙ্গম?

হবে এরকমই একটা কিছু বাঁশের মত বিংবা পতাকার মত।

আসর ভাঙ্গিয়া রামদাস বাহিরে গেল। গালে সাবান দিয়াছি, দূরে একটা কোলাহল শুনিতেছি—সঙ্গে বাদ্য, নাগার্চির বাদ্য। কিসের আওয়াজ বুঝার জন্য কান পাতিলাম। নীচু হইতে কে যেন বলিল ঝাণ্ডা, আবার যেন শুনিলাম "ছড়ি" আমি মুহূর্তমাত্র দেরী করি নাই। গামছাটা দিয়া গালের সাবান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনরূপে মুছিয়া এক দৌড়ে রাস্তায় আসিয়া একটি বড় পাথরের উপর দাঁড়াই। আমার তখনকার মনোভাব—যদি অর্ধেক গাল কামানো হওয়া অবস্থায় ছড়ির মিছিল আসিতেছে—শুনিতাম তবু আমি সাবান গামছায় মুছিয়া আধগাল কামানো, আধগাল দাড়ি সমেত দৌড়াইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতাম।

রাস্তায় আসিয়া দক্ষিণ দিকে বারে বারে তাকাইতেছি। বাদ্যের আওয়াজ

দক্ষিণ দিক হইতে ক্রমশ উত্তর দিকে আসিতেছে। বুঝিতেছি বাদ্যের পিছে পিছেই ছড়ি মিছিল আসিতেছে।

আমার সম্মুখে দিয়া বেশ কয়েকটি সরকারী গাড়ী গেল। বেশীর ভাগ পুলিশের গাড়ী, কাঁধের ধাতু নির্মিত তারকা চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতেছি—উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীগণ রাস্তার দুই পাশে দাঁড়ানো দর্শককে আরও পিছনে সরিয়া দাড়ানোর জন্য অনুরোধ করিতেছেন, সময়ে সময়ে কাহাকে ধরিয়া দুই তিন কদম পিছনে সরাইয়া দিতেছেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীর চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ—একটা কি হয়, কি হয় ভাব। বাদ্য আরও নিকটবর্ত্তী হইল। ঘন ঘন দক্ষিণ দিকে দেখিতেছি। এবার রাস্তায় প্রচুর লাঠিধারী পুলিশ। ভূমির সমান করিয়া লাঠিটি নাভি সমান উঁচুতে দুইহাতে ধরিয়া রাস্তার দুই পাশে দাঁড়ানো দর্শকদিগকে আরও পিচনে ঠেলিয়া রাস্তা প্রশস্ত করিতেছে।

এবার নজরে আসিল এক পংক্তিতে সাত—আট জন পুলিশ উল্টা মুখো হইয়া আসিতেছে, এই পংক্তির পুলিশের মুখ দক্ষিণ দিকে। মিছিলের দিকে—মিছিলটি উত্তর দিকে যাইতেছে—পুলিশ ও উত্তর দিকে যাইতেছে। উল্টা মুখো পুলিশের পংক্তি আমার সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিল—কিছু অংশ ফাঁকা তারপর পনেরো বিশ জন সাধু লাঠি, তলোয়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে যাইতেছে, লাঠি তলোয়ার হাতে সাধুদের পরনে কৌপিন মাত্র সম্বল। কেহ কেহ কৌপিনের পিছন দিক খুলিয়া দিয়াছেন, সামনে ভাঁজ করা একটু বস্ত্রখণ্ড—পিছনে কোন আভরন নাই। চারিদিকে দর্শকের কোলাহল। লাঠিধারীদের পিছনে পিছনে নাগার্চি দল বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছে। রাস্তার পাশে দাড়ানো দর্শক থেকে থেকে মহানাদ দিতেছেন, "জয়; বাবা অমরনাথ জী কী জয়, জয়, জয় ছাড় শ্রীঅমরনাথ জী—জয়, জয় শঙ্কর—জয় শঙ্কর" আবেগে উদ্বেলিত জনতা। চিৎকার করিতেছে, লাফাইতেছে। একহাত উপরে উঠাইয়া কে কার চেয়ে জোরে মহানাদ দিতে পারে তারই সোল্লাস প্রতিযোগিতা যেন। ধীরপদক্ষেপে কয়েক জন কৌপিন ধারী সাধু আমি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছি সে স্থানটি অতিক্রম করিতেছেন—তাঁহাদের দুই জনের কাঁধে দুইটি ছড়ি মনে হয় রূপার তৈরী বেশ বড় ও মোটা। একসাধুর কাঁধে একটি ত্রিশূল, ত্রিশূলটি ছড়িগুলি হইতে ও প্রায় দেড় হাত বড়, একসাধুর কাঁধে পতাকা দণ্ড—দণ্ডের শীর্ষদেশে পতাকা।

এ সাধুদের পিছন পিছন প্রচুর সন্ন্যাসী, মিছিল করিয়া আসিতেছেন। মিছিলে সন্ন্যাসীগণ আবার কৌপিন মাত্র সম্বল নয়। গায়ে গেরুয়া কম্বল, কেহ কেহ কম্বলটি ভাজ করিয়া এক কাঁধে ঝুলাইয়া লইয়াছেন। সন্ন্যাসীর মিছিলে শৃঙ্খলা ছিল, পুলিশ মিলিটারীর মিছিলের মত শৃঙ্খলা অবশ্য নয়, তবু বলিতেছি সন্ন্যাসীর মিছিলে শৃঙ্খলা ছিল।

উত্তর দিকে দৃষ্টি দিয়া দেখিতেছি ছড়ির মিছিলের অগ্রভাগ—গুরুদ্বারা সংলগ্ন মাঠে প্রবেশ করিতেছি। গুরুদোয়ারা ও গোরী শংকর মঠের মধ্যবর্তী খালী ময়দানে মিছিলের অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়াছে। আমার সম্মুখ দিয়া ঝাণ্ডাও ছড়ির পিছন পিছন প্রায় পাঁচ—ছয় শত সন্ন্যাসী সুশৃঙ্খলভাবে ঐ ময়দানে প্রবেশ করিল। এই পাঁচ ছয়শ সন্ন্যাসীর পিছন পিছন প্রায় আড়াই তিন হাজার সন্ন্যাসীর পূর্বোল্লেখিত ময়দানে শৃঙ্খলার সহিত প্রবেশ করার পর সাধু সন্ন্যাসীগণের শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সন্ন্যাসীগণের মধ্যে একটা দৌড়াদৌড়ি—প্রতিযোগিতা যেন—শুরু হইয়া গেল।

রাস্তার পাশে বেশী সুবিধা জনক গাছের নিচেকার আগে কে স্থান দখল করিতে পারে। বড় রাস্তার দুই পাশে আর কত লোকের জায়গা হয়? প্রথম গাছের নিচের স্থান—তারপর গাছ ছাড়া এমনই খালি স্থানে—নির্ভেজাল নীল আকাশের নিচে—সন্ন্যাসীগণ আশ্রয় লইল। রাস্তার যে অংশের দুই পাশে সন্ন্যাসী ছিল সে অংশটির শুরু যেখানে পাহাল গামের দোকান বা ফুটপাত শেষ হইয়াছে, সেখান হইতে গোরীশঙ্কর মঠ পর্য্যন্ত। এরূপভাবে প্রায়—পাঁচ শত সন্ন্যাসী আশ্রয় লইয়াছেন। রাস্তার পাশে অবস্থানরত সন্ন্যাসীগণ আবার ছোট ছোট দলে বিভক্ত। প্রতি দলে একজন প্রধান আছেন। কোন প্রধানের চেলার সংখ্যা তিন, কাহারও হয় ত বা ত্রিশ, বাদ বাকী প্রায় দুই আড়াই হাজার সন্ন্যাসী গৌরীশঙ্কর মঠ, ঘুরিয়া মাঠ—ময়দান ও গুরুদোয়ারার পিছনের নালার পশ্চিম দিকে বেশ বড় খালি ময়দানে যাইতেছেন। এ খালি ময়দানের পশ্চিম সীমানা লীডার নদীর পূর্ব তীর পর্য্যন্ত। পূর্ব দিকে নালা, দূর হইতে উঠিয়া এই ময়দানে বহু তাঁবু টাঙানো হইয়া রহিয়াছে, মনে হয় গত রাত্রে এখানে সাধুদের আগামী দল বা অ্যাডভান্স পার্টি তাঁবুগুলি টাঙাইয়াছে।

ছড়ি মিছিল সকাল ১০ টায় শুরু হইয়াছে। সাড়ে দশটায় আগেই বিপুল সংখ্যক সাধু—সন্ন্যাসী সুন্দর যে যার জায়গায় আস্তানা লইয়াছেন। এর মধ্যে কেহ কেহ সম্মুখে ধুনি জ্বালাইয়াছেন। অনেকে এরই ছোট কল্কিতে গাজা

বা মহারাজের তামাক চড়াইয়া লবাটান দিতেছেন। প্রসাদ করিয়া কল্কিটি সঙ্গী সাধু—শিষ্যের হাতে কিংবা নিকটে বসা কল্কি প্রত্যাসী ভক্তের হাতে দিতেছেন। কোন সময় হয়তো শিষ্যের হাত ঘুরিয়া কল্কিটি ভক্তের হাতে হাতে আসিতেছে।

না, এমন করিয়া দেখা সম্ভব নয়, আগে প্রস্তুত হই। বুঝিলাম ছড়ি মিছিল সামান্য জিনিস নয়, কুম্ভমেলার পর এত সন্ন্যাসী একসাথে দেখি নাই।

১৯৭৭ সালে এলাহাবাদ কুম্ভমেলায় ছিলাম, ১৯শে জানুয়ারী মৌনী অমাবস্যায় শেষরাতে সংগমে স্নান করি, সে দিন, ঐ এক দিনেই প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সংগমে এক কোটি ত্রিশ লাখ তীর্থ যাত্রী পুণ্যস্নান করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সময়ে কুম্ভমেলায় দুই—আড়াই কোটি গৃহী ছিলেন আর সাধুর সংখ্যা ঠিক বলিতে পারিব না—তবে বেশী হয় তো লাখ সোওয়া লাখ সন্ন্যাসী, আর এখানে পাহালগামের আড়াইহাজার গ্রামবাসী ভারতের বিভিন্নপ্রান্তের সাত আট হাজার তীর্থ যাত্রী এবং তিন হাজার সন্ন্যাসী, একটি ছোটখাট কুম্ভমেলা, কুম্ভমেলা হইতে এখানে লোকসংখ্যার আনুপাতিক সন্ন্যাসির সংখ্যা অনেক বেশী।

না, আমি কোথায়ও যাইতেছি না, এ ছাড়ি যতদিন এখানে আছে—ততদিন একটা মিনি কুম্ভমেলা ভাবও থাকিবে। আমিও আছি, ছড়ি চন্দনবাড়ীর পথে রওয়ানা হওয়ার পর আমি শ্রী নগরের পথে রওয়ানা হইব। এখন রাস্তা হইতে গুরুদোয়ারাতে ফিরি, সকালের রৌদ্রে পূবমুখো প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে বেশ গরম লাগিয়াছে। গামছায় গালের সাবান মুছার জন্য গাল চড় চড় করিতেছে, দোতলায় উঠার আগেই ট্যাপের জলে মুখ ধুইলাম, মাত্র গতকাল বিকালে সেলুনে মুখ কামাইয়াছি, দাড়ি বড় হউক, যাবে কোথায়? আমার গালেই তো থাকবে।

নিজের জিনিষপত্র গুছাইয়া অসময়ে কতক্ষণ বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতেছি আজ পরীক্ষা, আজ আমার পরীক্ষা! কতদিন বন্ধু বান্ধবের সহিত গল্পছলে রস সৃষ্টির জন্য বলিয়াছি—তোমরা বড় জোর বি এ পাস এম এ পাশ শুনিয়াছ—নিজেকে দেখাইয়া বলিয়াছি আমাকে দেখ—সাধুপাস আজ আমার পরীক্ষা, সাধু পাস—এর পরীক্ষা।

নবম অধ্যায়

২১ শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, দুপুর। আমি সাধু সঙ্গ করিতেছি। এখন হইতে ২৩ শে আগষ্ট সকাল পর্য্যন্ত ঘটনাগুলির বর্ণনায় কিছু হেরফের ঘটিতেছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে ধারায় একটি ঘটনার পর অন্য আর একটি ঘটনা পর পর বর্ণনা করিয়াছিলাম, তাহাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছি।

আমার মির্জাপুরী সাথীগণ কেহ আজ, কেহ কাল, কেহ পরশু শ্রীনগর গিয়াছেন, আজ বিকালে সীয়ারাম মুনীম্ স্ত্রীসহ এখানে আসিয়াছেন। সীয়ারামের গলার স্বর সম্পূর্ণ বসিয়া গিয়াছে। সীয়ারাম আসার পর গোলাম মহম্মদকে মজুরী দিই।

পরদিন গোলাম মহম্মদের সঙ্গে আবার দেখা। এখন তার সাথে আমার আর কোন পয়সার সম্পর্ক নাই। প্রায় পাঁচ কেজি আখরোট আমাকে দিয়া বলে, "তোমার ছেলেমেয়েদের জন্য আমার সামান্য উপহার।" আমাকে তখন কুম্ভমেলার নেশায় পাইয়াছে।

ঠিক আছে। একটা ভাঙ্গ।

একটা আখরোট ভাঙ্গার পর ভিতরের শাঁস অংশ মুখে দিয়া বলি,

গোলাম মহম্মদ, ঠিক আছে, যথেষ্ট। আমি ত খাইলাম। এবার তোমার আখরোট তুমি নিয়াযাও। আর শোন, আমার ছেলেমেয়েকে দিতে হইলে তোমাকে অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হয়। আগে বিয়ে করি, তারপর ছেলেমেয়ের প্রশ্ন।

সেদিন দুপুরে গোলাম মহম্মদ ও আরও দশ বার জন কুলী গুরুদোয়ারার বিপরীত দিকে বড় গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর অলস ভাবে শোওয়া বসা অবস্থায় ছিল। তাহাদের সঙ্গে আমি অনেকক্ষণ গাছের ছায়ায় নরম ঘাসের উপর শুইয়া এই কুম্ভমেলার ঘুরাঘুরি জনিত পরিশ্রম দূর করিতেছি। সরকারী আদেশে আপাততঃ যাত্রা স্থগিত আছে। হয়ত এখন চন্দনবাড়ী যাওয়া যায়, তবে কুলী বা ঘোড়া

পাওয়া যাইবে না। আর যদি কোন উপায়ে কুলী যোগাড় হয়ও, তবে নিশ্চিত থাকিতে পারেন, সে কুলী রেজিষ্টার্ড নয়।

আমার প্রশ্নের উত্তরে তাহারা নিজেদের মধ্যে আলাপ করিয়া পাহলগাম ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের যে বর্ণনা দিয়াছে, তাহা নিম্নরূপ, –

পাহালগামের লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। উত্তরের গ্রামের নাম 'ফ্রিসলোন,' লোকসংখ্যা আটশত হইতে একহাজার। উত্তর পশ্চিমে 'লারিপুরা' লোকসংখ্যা ছয় হইতে আটশত। দক্ষিণ—পশ্চিম 'মহামল' খুব ছোট গ্রাম; লোকসংখ্যা দুইশতের বেশী নয়। দক্ষিণে 'তীর্থমরণ' প্রায় হাজার খানেক গ্রামবাসী। তারপর বাকুল, বেশ বড় গ্রাম, লোকসংখ্যা প্রায় চার হাজার। না, পূব দিকে কোন গ্রাম নাই। তবে দক্ষিণ দিকে, একটু দূরে, দক্ষিণ-পশ্চিমও বলাযায় 'লিক্রু' নামে একটি গ্রাম আছে, লোকসংখ্যা প্রায় আটশত। লিক্রুর পর 'গনেশবাল; ছোটগ্রাম, লোকসংখ্যা চার শতের মত।

তাহারা জানাইল, এ সকল গ্রামের সমস্ত অধিবাসী মুসলমান। ছড়ি যাত্রা তাহাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। সবাই ছেলেমেয়ে সহ এ উৎসবে ভাগ লয়। বাস্তবে তাহাই দেখিতেছি। খেলায় সবাই আনন্দ করিতেছে। ছোটদের বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দ। ছেলের দল হয়ত এইমাত্র পাপড় ভাজা খাইল, পর মুহূর্ত্তে অন্য দোকান হইতে চানাচুর খাইতেছে।

এখানে দেখিলাম সাধু সেবার জন্য বাহির হইতে বিভিন্ন প্রতিস্থান প্রচুর খাবার আনে। অনেকে আবার সুন্দর শক্ত কাগজের প্যাকেটে। ছেলেরা খাবারের গাড়ী দেখিয়া বুঝে। ভীড় লাগায়। সাধুদের গরজ যেন কম। খুব কম সাধুই গাড়ীর নিকট যান। যাঁহারা বিতরণের দায়িত্বে আছেন, তাঁহারা সাধুদের নিকট আসিয়া প্রনাম করিয়া জিজ্ঞাসা করেন দিবে কিনা; সম্মতি পাইলে তবে দেন।

এরূপ কত দৃশ্য। কে যেন ঠিক করিয়াছেন আজ বাবাজীদিগকে একটু পাঁকুড়া খাওয়াইবেন। পাঁকুড়া গরম রাখা কঠিন। এর মধ্যে ঠেলায় করিয়া প্রায় তিনমন গরম পাঁকুড়া লইয়া হাজির। পর্বত প্রমান পাঁকুড়া, সঙ্গে ছোট টুকরা করিয়া কাগজ ও আনিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে পাকুড়ার সামনে লম্বা লাইন। লাইনে ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতী, সন্তান কোলে গৃহবধু, বৃদ্ধা বৃদ্ধা

সবই আছে। মনে হয় নিজ [illegible] [illegible] [illegible] কয়েকজন [illegible] আছেন।

আর একটি ঘটনার বিবরণ দেওয়ার পর সাধু প্রসঙ্গে আসিতেছি। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আমার গায়ে সবুজ জ্যাকেট, কিরূপ একটা 'এয়ার ফোর্স পার্সোন্যাল এয়ার ফোর্স পার্সোন্যাল' ভাব। অনেকে আমাকে দেখিয়া ধরিয়া লয় আমি ইংরেজি জানা লোক। এখানে অনেকবার দোভাষীর কাজ করিতে হইয়াছে। মনে হয় বিশ্বের সমস্ত দেশ হইতেই, সাংবাদিকের ভাষায় যাহাকে 'কভার' বলে, এ ছড়ি যাত্রার বিবরণ কভার করার জন্য লোক আসিয়াছেন। তা ছাড়া ও আছে দূরদর্শনের বা টিভির ছবি তোলার জন্য, বড় বড় ক্যামেরা কাঁধে প্রচুর লোক। শ' খানেক বা তারও বেশী ইউরোপীয়ান বা অ্যামেরিকান। ছোট জায়গা, সব সময় সাধু সঙ্গের সহিত সাহেব সঙ্গও হইয়া যাইতেছে, এ সাহেবদের অনেকেই আমাকে দোভাষীর কাজ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি প্রশ্নটির ইংরেজি হিন্দীতে আবার জবাবটি হিন্দী হইতে ইংরেজিতে করিয়াছি। কোনসময় হয়ত দোকানীর অনুরোধে প্রশ্নটি হিন্দী হইতে ইংরেজিতে ও জবাবটি ইংরেজি হইতে হিন্দীতে করিয়াছি।

এ অবস্থায় একবার উল্লেখযোগ্য দোভাষীর কাজ করিয়াছি। দুই অংশীদারের চা এর দোকান। একজন কাশ্মীরী, অন্যটি, মনে হইল, নেপালী। কাশ্মীরী যুবকটি কাশ্মীরী ভিন্ন অন্য ভাষা জানে না, নেপালী যুবকটির হিন্দীও কাশ্মীরী উভয় ভাষার উপর পর্যাপ্ত দখল আছে। চা এর দোকান এক ফরাসী দম্পতি। মহিলাটি ফরাসী ভাষা ভিন্ন ইংরেজি মানে না, পুরুষটি ইংরেজি জানা। মধ্যে আমি। মহিলার সব বিষয়ে প্রচণ্ড কৌতুহল। সামান্যতম জিনিষ সম্বন্ধেও জানিতে চান। মহিলাও কাশ্মীরী যুবকের মধ্যে আলাপ। মহিলার ফরাসী, সঙ্গী সাহেব ইংরেজিতে আমাকে বলিতেছেন, আমি হিন্দীতে নেপালীকে নেপালী কাশ্মীরী ভাষায় কাশ্মীরী যুবককে, প্রশ্নটি ভাষান্তর করিয়া পৌঁছিয়া দিতেছে। কাশ্মীরী যুবক কাশ্মীরী ভাষায় প্রশ্নের জবাব নেপালীটিকে দিল, নেপালীযুবক কথাগুলি হিন্দীতে আমাকে বলিল, আমি ইংরেজিতে সাহেব কে, সাহেব ফরাসীতে মেমকে, একটি কথোপকথনে তিনজন দোভাষী। প্রথমে ফরাসী ভদ্রলোক, দ্বিতীয় আমি, তৃতীয় স্থানে নেপালীযুবক।

আর একটি ঘটনা। আমার সত্যরক্ষার খাতিরে বলিতে হইতেছে, না হইলে

ক্যার খোলাপ হইবে। এ কাহিনীর প্রথম অংশে কথা দিয়াছিলাম, রক্ষিতের মোজা বিসর্জন কাহিনী শুনাইব। পথের অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনার সাথে রক্ষিতের মোজার কাহিনী কিছু কিছু বলা হইয়াছে। এবার মোজা বিসর্জন বা শেষকৃত্যের কাহিনী।

২২ শে আগষ্ট, ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি গুরুদোয়ারার লেট্রিনে লম্বা লাইন। আজ পাহাল গামের লোকসংখ্যা তুঙ্গে উঠিয়াছে। সম্ভব অসম্ভব সব স্থানে মানুষ রাত কাটাইয়াছেন। এমন কি দূরবর্তী স্থান হইতে পরিবারের সবাই ছড়ি, ছড়ি মিছিল, সাধু সন্ন্যাসী দেখার জন্য এরূপ প্রস্তুতি লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন, যেন, প্রয়োজন বোধে, ট্রাকের বস্তিতে বিছানা পাতিয়া ঘুমানো যায়। ফলে আজ সকালে নদীতীরে বা যেখানে সেখানে যে দৃশ্যটি রচিত হইতেছে, আশা করি গুণী পাঠক, ঠিকই আন্দাজ করিতেছেন, তদুপরি, গুরুদোয়ার, ছড়ির সঙ্গে সন্ন্যাসী, গৌরী শঙ্কর মঠে আস্তানা লইয়াছেন এরূপ সাধু-সন্ন্যাসী ও গৃহীর মিলিত লোকসংখ্যা কম করিয়াও সহস্রাধীক। এই তিন আশ্রয় স্থলের পিছনে নালা। যে নালা সম্বন্ধে আগে উল্লেখ করিয়াছি। এখন বিস্তারিতভাবে বলিলে বলা যায়, নালাটি বেশী হয় ত একহাত পাশ, একহাত গভীর, স্বচ্ছ জল। দ্রুতগতিতে দক্ষিণদিকে বহিয়া যাইতেছে। নালার পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড বড় মাঠ। মাঠে অসংখ্য তাঁবু। প্রতি তাঁবুতে প্রচুর লোক। এ মাঠের তাঁবুতেই কম করিয়াও তিন চার হাজার লোক রাত কাটাইয়াছেন। এখন, সকালে নালার দুই পারের দৃশ্যটি কি? আমি দেখিয়াছিলাম। বেশ দার্শনিকচিত উদাস দৃষ্টিতে বা দেখিনা ভাব করিয়া অনেকক্ষণ দেখিয়াছিলাম। আমাকে ছোটলোক বলুন আর রুচিবর্হিভূত ব্যক্তি বলুন ঘটনা এই, আমি দৃশ্যটি দেখি।

ভারতের নানা প্রান্তের লোক এখানে আসিয়াছেন। পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গের লোক এই এই নালা পারে বসিয়া পড়িতেছেন। ছেলে মেয়ে, যুবক-যুবতী, পৌঢ়-পৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সব বয়সের লোক আছেন। উল্কি আঁকা হাতে ঘটি ধরিয়া ও লম্বা ঘোমটা টানিয়া হয়ত এক মহিলা, তুলনামূলক নির্জন খালপারে এইমাত্র বসিয়াছেন; দেখিতে দেখিতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুধুমাত্র কম্বল গায়ে, না কৌপীনটিও নাই, খুলিয়া দূরে রাখিয়াছেন, এক সন্ন্যাসী বাবাজী দ্রুত আসিয়া মহিলার নিকট বসিয়া গিয়াছেন। নালা পারে বসা লোকগুলিকে দেখিতেছি আর ভাবিতেছি, এঁরা

নানা ভাষাভাষী লোক, হিন্দু, শিখ, মুসলমান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম মত অবলম্বী। পরিধানে কাহারও লুঙ্গি কাহারও প্যান্ট, কাহারো পাজামা। কিন্তু সবাই মনোযোগের সহিত এক কাজে এখানে মিলিত হইয়াছেন। আমার ভিতর অতুলপ্রসাদ গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছেন।

"নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধাণ
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।"

আমি এই মহান মিলনক্ষেত্রে রক্ষিতের মোজা আনুষ্ঠানিক বিসর্জন দিই। রক্ষিতের কৃপায় অমরনাথের হাঁটা পথে যে দুর্ভোগ পাইতে হইয়াছে, তাহাতে শুধু শারীরিক নয়, মনেও কোথায় যেন ব্যাথা পাইয়াছিলাম। আজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত মর্যাদায় সেই মোজা জোড়াকে বিসর্জন দিয়া মনের ব্যাথা দূর করিলাম। শারীরিক ব্যাথা আগেই গিয়াছিল, এখন মানসিক ব্যাথা দূর হওয়ায় বেশ তৃপ্তি পাইলাম।

———

দশম অধ্যায়

বেলা ১১টা নাগাদ ছড়ি ও ঝাণ্ডা নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত হইল। ছড়ি ও ঝাণ্ডা একটি আড়াই হাত উচু পাকা বেদীর উপর। বেদীটির দুই পাশে তিনটি করিয়া ছয়টি ও সামনে পিছনে চারটি করিয়া আটটি প্রায় আড়াই তিন হাত উচু পিলার। পিলারগুলি তিন প্রস্ত মোটা লোহার শিকদ্বারা যুক্ত। একমাত্র সম্মুখদিকে প্রবেশ পথ। এপথে কাঠের দুই পাল্লা দরজা। বেদীটি আয়ত ক্ষেত্রকার। পূর্ব উত্তর কোণের পিলারের সাথে দুইটি পতাকা দণ্ড বাঁধা আছে। দণ্ড দুইটি আবার একসাথে বাঁধা। একটি বাঁশের ও অন্যটি লোহার। দণ্ডশীর্ষে পতাকার সঙ্গে ফুলের তোড়া বাঁধা আছে—গাঁদা ফুলই বেশী।

বেদীর উপর যথেষ্ট উঁচু করিয়া একটি খুব বড় ছত্রাকার তাঁবু টাঙ্গানো হইয়াছে তাঁবুটি বা ছাতাটি বেদীর চার কোণার পিলারের সঙ্গে মোটা দড়িতে টানা দেওয়া আছে। পর পর নীল ও লাল কাপড়ের টুকরায় তাঁবুটি তৈরী করা হইয়াছে। তার মধ্যে চার সাড়ে চার হাত লম্বা রূপার ত্রিশূল এবং তিন সাড়ে তিন হাত লম্বা—উপরের অংশ মোটা রূপার দুইটি দণ্ড বা ছড়ি। উপর হইতে নিচে পর্য্যন্ত দণ্ড দুইটিতে কি যেন লেখা আছে। সবগুলি অর্থাৎ ত্রিশূল ও দণ্ড একসঙ্গে বাঁধা আছে। সঙ্গে চামর, চামরের বাঁটটি রূপার তৈরী। উপর হইতে নিচ দিক করা। সবগুলিতে কি সুন্দর সুন্দর ফুলের মালা জড়ানো। এর সঙ্গে বাঁধা আছে লাল রং এর ওড়না বা ঐ জাতীয় কিছু। আবার নোটের তৈরী মালাও আছে। এই নোটের তৈরী মালাতে আবার দুই টাকার নোটের তৈরী মালার সংখ্যা বেশী। কোন কোন মালায় সব দুই টাকার নোট—লকেট হিসাবে কয়েকটি কুড়ি টাকার নোট, সাধু সন্ন্যাসী গেরুয়া রং পছন্দ করেন, তাই হয় ত দুইটাকার নোট বা কুড়ি টাকার নোটের এত ছড়াছড়ি।

বেদীটি বেশ বড়। ইচ্ছা করিলে বেদীর উপর ছাতা আকৃতি তাঁবুর ঢাকা অংশ বাদ দিয়া ও চার পাশে পনেরো কুড়ি জন লোক স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। বেদীর উপর "থ্রি নট থ্রি" রাইফেল হাতে খালি পায়ে ও সম্পূর্ণ পোশাক গায়ে পুলিশ পাহারা দিতেছে।

বেদীর সম্মুখ দিকে দুই পাল্লা কাঠের দরজার সঙ্গে বেদীর উপর যাওয়ার সিঁড়ি। দর্শনার্থী প্রথমে সিঁড়ির নিকট আসিয়া, সিঁড়ি হইতে ধুলা লইয়া কপালে বুলাইতেছেন, তারপর সিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া ছড়িকে প্রনাম করিতেছেন, নিকটে রক্ষিত থালায় প্রণামী দিতেছেন, একজন অল্প বয়স্ক সন্ন্যাসী নিকটে বসা আছেন। তিনি প্রত্যেক দর্শনার্থীর কপালে বিভূতি তিলক পরাইয়া দিতেছেন। সন্ন্যাসীর নিকট রক্ষিত বারকোষে আছে প্রসাদ, আপেলের টুকরা, কলা ইত্যাদি। তিলক দানের পর বারকোষ হইতে একটু প্রসাদ দর্শনার্থীর হাতে দিতেছেন। দর্শনার্থী প্রসাদ হাতে বেদীর উপর ছড়ি পরিক্রমা শেষ করিয়া আবার একই সিঁড়ি দিয়া বেদী হইতে নামিয়া আসিতেছেন।

আমি সবকিছু অর্থাৎ দর্শনার্থী, সাধু সন্ন্যাসী, তাঁবু, রান্নার স্থান বা তাঁবু, মোহন্ত মহারাজ ও মোহন্ত মহারাজের তাঁবু, চারিদিক দেখিতেছি, সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখিতেছি, আর আমার খাতায় বিবরণ সমূহের সংক্ষিপ্ত সার লিখিয়া রাখিতেছি। আবার এরই মধ্যে কোন কোন সন্ন্যাসীর সাথে আলাপ জমাইতে চেষ্টা করিতেছি। প্রায় সকলেই ব্যস্ত, খুব একটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। দেখিলাম ছড়িকে উপযুক্তভাবে স্থাপন করিয়া দর্শনার্থীর জন্য উন্মুক্ত করা হইয়াছে, রান্না কোন সময় শুরু হইয়া গিয়াছে। সাধু সন্ন্যাসী যে যার কাজে ব্যস্ত। কোন কোন দর্শনার্থী ছড়ি প্রনামের পর মোহন্ত মহারাজকে প্রনাম করিতেছেন, তাঁর আশীর্বাদ নিতেছেন, কিন্তু তখনও দশনামী সন্ন্যাসীদের এই অস্থায়ী আখড়ার মূল গেইট তৈয়ার হইতেছে।

আমি ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলিয়া গেলাম। তখন দুপুর আড়াইটা। সব দর্শনার্থীকে বাহিরে যাওয়ার জন্য বলা হইতেছে। এক সন্ন্যাসী আমাকেও বাহিরে অর্থ্যাৎ সদ্য তৈরী গেইটের বাহিরে রাস্তায় যাওয়ার জন্য বলিলেন। আমি মোহন্তের তাঁবুর নিকট মোহন্ত মহারাজের মুখ বরাবর দাঁড়াইলাম। তিনি হাসিয়া আমাকে বাহিরে যাওয়ার জন্য হাত দিয়া ইসারা করিলেন। বাহির হইয়া রাস্তায় আসিলাম। চিন্তা করিতে লাগিলাম মোহন্ত মহারাজ হয়ত আমাকে নির্দিষ্ট করিয়া কিছু ইঙ্গিত করেন নাই। হয়ত সবাইকে এরূপ ইঙ্গিত করিতেছেন। হয়ত মোহন্ত মহারাজের এরূপ অনুকূল হাসি সবাই পাইতেছে। আমাকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার বা কৃপা করার কোন কারণ নাই।

আমরা সব দর্শক বাহির হওয়ার পর যে বেদীতে ছড়ি আছে সেই বেদী হইতে

এক সন্ন্যাসী সর্পাকৃতি বক্রবাঁকা এক বিউগল বাজাইলেন। বিউগলটি আবার গেরুয়া কাপড়ে জড়ানো—বিউগলটিকে ফুলের মালা পরানো হইয়াছে। বিউগল এর আওয়াজের বা আহ্বানের সাথে সাথে প্রায় পাঁচ ছয় শত সন্ন্যাসী বেদীর সম্মুখে ছয় পংক্তিতে ঘাসের উপর বসিয়াছেন। কোন কোন সন্ন্যাসীর পরনে শুধু কৌপীন মাত্র সম্বল, সর্ব শরীরে ছাইমাথা। কাহার ও হয়ত বা সর্ব শরীরে কম্বল জড়ানো। সন্ন্যাসীগণের মধ্যে পোশাকে বৈচিত্র থাকিলেও পংক্তিতে বসার ব্যাপারে কোন বাছ বিচার ছিলনা, অর্থাৎ কৌপীন ধারীর সঙ্গেই হয়ত সর্ব শরীরে সুন্দর গেরুয়া পোশাক পরা সন্ন্যাসী বসিয়াছেন। কথাবার্তা, হৈ হল্লা, গোলমাল বড় একটা নাই। পাতে পাতে খাবার পরিবেশন হইতেছে। তাঁহারা সম্মুখে খাবার রাখিয়াও খাওয়া শুরু করিতেছেন না।

আমি আশা করিতেছিলাম সবার পাতে খাবার দেওয়ার পর পাঁচ ছয় শত কণ্ঠের সম্মিলিত স্বরে বেদ-মন্ত্র বা ঐ জাতীয় কিছু উচ্চারিত হইবে। তারপর শুরু হইবে খাওয়া। আমার মত শত শত লোক দূর হইতে সন্ন্যাসীর খাওয়া দেখার জন্য একত্রিত হইয়াছিল। আমার নিকট হইতে তাঁদের শেষ পঙক্তি বা আমার নিকটতম পঙক্তিটির দূরত্ব বড়জোর দশ বার হাত। অতএব পাতে কি কি দেওয়া হইতেছিল তাহা ভালভাবেই দেখিতেছিলাম। দেখিলাম দুই প্রকারের ভাত—একটি হয়ত সাদা পোলাও জাতীয় কিছু, রুটি তরকারী, ডাল, হালুয়া ইত্যাদি বেশ কয়েকপদ। একটু একটু করিয়া দেওয়া নয়, বেশ ভাল পরিমান খাবার প্রত্যেক পাতে দেওয়া হইয়াছে। শেষ পাতে পরিবেশনের পর কি একটা ইসারা বা শব্দের (বিউগল ধ্বনি নয়) সবাই একসাথে খাইতে শুরু করিলেন; কোনরূপ মন্ত্র তন্ত্রের ধার দিয়াও কেহ যান নাই।

সন্ন্যাসীগণ খাওয়া শুরু করার পর পরিবেশনরত সন্ন্যাসীগণ, কেহ টুকরী, কেহ বালটি, কেহ বা বারকোষে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সহ পংক্তিগুলির সম্মুখ দিয়া কিসব আওয়াজ করিতে করিতে হাঁটিয়া যাইতেছেন, যদি ভোজনরত কেহ কিছু চায় তাহা দিবার জন্য। পরিবেশনরত সন্ন্যাসীগণের কেহ কেহ হয়ত বলিতেছেন রাম, রাম। কেহ হয়ত 'রাম' চাহিল; তাঁহার পাতে এক মুষ্টি 'রাম' দেওয়া হইল, তিনি একমুষ্টি রাম খাইলেন। কেহ বলিতেছেন বৈকুণ্ঠি বৈকুণ্ঠি; কেহ বলিতেছেন 'রামরস' 'রামরস'; কেহ হয়ত 'ফুচকরাম' ফুচকরাম করিতেছেন।

আর তাহাদের সীমানার বাহিরে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছি—সাধু সন্ন্যাসী এত রাম খায়!

দশনামী সন্ন্যাসীর ভোজনের সময় দুই সন্ন্যাসীকে সদা তৈরী মূল বা প্রধান ফটকের নিকট পাহারা রত দেখিলাম। কাহাকে ও ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছেনা। ছড়ি দর্শনার্থীর ভীড় ফটকের বাহিরে জমিতেছিল। ঐ ভীড়ের সবাই আগ্রহের সহিত সন্ন্যাসীগণের ভোজন দেখিতেছিলেন।

এরই মধ্যে থালা হাতে কিছু খাবার পাওয়ার আশায় এক বিদেশীনি হিপী মহিলা শেষ পংক্তির নিকট কি করিয়া যেন বসিয়া পড়ে। শুধুমাত্র কৌপীন সম্বল এক সন্ন্যাসীর মুখে সে সময় যে ইংরেজি শুনিয়াছি সে ইংরেজির উচ্চারণ শুনিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, হয়ত এই কৌপীন ধারীর সবটা শিক্ষা কাল কোন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে কাটাইয়াছেন, আর না হয় তিনি বহু বৎসর পাশ্চাত্যে কাটাইয়াছেন। ভারতীয়দের ইংরেজি উচ্চারণ সচরাচর এরূপ হয় না। "হিপিস্ আর নট এলাউড্"—হিপী মহিলা সীমানার বাহিরে আসিলেন। পরে দেখিয়াছি সাধুদের খাওয়া শেষে এই হিপী মহিলাকে তাঁহারা যত্নপূর্বক খাওয়াইছিল।

একসময় সন্ন্যাসীগণের ভোজন শেষ হইল। আমি অন্যদিকে সাধু সঙ্গের আশায় পা বড়াইলাম।

এখন পর্য্যন্ত সাড়ে তিন ঘণ্টা মিনি কুম্ভমেলায় কাটাইলাম। এতক্ষণের ফসল ছড়ি যাত্রার পূর্ণ বিবরণ উদ্ধার। সবটাকে বলা হয় "ছড়ি মুবারিক যাত্রা শ্রী স্বামী অমরনাথ জি" বা 'ছড়ি শ্রীঅমরনাথ জি'। ১৯৮০ সালের বা ২০৩৭ বিক্রম সংবৎ এর ছড়ি যাত্রার কার্য্যক্রম নিম্নরূপ ছিল।

তাং	বার	তিথি	সময়	বিবরণ
১১।৮।৮০	সোমবার	প্রতিপদ	সকাল ৬টা	শঙ্করাচার্য্যের পূজার জন্য যাত্রা ও দশনামী আখাড়ায় প্রত্যাবর্তন।
১২।৮।৮০	মঙ্গল	দ্বিতীয়া	,, ৬টা	হরি পর্বতে শারিকা ভগবতীর পূজায় যাত্রা ও দশনামী আখাড়ায় প্রত্যাবর্তন।
১৩।৮।৮০	বুধ	তৃতীয়া	,, ১০টা	পূজন তথা স্থাপন শ্রীছড়ি দশনামী আখাড়া

১৪।৮।৮০	বৃহস্পতি	চতুর্থী	......	বিশ্রাম দশনামী আখাড়া
১৫।৮।৮০	শুক্র	চতুর্থী	......	বিশ্রাম দশনামী আখাড়া
১৬।৮।৮০	শনি	পঞ্চমী	সন্ধ্যা ৬টা	সন্ধ্যা ৬টায় দশনামী আখাড়াতে ছড়ি মবারক পূজা ৬-৩০ মি: দুর্গানাগ শুভযাত্রায় হইয়া পাম্পোর যাত্রারম্ভ।
১৭।৮।৮০	রবি	ষষ্ঠি	ভোর ৪টা	অবন্তীপুর হইয়া পাম্পোর হইতে বীজ্ বেহারা।
১৮।৮।৮০	সোম	সপ্তমী	ভোর ১টা	অনন্তনাগ, গৌতমনাগ হইয়া বীজ্ বেহারা হইতে মার্তণ্ড
১৯।৮।৮০	মঙ্গল	অষ্টমী		বিশ্রাম মার্তণ্ড তীর্থ।
২০।৮।৮০	বুধ	নবমী	„ ৪টা	মার্তণ্ড হইতে এস্ মোকাম।
২১।৮।৮০	বৃহস্পতি	দশমী	„ ৪টা	এস্ মোকাম হইতে পাহালগাম।
২২।৮।৮০	শুক্র	একাদশী	......	বিশ্রাম পাহালগাম।
২৩।৮।৮০	শনি	দ্বাদশী	ভোর ৪টা	পাহালগাম হইতে চন্দনবাড়ী।
২৪।৮।৮০	রবি	ত্রয়োদশী	„ ৪টা	চন্দনবাড়ী হইতে ওয়াব জান (শেষনাগ)
২৫।৮।৮০	সোম	চতুর্দশী	„ ৪টা	ওয়ার জান হইতে পঞ্চতরণী।
২৬।৮।৮০	মঙ্গল	পূর্ণিমা	„ ৪টা	পঞ্চতরণী হইতে পবিত্র গুহা পূজা তথা দর্শন শ্রীস্বামী অমরনাথজি; পঞ্চতরণী প্রত্যাবর্তন।
২৭।৮।৮০	বুধ	প্রতিপদ/দ্বিতীয়া	সকাল ৭টা	পঞ্চতরণী হইতে চন্দনবাড়ী
২৮।৮।৮০	বৃহ	তৃতীয়া	„ ৭টা	চন্দন বাড়ী হইতে হইতে পাহালগাম এবং যাত্রা সমাপ্ত।

ছড়ি যাত্রার সময় সূচীর উপর চোখ বুলাইতেছি আর চিন্তা করিতেছি, এক বেলাতে মেলায় খুব খারাপ ব্যবসা করি নাই। ছড়ি যাত্রার সময় যতো সম্ভব বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। দশনামী বাদে অন্য তিন সাড়েতিন হাজার সন্ন্যাসীর মনোভাব অনেকটা—দেখি না দশনামীগণ কী করেন—এরূপ, একটা জিনিষ পরিষ্কার, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে দশনামীগণ বলা যায়, কুলীন সম্প্রদায় ভুক্ত।

তাঁহারা একই বিষয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন মত দেন। এইসমস্ত মতামত হইতে যথার্থ উত্তরটি বাহির করিতেও যথেষ্ট বা পর্য্যাপ্ত পূর্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। ছড়ি-যাত্রা-সম্বন্ধেও বিভিন্ন সন্ন্যাসী ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়াছেন। সন্ন্যাসীর মতামত আদায় করাও কম ঝকমারির ব্যাপার নয়। আমি কুম্ভমেলায়, সাধুদের সঙ্গে আলাপ জমানোর জন্য বেশ ভাল পরিমাণ গাঁজা লইয়া গিয়াছিলাম। এখানে আমার এরূপ কোন প্রস্তুতি ছিল না। তবে প্রতি বেলায় বেশ কিছু টাকার রেজগী বা খুচরা পয়সা লইয়া সাধু-সঙ্গ করার জন্য বাহির হইতাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পকেট পাতলা হইয়া যাইত। সাধু-সন্ন্যাসী পকেট পাতলা করিতে ওস্তাদ। এক সাধু পয়সা পাওয়ার পর জানাইল আমার কলমটি পাইলে তাঁর উপকার হয়। আমার কলমটিও গেল। পরে ডটপেন কিনিয়াছিলাম।

ছড়ি যাত্রা সম্বন্ধে সবার অর্থাৎ সর্বশ্রেণীর সন্ন্যাসীর মধ্যে, দশনামীগণের মতামত আমার নিকট অনেকবেশী যুক্তিগ্রাহ্যও বিশ্বাসযোগ্য মনে হইয়াছে।

আমার দৃষ্টিতে ভুল থাকিতে পারে একথা স্মরণে রাখিয়াও বলিতেছি দশনামীগণের মধ্যেও স্তরভেদ আছে, মর্য্যাদায় সবাই একস্তরের নন বিভিন্ন দশনামী ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বে আছেন এ সতত্র কথা।

বাস্তবে দেখিলাম দশনামীগণের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে আমার ধারণা যথার্থ। দশনামীদের 'কারবারী' ও "কতোয়াল" এর সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা পূর্ণ সম্পর্কে গড়িয়া উঠে। মূলত তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানাইতেছি:---

প্রতি তিন বৎসর অন্তর অন্তর প্রতি কুম্ভমেলায় ভোটের মাধ্যমে "রামতাপঞ্চ" নির্বাচিত হন, 'রামতাপঞ্চ', দশনামীগণের সর্বেসর্বা বা সর্বাধীনায়ক। সোমবার বাদে তিনি প্রত্যেহ ৩০ কিমি পথ চলেন। তিনি যে দিন যেখানে থাকেন, সেখানে প্রচুর তাঁবুর খাটানোর প্রয়োজন হয়।

'রামতাপঞ্চ' এর পরবর্তী পদটি 'শম্ভুপঞ্চ' এর 'শম্ভুপঞ্চ'। এর পরবর্তী

পদটির নাম 'থানাপতি', থানাপতির দায়িত্ব অফিস ব্যবস্থাপনা বা সেক্রেটারী ও অফিস ম্যানেজার।

তারপর মোহন্ত। মোহন্তের পর একটি স্তরের চারিটিপদ—(ক) কারবারী (খ) কতোয়াল (গ) ভাণ্ডারী (ঘ) পূজারী। এগুলিকে আবার একসঙ্গে "সর্দ্দাস" (বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করুণ সর্দার নয় 'সর্দ্দাস) বলা হয়। সর্বশেষে ব্রহ্মচারী ও নাগাবাবা। তাঁহারা আবার একই স্তরের সন্ন্যাসী।

কারবারীর দায়িত্ব ক্রয় ও হিসাব রক্ষা। কতোয়াল, ভাণ্ডারী ও পূজারীর দায়িত্ব নামেই পরিষ্কার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

ছড়ি যাত্রা সম্বন্ধে মেলায় বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, খোঁজ খবর লইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি, যতখানি খবর উদ্ধার করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নরূপ,—

প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর যাবৎ এ ছড়ি যাত্রা চলিতেছে। একটানা পাঁচ হাজার বৎসর যাবৎ চলিতেছে, এরূপ নহে। মধ্যে মধ্যে অমরনাথের পথ কি করিয়া যেন হারাইয়া যায়। তখন বহু বৎসর কয়েক শতাব্দি ব্যাপি ছড়ি যাত্রা বন্ধ থাকে। আবার নূতনভাবে গুহার রাস্তা আবিষ্কার হইলে, নূতনভাবে ছড়ি যাত্রা আরম্ভ হয়। অবশ্য সাধুদের ভাষায় বলিলে বলিতে হয়—মায়ার ছলনায় অমরনাথের পথ হারাইয়া যায়, আবার বাবার কৃপায় নূতন রাস্তা বা পথ আবিষ্কৃত হয়।

এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথোপকথন,

আচ্ছামহারাজ, এ ছড়ি যাত্রা মানে শেষ গুহাপথ আবিষ্কারের পর হইতে, কত বৎসর যাবৎ চলিতেছে ?

সাত শত বৎসর যাবৎ।

সাত শত বৎসর যাবৎ এত সন্ন্যাসী, এত ভক্ত ছড়ির সাথে গুহায় যাইতেছেন ?

নেহি, কাশী হইতে এত সন্ন্যাসী ছড়ির সঙ্গে থাকিত না। পথে পথে নূতন নূতন সন্ন্যাসী ছড়ি মিছিলের সামিল হইতে তবে গুহা পর্যন্ত তিন কি, কোন কোন বৎসর আরও বেশী সন্ন্যাসী থাকিত।

কাশী ? কাশী কী ?

কাশী বুঝ না ? বেনারস্।

আহ্ হা, কাশী যে বেনারস্ তা ত বুঝি। কিন্তু ছড়ি মিছিলের সঙ্গে কাশী কি সম্বন্ধ ?

তুমি কিছু জান না।

সত্যি, আমি কিছু জানি না, আমি নাবালক, 'না-ম্যারেক' এখন মহারাজ কৃপা করিয়া সব বলুন, আমি লিখি।

আরে, প্রথমে ত কাশীতে ঝাণ্ডা ও ছড়ি থাকিত। কাশী হইতে ছড়ি যাত্রা শুরু হইত। রোজ ছড়ি সহ হাঁটিতে হাঁটিতে, এবং আপনা হইতেই মিছিলটি বড় হইতে হইতে, ঠিক নির্দিষ্ট দিনে, অর্থাৎ শ্রাবণী পূর্ণিমার গুহায় পৌঁছিত। গুহায় পূজা ভজনের পর আবার ছড়ি সহ হাঁটিতে হাঁটিতে এবং আপনা হইতেই মিছিলটি ছোট হইতে আবার কাশীতে ফিরিত। বৎসরের বাকী সময় বাবার ছড়ি ও ঝাণ্ডা কাশীতে দশনামী আখাড়ায় থাকিত।

শুনুন মহারাজ, আমি ঠিক বুঝিতেতেছি না ছড়ি মিছিলটি কি করিয়া গুহা পথে আপনা হইতে বড় হইত আর গুহা হইতে ফিরত পথে আপনা হইতে ছোট হইত।

বাচ্চা, তুমি ত দেখিতেছি একটা আস্ত বেকুব, এ মামুলি কথাটা বুঝিতেছ না? মনেকর, গুহা পথে ছড়ি মিছিল কাশী হইতে প্রতিদিন কিছু পথ অতিক্রম করিতে করিতে অযোধ্যায় আসিল। এখন অযোধ্যা হইতে পাঁচ ছয় শত সন্ন্যাসী ছড়ি মিছিলের সামিল হইল, মিছিলটি আরও বড় হইল না? আবার গুহা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ঐ অযোধ্যার সন্ন্যাসীরা অযোধ্যা আসিলে পর মিছিলটি ছোট হইল না? এমন ভাবেই সমস্ত যাওয়া পথে মিছিলটি বড় হইত, আবার আসা পথে ছোট হইত।

আচ্ছা মহারাজ, আপনি ত কাশী হইতে ছড়ি যাত্রা শুরু হইত বলিয়াছেন, এখন শ্রীনগর হইতে যাত্রা আরম্ভ হয় কেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন শ্রীনগর হইতে যাত্রা আরম্ভ হয়। তবে কাশীর পর কোন সময় পাঠানকোট হইতেও যাত্রা শুরু হইত, আবার পাঠানকোটের পর জম্মু হইতেও ছড়ি যাত্রা শুরু হইয়াছে।

কতভাবে কত সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে চেষ্টা করিয়াছি, কাশী হইতে বা জম্মু হইতে কত বৎসর যাত্রা মিছিল চলিয়াছে? কিংবা শ্রীনগর হইতেই বা কত বৎসর যাবৎ ছড়ি যাত্রা চলিতেছে? কিছুই উদ্ধার করিতে পারি নাই। ভগিনী নিবেদিতার লেখায় দেখিয়াছি—ছড়ি মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ কন্যা (লেখিকা) সহ ইসলামাবাদে গিয়াছিলেন।

আমি একত্র একো আকলে ঘুরিয়াছিলাম। সর্বশ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ জমাইতে চেষ্টা করিয়াছি। অনেকের সাথে আলাপ করিয়াছি। কিন্তু এর মধ্যে একটি মূল বিষয় বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। দশনামী দেওয়া তথ্য অনেকবেশী নির্ভরশীল। আর কোন উপায়ে যদি একবার দশনামীদের 'পাসপোর্ট-ভিসা' সংগ্রহ করিতে পারি তবে আমাকে পায় কে? আমি যে কোন সন্ন্যাসী দলের প্রধানের সঙ্গে অনেক বেশী হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে অনেকটা বন্ধুর মত—আলাপ করিতে পারিব।

অন্য আরেক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে জানিতে পারি শ্রীনগর '.মীরাকদল''—এ দশনামী আখাড়ার একমাত্র যাত্রা সময় বাদে বৎসরের অন্য সময় অমরনাথের ছড়ি ও ঝাণ্ডার পূজা হয়। ঐ আখড়াতে বৎসরের সব সময়েই প্রায় শতাধীক মহাত্মা থাকেন।

শ্রীনগরে যেখানে অমরনাথের ছড়ি ও ঝাণ্ডা থাকে সেস্থানে গিয়াছিলাম। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে পঞ্চমুণ্ড শিবমূর্ত্তি, সুন্দর উঁচু বেদীর উপর স্থাপিত আছে। মন্দিরের দেওয়ালের ভিতর দিকে নটরাজ মূর্ত্তি, একপাশে পার্বতী ও অন্য পাশে গনেশ মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। মন্দির চত্তরের সম্মুখ ফটকে লেখা আছে, "শ্রীমহাদেব গিরি দশানমী আখাড়া ট্রাষ্ট, মাইসুমা, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ জমাইতে পারিতেছি তাঁহার নিকট হইতেই লেখার কিছু না কিছু রসদ যোগাড় করিতেছি আর আমার খাতায় সন্ন্যাসী প্রদত্ত বিবরণ সমূহের সংক্ষিপ্তসার লিখিয়া রাখিতেছি।

সন্ধ্যা নাগাদ আবার দশনামীদের তাঁবু—আস্তানায় আসিলাম। খুব একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আসি নাই। মনের ভাব অনেকটা এইরূপ—দেখি না সন্ধ্যায় সাধু সন্ন্যাসী কী করেন? গৃহীদের জন্যও তিন বেলা সন্ধ্যা করার বিধান। সাধু সন্ন্যাসী কি এ সাধারণ নিয়মের বাহিরে?

আর একটি লোভ ছিল। যদি সম্মিলিত কণ্ঠে স্তোত্র-পাঠ বা ঐ জাতীয় কিছু হয় তবে তাহা শোনা। সংগীত সম্বন্ধে কত কথাই না প্রচলিত আছে। যে সংগীত ভালবাসে না সে নাকি খুন পর্যন্ত করিতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে, যে "লারে লাপ্পা" মার্কা সংগীত আনন্দ পায় তাহাকে উচ্চাঙ্গ-সংগীত আসরে জোর করিয়া বসাইয়া রাখা আর জেলে পুরিয়া রাখা একই কথা। আবার ঠিক মার্গ-সংগীতের ভক্তিরসের সমজদার তাঁহাদের নিকট 'লারে লাপ্পা' মার্কা সংগীত শোনা আর নরক বাস সমান কথা।

কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর সম্মিলিত কণ্ঠের স্তোত্র পাঠ! সংস্কৃত পদ সমূহের অর্থ বুঝি না সত্য কিন্তু তা সত্বেও যাহা পাই তাহা এককথায় অপূর্ব, মনের কোন অংশকে নহে, সম্পূর্ণ মনটাকেই যেন অভিভূত করিয়া ফেলে, সম্মিলিত কণ্ঠের স্তোত্রপাঠ আরম্ভ হইলে. স্তোত্রপাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে স্থান পরিত্যাগ করা কঠিন। আমি সংগীতের 'স' কিংবা গানের 'গ', কিছুই জানি না, আমারই এ অবস্থা; আর যাঁহারা সংগীত জানেন, বুঝেন এবং সংস্কৃত পদ সমূহের অর্থ বুঝেন তাঁহারা না জানি কত আনন্দ পান।

মনের সুদূর কোণে হয়ত একটি বাসনা লুক্কায়িত ছিল যদি সন্ধ্যায় সন্ন্যাসীগনের সম্মিলিত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ শুনিতে পাওয়া যায়।

দেখিলাম দশনামীদের অনেক তাঁবুতেই সহজে বহনযোগ্য ঠাকুরের ছোট ছোট আসন আছে। গৃহীদের যেমন কুলদেবতা, মনে হয় অনেকটা সেইরূপ কুলদেবতা। প্রতি কুলদেবতাকে সন্ধ্যারতি দেখানো হইয়াছে। বাঁ হাতে ঘণ্টা নাড়িতে নাড়িতে ডান হাতে জলন্ত প্রদীপসহ আরতি। আমি চারিদিক দেখিতেছি আর যথাসম্ভব খাতায় লিখিতেছি। মোহন্ত মহারাজের তাঁবুর সম্মুখে সব সময় শ-দেড়শত ভক্তের ভীড় লাগিয়া আছে। মধুর চাকে যেমন সব সময় দুই চারিটি মৌমাছি আসিয়া বসিতেছে, আবার সব সময় দুই চারিটি মৌমাছি উড়িয়া যাইতেছে. আবার চাকে সবসময় অগনিত মৌমাছি থাকে, এরূপ মোহন্ত মহারাজের তাঁবুর সম্মুখে সব সময়ই কেহ না কেহ আসিতেছেন, কেহ না কেহ ভীড় হইতে বাহির হইতেছেন। আবার সব সময় শ-দেড়শ ভক্ত বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায় আছেন। ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা মোহন্ত মহারাজের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারা—যে সমস্ত ভক্ত ভীড়ের জন্য তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহির হইতেই দুই হাত জোড় করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইতেছেন, তাঁহাদের চেয়ে নিজেদের বেশী ভাগ্যবান মনে করিতেছেন।

এমন পরিস্থিতিতে এক সন্ন্যাসী আমার নিকট আসিয়া জানিতে চাহিলেন,—

তুমি খাতায় কি লিখিতেছ?

মহারাজ, আমি খাতায় কি লিখিতেছি তাহা জানিয়া আপনার কি লাভ?

না, বল, কি লিখিতেছ?

আপনি কেন জানিতে চান, আগে বলুন।

মোহান্ত মহারাজ জানিতে চাহিয়াছেন।

কে?

মোহন্ত মহারাজ কৃষ্ণানন্দজী।

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতে ছিলাম না। মোহন্ত কৃষ্ণানন্দজী। মোহন্ত কৃষ্ণানন্দজী জানিতে চান—আমি কি করিতেছি? কি লিখিতেছি? একটা বিষয় এর মধ্যেই আমার নিকট পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। শুধুমাত্র এই তিন চার হাজার সন্ন্যাসীর প্রধানই তিনি নন। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, হিমাচল, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার—ভারতবর্ষের এই বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসীর দৃষ্টিতে কৃষ্ণানন্দজী খুব বড় মহাত্মা। শুধু গৃহীদের বিচারেই নয়, সাধু-সন্ন্যাসীর বিচারেও, কৃষ্ণানন্দজীর স্থান অনেক উচ্চে।

আর এতবড় মহাত্মা কিনা আমার মত এক নগণ্য ব্যক্তির খোঁজ-খবর লইতেছেন। এক মুহূর্তের চিন্তায় সিদ্ধান্তে আসিলাম—সুযোগ জীবনে বারে বারে আসে না। এখন যে সুযোগ আমার নিকট আসিয়াছে তার পূর্ণ সৎব্যবহার করিয়া এই সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়াই চূড়াই পৌঁছিতে হইবে।

কৃত্রিম বিনয়ে বিগলিত হইয়া আমাকে যে সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাঁহাকে খাতা খুলিয়া দেখাইয়া বলিলাম,—

মোহন্ত মহারাজ যদি আপনার নিকট জানিতে চান আমি কি করিতেছি? তবে দেখুন, আমি এই করিতেছি।

আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম আমার নিকট যে সন্ন্যাসী আসিয়াছেন তিনি অবাঙ্গালী। আমার বাংলা লেখার একবিন্দুও বুঝিবেন না। বলিলাম, আর মোহন্ত মহারাজ যদি আমার নিকট জানিতে চান আমি কি করিতেছি? তবে আমি নিজে মোহন্ত মহারাজকে বলিতে চাই। আপনি কৃপা করিয়া মোহন্ত মহারাজকে আমার প্রার্থনা জানান, "আমি কি করিতেছি তাহা নিজ মুখে মোহন্ত মহারাজকে জানাইতে চাই।"

ভীড়ের পিছন হইতে লক্ষ্য করিলাম সন্ন্যাসী মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে কি যেন আলাপ করিতেছেন আর বারে বারে হাত দিয়া আমাকে দেখাইতেছেন।

স্মিত হাসি সহ মোহন্ত মহারাজ হাতের ইসারায় আমাকে তাঁবুর ভিতর যাইতে আহ্বান করিলেন। তাঁবুর বাহিরে দাঁড়ানো জটলা সম্ভ্রমের সহিত আমার পথ করিয়া দিল। তাঁবুর পিছন অংশে খাটিয়া। খাটিয়ার উপর সিল্কের গেরুয়া পোশাক পরা বসা অবস্থায় মোহন্ত কৃষ্ণানন্দজী। খাটিয়ার সম্মুখে মেঝেতে সতরঞ্চি বিছানো আছে। তাহাতে জনা পনেরো পুরুষ মহিলা বসা আছেন।

তাঁহাদের পোশাক আসাক দেখিলে সহজেই আন্দাজ করা যায়—তাঁহারা শুধু আর্থিক দিক হইতেই সচ্ছল নন, সমাজের অন্তদিকে দিয়া বিচার করিলেও, তাঁহাদিগকে উঁচু মহলের লোক বলিতে হয়।

আমি তাঁহাদের মধ্যে দিয়া একদম মোহন্ত মহারাজের খাটিয়ার নিকটে গিয়া মেঝেতে বসিলাম। প্রণাম করিলাম। মোহন্ত মহারাজ একসঙ্গে অনেকের সঙ্গেই আলাপ করিতেছিলেন ; মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গে ও।

তোমার শরীর ?

বাঙ্গালী।

ওঁম ; বই লেখ ?

না, এখন ও কোন বই লিখি নাই, তবে পত্র পত্রিকায় মাঝে মধ্যে লিখি। আপনি আশীর্বাদ করুন, বই লিখিব।

এই বিষয়টি জানা থাকা ভাল। মোহন্ত মহারাজ কোন সময়ই একটানা আমার সাথে আলাপ করেন নাই। হয়ত আমাকে একটা প্রশ্ন করিলেন, আমি জবাব দিলাম। আমার জবাবটি শুনিলেন কি শুনিলেন না ঠিক বুঝা গেল না, এরই মধ্যে পাঁচ রকমের প্রশ্নের জবাব দিলেন। আবার আমাকে আর একটি প্রশ্ন করিলেন। পরবর্তী প্রশ্ন শুনিয়া বুঝিলাম, আমার দেওয়া আগের জবাটি, এত কথার মধ্যেও ঠিকই শুনিয়াছেন।

আর একটি সুন্দর জিনিষ। যখন দর্শক ভক্তগণ ভাবড় ভাবড় সব আধ্যাত্তিক প্রশ্ন করিতেছিলেন এবং মোহন্ত মহারাজের জবাব পাইয়া জীবন সার্থক করিতেছিলেন, তখন আমি ও মোহন্ত মহারাজ ফিস্ ফাস্ করিয়া সিনেমার আলাপ করিয়াছিলাম।

একেবারে দেখিনা এমন নয়, তবে খুব কম দেখি।

তোমাদের বাংলায় অমরনাথের উপর সিনেমা হইয়াছে। তুমি জান ? দেখিয়াছ ?

না, জানি না! দেখার সুযোগ পাইলে, আপনি যখন বলিতেছেন, তখন, অবশ্যই দেখিব।

ঐটাতে আমার ছবি আছে।

বলেন কি ? আপনাকেও সিনেমায় নামাইয়াছে ?

সিনেমায় নামাইয়াছে কিনা জানি না। তবে বড় ক্যামেরায় আমার ছবি তুলিয়া নিয়াছে। বলিয়াছে তাহাদের সিনেমায় দিবে।

এতক্ষণব্যাপী একজনের অর্থ্যাৎ আমার সাথে মোহন্ত মহারাজ কি আলাপ করিতেছেন—কোন কোন দর্শনার্থী ভক্তের কৌতুহল সৃষ্টি করিয়া থাকিবে। লক্ষ্য করিলাম, দর্শনার্থী মোহন্ত মহারাজকে শুধু প্রনামই করিতেছেন না এখন যেন বেশ কৌতুহলের সহিত আমাকেও লক্ষ্য করিতেছে। আমি সন্তোষজনক পরিস্থিতিতে থাকিয়াও সম্পূর্ণ মানসিক শান্তিতে ছিলাম না। এত অল্পে তুষ্ট হইতে

পারিতেছিলাম না। আমার চাই, আরও চাই, এবং মোহন্ত মহারাজের নিকট হইতেই উদ্ধার করিতে হইবে, এবং আমার বিশ্বাস, মোহন্ত মহারাজ যে কথা বলিবেন সে কথা ভারতের কোটি কোটি লোক নির্দ্বিধায় মানিয়া লইবেন।

এবার রাজনৈতিক নেতাদের কায়দায় ভণ্ডামীর আশ্রয় লইলাম। যদি শুধুমাত্র আমার আবেদনে সাড়া না পাওয়া যায় সে ভয়ে পেশাধারী বিপ্লবী দাদাদের ন্যায়, জনমত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা দিলাম।

"মহারাজ আমরা অমরনাথে আসি। পূর্ব-জন্মের সুকৃতি থাকিলে গুহায় বাবার দর্শন পাই। আবার আপনাদের দর্শন, আপনাদের সঙ্গ পাওয়া, সেও সৌভাগ্যের বিষয়। আমরা বাড়ী হইতেই অমরনাথের কাহিনী শুনিয়া আসি। এখানেও যাহাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিলে অমরনাথের কাহিনী জানা যায়। অমরনাথের উপর অনেক বইও লেখা হইয়াছে। ঐ সমস্ত বই হইতেও অমরনাথের কাহিনী জানা যায়। এখন যেহেতু আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সঙ্গ দিতেছেন, তখন আমার বাসনা, আমার বহু দিনের ইচ্ছা, আপনার শ্রীমুখ হইতে অমরনাথের কাহিনী শুনি।"

আমি যতক্ষণ বক্তৃতার ঢং এ কথা বলিতেছিলাম, ততক্ষণ একবার মোহন্ত মহারাজের দিকে আর একবার দর্শনার্থীর দিকে পর্য্যায়ক্রমে তাকাইতে তাকাইতে বলিতেছিলাম। আমার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর দেখিলাম দর্শনার্থীদের মধ্যে অত্যন্ত অনুকুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে শুধুমাত্র নমস্কার করিয়া জানাইয়া দিল, তাঁহারা শুধু একটিমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন, আর সে উদ্দেশ্যটি হইল, বাবার শ্রীমুখ হইতে অমরনাথের কাহিনী শুনা।

মোহন্ত মহারাজ মৃদু হাসিতেছেন আর ডান হাতে, আমরা যতখানি মমতায় শিশুকে আদর করি, সেভাবে, আমার মাথায় হাত বুলাইতেছেন। মোহন্ত মহারাজের মৃদু মৃদু হাসি ও মাথায় হাত বুলানো দেখিয়া সন্দেহ হইল, আমার সবটুকু বাঁদরামী উনি ঠিকই ধরিয়াছেন। তবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়াছেন। আর এখন এত ভক্তের আবেদনে সাড়া না দিয়া ও পরিতেছেন না।

আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে। আমি অমরনাথের কাহিনী বলিতেছি—তোমরা শুন, আর, আর তুমি লেখ।

আমি সত্যিই অসহায় বোধ করিলাম। আমার কলম আগেই এক সন্ন্যাসীকে দান করিয়াছি। দুইটি ডট্‌পেন কিনিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিতেছি একটি ডট্‌ও কাজ করিতেছে না। আমার অসুবিধা মোহন্ত মহারাজকে জানাইলাম। তিনি এক সন্ন্যাসীকে তাঁহার কলমটি দেওয়ার জন্য বলিলেন। সন্ন্যাসী মহারাজের কলমটি লেখার জন্য আমাকে দিলেন। দেখিলাম দামী কলম, সুন্দর লেখা আসে।

ঘটনাটি সামান্য, তবু উল্লেখ করিলাম, কারণ: কলমটি আমাকে না দিয়া অন্য কোন ভক্তকে দিলে সে মহারাজের কলমে লেখার কথা চিন্তাও করিত না, কলমটি পূজনবেতার আসনে রাখিয়া সারা জীবন পূজা করিত।

মোহন্ত মহারাজ অমরনাথের কাহিনী বলিতে শুরু করিলেন। সমস্ত দর্শক চুপ চাপ। মোহন্ত মহারাজের কথার মধ্যে যা দু-একটা প্রশ্ন আমি করিয়াছি, অন্য কেহ কোনরূপ প্রশ্ন করিয়া মোহন্ত মহারাজের অসুবিধা সৃষ্টিকরিতে সাহস করে নাই। আমার প্রশ্নও মোহন্ত মহারাজের কথার মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নহে, বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া লওয়ার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন।

"তোমরা এখন এখানে যে পর্ব্বতসমূহ দেখিতেছ, আগে এখানে এরূপ কোন পর্বত ছিল না। জল, জল; চারিদিকে শুধু জল, এর নাম ছিল 'সতীসর'। আর কত গভীর; ১৪ হাজার ফুট। সর্ব—প্রথম নাগ 'তক্ষকনাগ' এস্থানের রাজা ছিলেন। রাজা তক্ষকনাগ ইচ্ছাধারী ছিলেন, মনে হইল মানুষ আবার মনে হইল সাপের দেহ ধারণ করিয়া থাকিতেন। তবে রাজা তক্ষকনাগ সর্পদেহ ধারণ করিয়া জলেই থাকিতেন। সব সময় জল থাকার কারণে রাজার দেহে এরকম রোগ হয় রাজার শুধু শারীরিক নয়, মানসিক দুঃখও ছিল। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সে সময়ে কশ্যপ ও ভৃঙ্গীষ ঋষি বড় তপস্বী ছিলেন, তক্ষকরাজ কি করিয়া যেন বুঝিলেন তাঁর রাজ্যে দুইজন ঋষি আসিয়াছেন, নিজের শারীরিদ ও মানসিক দুঃখ দূর হওয়ার জন্য রাজা ঋষিদ্বয়ের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। ঋষিদ্বয় বলিলেন 'যখন তুমি মানুষের সঙ্গে আসিবে, যখন এখানে মানুষের গন্ধ আনিবে, তখন তোমার রোগ দূর হইবে'। কাতরভাবে রাজা জানিতেন চহিলেন; এ জলে কি করিয়া মানুষের গন্ধ আসিবে? 'বৎস, চিন্তা করিও না, তার জন্য আমরা তপস্যা করিব।' কশ্যপ ও ভৃঙ্গীষ ঋষি তপস্যায় ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে আদেশ দেন; তুমি এস্থানের জল সরাও ইন্দ্র নিজে বজ্র দ্বারা চারিদিকের পার কাটেন। সব জল বাহির হইয়া যায়, জল বাহির হওয়ার পর কশ্যপ ঋষি অন্য সমস্ত ঋষিকে আহ্বান করিয়া এখানে এক বিরাট যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের ফলে এস্থান শুদ্ধ হয়। কশ্যপ ঋষির নামে নতুনভূমির নামকরণ হয় কাশ্মীর, যজ্ঞের সময় বহু মানুষ, বহু ঋষি এখানে আসেন। ফলে তাঁহাদের গায়ের গন্ধে তক্ষকনাগের শরীর ভাল হয়।

ভঙ্গীষঋষি শিবের বড় ভক্ত ছিলেন। সত্য বটে তিনি বড় তপস্বী ছিলেন কিন্তু তিনিও কালের আয়ত্বাধীন ছিলেন। ঋষি বৃদ্ধ হইলে স্বয়ং শিব তাঁহাকে দুইটি দণ্ড বা ছড়ি দেন। একটি হলুদ ও অন্যটি লাল রং এর। হলুদ রং শিবের প্রতীক আর লাল শক্তির।

মানুষের গায়ের গন্ধে রাজা শারীরিক সুস্থ হইলেও তাঁহার মানসিক দুঃখ পূর্ব্ববৎ ছিল। ভৃঙ্গীষ ঋষি শিবপ্রদত্ত শিব-শক্তির প্রতীক ছড়ি দুইটি তক্ষকনাগকে দিয়া বলেন এই দণ্ড লইয়া তুমি গুহায় যাও, তপস্যায় শিবকে প্রসন্ন কর, তোমার মনের দুঃখ দূর হইবে। তক্ষকনাগ দণ্ড দুইটি ও দলবল লইয়া গুহায় যান। গুহায় তাঁহার মানসিক দুঃখ ত দূর হইলই তদোপরি এমন একটা মানসিক শক্তিতে ছিলেন যে আর রাজ্যে ফিরিতে চাহিতেছিলেন না। রাজকার্যে

[illegible] ক্রোধে," যাঁরা মধ্যে মধ্যে রাজাকে গুহা হইতে ধরিয়া আনিত, আবার যে কোন ছল ছুতায় তক্ষকনাগ গুহায় চলিয়া যাইতেন এবং বহুদিন সেখানে থাকিতেন। রাজার অনুপস্থিতিতে রাজকার্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতে লাগিল। রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। রাজকার্য্যে সুবিধার জন্য মন্ত্রীদের পরামর্শে তক্ষকনাগ ভৃঙ্গীষঋষিকে পুনরায় দণ্ড দুইটি ফিরাইয়া দেন এবং রাজার তরফ হইতে দণ্ডসহ গুহায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ভৃঙ্গীষ ঋষি ছড়ি দুইটি গ্রহণ করেন এবং রাজার তরফ হইতে গুহায় যাইতেন। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত গুহায় ছড়ি সহ যাওয়া চলিতেছে। পরম্পরায় এখন আমরা ছড়ি বহন করিতেছি। ছড়ি যাত্রার খরচ কাশ্মীর রাজ বহন করেন।"

ছড়ি কাহিনী শুনাইতে গিয়া যতক্ষণ প্রায় একটানা কথা বলিয়া মোহন্ত মহারাজ চুপ করিলেন। এতক্ষণ যে বিপুল সংখ্যক দর্শক চুপচাপ দাঁড়াইয়া ছড়ি কাহিনী শুনিতেছিলেন, এবার তাহাদের মধ্যে কাহার আগে কে মহারাজের পদধূলি লইয়া বিদায় লইতে পারেন তারই একটি মৃদু ঠেলাঠেলি চলিতেছিল। মোহন্ত মহারাজের পদধূলি লওয়ার পর কেহ কেহ সকৃতজ্ঞনয়নে আমার দিকে তাকাইতেছেন। তাঁহারা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টির মাধ্যমে আমাকে জানাইতেছেন; 'ভাইসাব, আজ আপনার কারণে মোহন্ত মহারাজের শ্রীমুখ নিসৃত ছড়ি কাহিনী শুনার সৌভাগ্য হইল'।

প্রায় সবাই চলিয়া যাওয়ার পর তখনও আমরা বড়জোর দশ-বার জনে মোহন্ত মহারাজের তাঁবুতে বসা আছি। আমি মোহন্ত মহারাজের সবচেয়ে কাছে, হাতের নাগালের মধ্যে বসা আছি।

সবাই মোহন্ত মহারাজকে 'বাবা' সম্বোধণ করেন দেখিয়া, পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পর ধীরে ধীরে বলিলাম, 'বাবা' এতলোক আপনার নিকট হইতে অমরনাথের কাহিনী শুনিয়া পরম প্রাপ্তির তৃপ্তি সহ ফিরিয়া গেল। কিন্তু অমার ত পূর্ণ তৃপ্তি আসে নাই। আপনি ত এতক্ষণ ছড়ি কাহিনী বলিলেন। কিন্তু ঐ গুহায় তুষার লিঙ্গ হয় কেন? কেন তুষার লিঙ্গ তিথি অনুযায়ী বড় বা ছোট হয়? ঐ তুষার লিঙ্গকে অন্য কোন নামে ভূষিত না করিয়া অমরনাথই বা বলা হয় কেন? আমি সব কাহিনী শুনিতে চাই। কপালে থাকিলে হয়ত আর একবার কিংবা আরও কয়েকবার অমর নাথ দর্শন হইতে পারে, কিন্তু আপনার এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাইব, এতখানি ভরসা আমার নাই; আপনি সব কাহিনী বলুন, আমি লিখি।

এবার মোহন্ত মহারাজ সস্নেহে অনেকক্ষণ আমার মাথায় হাত বুলাইলেন। মৃদুস্বরে জানাইলেন "যাঁহারা যাইতে চায়, আগে তাঁহাদিগকে যাইতে দাও। পরিস্থিতি আরও শান্ত হউক। বাচ্চা, তোকে বলিব।"

এবার তাঁবুর ভিতরে পরিস্থিতি সত্যিই শান্ত। আমরা আট-দশ জন মাত্র। তার মধ্যে দুইজন গেরুয়াধারী দশনামী সন্ন্যাসী।

"বাচ্চা, অমরনাথ কে জানিতে চাস, তুই মরণ বুঝিস্ ত?" মাথা নাড়িতে

বাড়িতে বলিলেন, "মরণ, মৃত্যু" ? এখন আমার বক্তব্য মরণ বা মৃত্যু বুঝি বা এমন নয়। আমি স্থূল অর্থে 'মৃত্যু, বুঝি, কিন্ত 'মৃত্যু'র কোন সূক্ষ্ম অর্থ থাকিতে পারে। কি বলিতে কি বলিয়া ফেলি, চিন্তা করিয়া বলিলাম, "বাবা, আপনি ধরিয়া নিন আমি কিছুই জানি না, এখন আপনি বলুন।"

বাচ্চা, অমরনাথের কাহিনী বলিতেছি, শোন।

যখন ব্রহ্মা এ জগৎ সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর কোন উদ্দেশ্য ছিলনা। নেহাৎ খেয়ালের বসে জগৎ সৃষ্টি করেন। সমস্ত জীব সৃষ্ট হয়। কিন্ত ব্রহ্মার সৃষ্টিতে একটু ভুল থাকিয়া যায়। জীবের সবই ছিল, জন্ম, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়ত্ব, বার্ধ্যক্য, জরাগ্রস্ত অবস্থা, কিন্ত মৃত্যু ছিল না। মৃত্যু বিহীন জগতে জরাগ্রস্থ জীব করুণ সুরে এ অবস্থা হইতে পরিত্রানের জন্যে প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। তখন মৃত্যুছিলনা, মৃত্যু-জরাগ্রস্ত অবস্থা হইতে মুক্তির উপায় একথাও কাহারও জানা ছিল না। ব্রহ্মা দূর হইতে তাঁর খেয়ালের বসে সৃষ্ট জীবদের নিকট হইতে একটি করুণসুর বা কান্নার আওয়াজ শুনিয়া, এ অবস্থায় কি করা, কি করিয়া এ সমস্ত জরা ব্যাধি গ্রস্ত লোককে মুক্তি দেওয়া যায় সে চিন্তায় ধ্যানে বসিলেন, ব্রহ্মার ধ্যান কালে ব্রহ্মার শরীরের ছায়া হইতে সৃষ্টি হইল এক যুবতী কন্যা, সদ্য-সৃষ্ট কন্যার গায়ের রং হলুদ, চক্ষের রং হলুদ, চুলের, নখের রং হলুদ। সৃষ্টির পর কন্যা ধ্যানরত ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া জানিতে চায়—সে কে ?

মা, তুমি আমার কন্যা।

আমার নাম ?

মৃত্যু।

আমার কাজ ?

মা, ঐ শোন দূরে আমার সৃষ্ট জগৎ হইতে জরা ব্যাধিগ্রস্ত জীবের করুণ-সুর। তাঁহারা মুক্তি চায়। মা, তুমি তাহাদিগকে জগতের পর পারে লইয়া যাইবে আশ্রয় দিবে, শান্তি দিবে।

এ অসম্ভব। পিতা, আমার দ্বারা অসম্ভব। স্বামী যত জরাগ্রস্তই হউক স্ত্রী কখনও স্বামীকে স্বেচ্ছায় জগতের পর পার যাইতে দিবে না। সন্তান ব্যাধিতে যত কষ্টই পাউক, মা, কক্ষণও সন্তানকে জগতের পর পারে যাইতে দিতে না, এ কঠিন নয় এ নিষ্ঠুর কাজ। কল্পনায় এ দৃশ্য আমি যতখানি দেখিতেছি,তাহাতে বলিতে পারি, এ কাজ করা ত দূরের কথা, এ দৃশ্য দেখিয়া আমি সহ্য করিতেও পারিব না।

মা, তোমাকে দেখিতে হইবে না। আমি তোমাকে অন্ধ করিয়া দিলাম।

মৃত্যুর দৃষ্টিশক্তি চিরতরে হারাইয়া গেল। মৃত্যু অন্ধ হইল।

কিন্ত পিতা, আপনার কৃপায় অন্ধ হইলাম। এ দৃশ্য দেখিব না সত্য, কিন্ত কাজ করিতে গিয়া কানে ত শুনিব, স্বামীহারা স্ত্রীর কান্না, সন্তান হারা মার কান্না। আমার দ্বারা এ কাজ অসম্ভব পিতা।

আমি তোমাকে বধির করিলাম।

মৃত্যু বধির হইল।

যাও মা, তোমার কাজে যাও, ঐ জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত জীবসমূহকে তোমার কোলে স্থান দাও, আশ্রয় দাও, শান্তি দাও।

অসম্ভব পিতা, আমি যাইব না আপনি এরূপ আদেশ করিবেন না। আপনার কৃপায় আমি অন্ধ ও বধির হইয়াছি সত্য, কিন্তু তবু মন বলিয়া ত একটা জিনিষ আছে; সেখানে মায়ের কান্না, স্ত্রীর কান্না কোন না কোন উপায় বুঝিব।

আচ্ছা মা, তোমার এ প্রার্থনাও পূরণ করিলাম। তোমাকে যাইতে হইবে না। তোমার তরফে অন্তরা যাইবে তাঁহারাই ঐ সমস্ত লোককে জগতে পরপারে এখানে তোমার কোলে আনিয়া দিবে, তুমি শুধু তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিবে, শান্তি দিবে। তোমার তরফে যাহারা জরা ব্যাধিগ্রস্ত দিগকে আনিতে যাইবে তাঁহারা জগতে তোমার দূত হিসাবে গণ্য হইবে।

মৃত্যুদূত, শেষ সময়ে মৃত্যুদূত গিয়া তাহাদিগকে এখানে আনিয়া দিবে।

ব্রহ্মার কথাতেই হউক কিংবা জরা ব্যাধিগ্রস্তদিগের দুঃখে কাতর হইয়াই হউক, মৃত্যু কাজের দায়িত্বে লইয়া মৃত্যুদূত পাঠাইয়া কাজ শুরু করিলেন।

এখন সমস্ত জগৎ মৃত্যুর আয়ত্বে। জগৎ সৃষ্টিতে ব্রহ্মার প্রথমভুল মৃত্যু বিহীন জগৎ সৃষ্টিতে এখন দ্বিতীয় ভুল—সবই মৃত্যুর অধীন, এমনকি দেবতারা পর্য্যন্ত।

মোহন্ত মহারাজ বিশেষভাবে আমাকে বলিলেন, জান ত সমুদ্রমন্থনকালে অমৃত কলস উঠে। সে অমৃত পান করিয়া দেবতারা অমর হন, এ ছাড়া, দেবতাগণের অমর হওয়ার আরও একটি ঘটনা আছে। ব্রহ্মার কন্যা মৃত্যুর আয়ত্বাধীন হইয়া এ অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য সব দেবতা একত্রিত হইয়া নারায়ণের নেতৃত্বে অমরনাথ গুহায় শিবের নিকট যান। নিজেদের দুরবস্থার কথা বলেন। ভগবান শঙ্করের নিকট মৃত্যু হইতে মুক্তির উপায় পাইতে চান।

তখন ভগবান শঙ্কর দেবতাগণের সম্মিলিত স্তব স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া মস্তকের চন্দ্রকে পীড়ন করিয়া রস বা জল বাহির করেন। দেবতাগণ সেই জল পান করিয়া অমর হন, শিবের পীড়নে চন্দ্র হইতে বাহির হওয়া জলই অমরগঙ্গা।

অমরগঙ্গা পান করিয়া অমর দেবতাগণ কৃতজ্ঞতায় ভগবান শঙ্করের জয়গান করেন। তাহাতে অর্থাৎ দেবতাগণের গানে স্বয়ং ভগবান শঙ্কর গলিয়া যান। গলিতে গলিতে ভগবান শঙ্কর সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ভগবান শঙ্করকে না দেখিয়া দেবতাগণ সংকিত হইলেন। তখন আকাশে দৈববানী হয় "আমি এই গুহায় জলেই আছি। আমাকে পাইবে। চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া চন্দ্রের প্রতি কলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমারও বৃদ্ধি হইবে; চন্দ্রের প্রতিকলার ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমারও ক্ষয় হইবে"।

ভগবান শঙ্কর এখানে দেবতাগণকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করেন, এখানে তিনি দেবতাদিগকে অমর করে, তাই এখানে তিনি অমরনাথ।

আর তখন হইতেই শিবের নাম হয় 'মৃত্যুঞ্জয়', যে দিন শিব চন্দ্র পীর করিয়া দেবতাদিগকে অমরগঙ্গার জল পান করাইয়া অমর করিয়াছিলেন, সেদিন ছিল রাখী পূর্ণিমার দিন। তাই সেই বিশেষ তিথিতে আমরা অমরনাথ গুহায় এখানে আসিয়া পূজন ভজন করি।"

মোহন্ত মহারাজের শ্রীমুখ হইতে অমরনাথের কাহিনী শুনার পর আমরা কেহই বেশ কিছুক্ষণ কোনকথা বলিতে পারি নাই। অমরনাথ নামকরণের রহস্য কিংবা কেন তিথি অনুযায়ী তুষার লিঙ্গের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, সব পরিষ্কার হইয়াছিল। অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে মন ভরিয়া গিয়াছিল। এবং মোহন্ত মহারাজের তাঁবুর ভিতর পরিস্থিতি এরূপ ছিল যে কোন কথা বলা চলে না। কথা বলিলেই যেন তাল ভঙ্গ হইবে, অভদ্রতা হইবে—এরূপ।

সেই দু সন্ন্যাসী ভিন্ন আমরা একে একে তাঁবুর বাহির হইতেছি। সর্বশেষে আমি প্রণাম করিলাম, তিনি আমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এমন সময় খুব মৃদুস্বরে বলিলাম, "বাবা কশ্যম ঋষি ত বুঝিলাম। কিন্তু ভৃঙ্গীশঋষি? এ নাম ত কখণও শুনি নাই।" সস্নেহে মোহন্ত মহারাজ জানাইলে, "বাচ্চা, রাম লক্ষ্মণের জন্মের জন্য যে যজ্ঞ হইয়াছিল, তিনি সে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।"

আমি আর একবার প্রণাম করিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিলাম।

সে রাতে বাজারী কোলাহলের জন্য ও চিন্তার জন্য সারা-রাত প্রায় না ঘুমাইয়া কাটাই। আজে-বাজে চিন্তা নয়, রীতিমত ধারা-বাহিক চিন্তা, চিন্তা করিতে লাগিলাম এ সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কত পুরনো। কেহ বলেন তিন হাজার বৎস, কেহ বা দাবী করেন পাঁচ হাজার বৎসর, সে বিতর্কে যাইতে চাই না, কিংবা সে বিতর্কে প্রবেশ করি ততখানি বিদ্যার জোর আমার নাই। কিন্তু একটা জিনিষ ত ঠিক, বহু প্রাচীন কাল হইতে তাঁহারা বিশ্বাস জীবিত রাখিয়াছেন।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বহু ব্যক্তির মধ্যে আমি লক্ষ্য করিয়াছি—সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে ঐ শিক্ষিত ব্যাক্তিগণের মতামত, তাহার অশিক্ষিত, পেটের ধান্দায় রোজরুজী করে। অশিক্ষা, কুশিক্ষার ধারক, বাহক ও প্রচারক, ইত্যাদি।

আমি শিক্ষক। ক্লাসে ছাত্রদের পড়াই,.

"বর্তমানে যেখানে হিমালয় পর্বত অবস্থিত, বহুদিন পূর্বে সেখানে টেথিস নামে একসাগর ও ভারত মালভূমির উত্তর অংশ ছিল। প্রায় দশকোটি বৎসর পূর্বে টেথিস সাগরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পৃথিবীর দুইটি প্রাচীনতম স্থলভাগ ছিল। উত্তরস্থলভাগের নাম ছিল আঙ্গারাল্যাণ্ড ও দক্ষিণের স্থলভাগে নাম ছিল গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড। এই স্থলভাগ হইতে আগত নদীগুলি টেথিস সাগরে প্রচুর পলিমাটি বহন করিয়া আনিত। ফলে সাগরের মহীখাতে বা অবনমিত স্থানে (জিওসিন ক্লাইনে) বহু বৎসর ধরিয়া পলি সঞ্চিত হইতেছিল। জিওসিন ক্লাইন পলিদ্বারা ভরাট হইলে প্রাকৃতিক কারণে উত্তরের আঙ্গারাল্যাণ্ড হইতে শিলা দক্ষিণে এবং দক্ষিণের গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড হইতে কঠিন শিলা উত্তরে সরিয়া জিওসিন ক্লাইনে সঞ্চিত পলির উপর পার্শ্বচাপের সৃষ্টি করে। এই চাপের ফলে শিলাস্তরে ভাঁজ পড়িতে শুরু হয় এবং অবশেষে টারস্যারী যুগে (প্রায় সাত কোটি বৎসর পূর্বে) এক প্রবল ধাক্কায় টেথিস সাগরতলে সঞ্চিত পাললিক শিলা ভাঁজ খাইয়া উপরে উঠিয়া পর্বতের আকার ধারণ, এবং পর্বত হইল বর্তমানের হিমালয় পর্বত। হিমালয় পর্বতমালার উৎপত্তির ইতিহাসের সত্যতা বিভিন্ন প্রমানের দ্বারা প্রমানিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রমাণটি হইল, এখনও অনুসন্ধান করিলে টেথিস হিমালয়ের পাললিক শিলার মধ্যে সামুদ্রিক প্রাণীর প্রস্তরিভূত কঠিন অংশ বা ফসিল দেখিতে পাওরা যায়। ইহা হইতে প্রমানিত হয় যে, একদিন হিমালয় পর্বত সাগরের নীচে ছিল।"

আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, ভারতীয় সভ্যতায় সন্ন্যাসী শ্রেণীর জন্ম কত প্রাচীন? গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান বিচার করিয়া কোন কোন পণ্ডিত দাবী করিতে-ছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বা মহাভারতে কাল প্রায় ৭০০০ বৎসর পূর্বের। মহাভারতেরও পূর্বে রামায়ণ কাল। তবে এটুকু সবাই জানি, যদি তার পূর্ব হইতে নাও হয়, অন্তত রামায়ণে কাল হইতে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আছেন। ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গিভূত সম্প্রদায় হিসাবে আছেন। আর তখন হইতেই গুরু পরম্পরায় হিমালয় যে এক বিরাট জলাশয় ছিল, ১৪০০০ ফিট গভীর, নাম সতীশ্বর এ জ্ঞান ও তাঁহাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে

আর অন্যদিকে "পাললিক শিলার মধ্যে সামুদ্রিক প্রাণীর প্রস্তরিভূত কঠিন অংশ বা ফসিল" দেখিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান, "বর্তমানে যেখানে হিমালয় পর্বত অবস্থিত, বহুদিন পূর্বে সেখানে সাগার ছিল," কত অর্বাচীন!

অথচ মজা এই, এই অর্বাচীন পাশ্চাত্য জ্ঞানে বলীয়ান হইয়া আমরা সত্যি-কারের জ্ঞানের অধিকারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিয়া

করে।

ইহার চেয়ে লজ্জার, ইহার চেয়ে কলঙ্কের আর কি হইতে পারে? আমার জানা নাই।

বিছানায় শুইয়া আরও চিন্তা করিতেছিলাম কশ্যপ ঋষি ও ভৃঙ্গীশ ঋষি আমার বিশ্বাস কশ্যপ ঋষি সম্বন্ধে সবাই কিছু না কিছু জানেন। কশ্যপ ঋষি সম্বন্ধে কোন চিন্তা ছিলনা। যত চিন্তায় জর্জরিত হইতে ছিলাম ভৃঙ্গীশ ঋষি লইয়া। কশ্যপ বড তপস্বি ছিলেন। এ কথা ছাড়াও, আমার স্বভাব অনুযায়ী বলিতে চাই, তিনি স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবর "ভায়রা ভাই" ছিলেন। শিব দক্ষকন্যা সতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পুরানে কথিত আছে দক্ষের অন্যতম কন্যা কদ্রুকে কশ্যপ ঋষি বিবাহ করিযাছিলেন।

যত অসুবিধা সৃষ্টি হইতেছে ভৃঙ্গীশ ঋষিকে লইয়া। কে এই ভৃঙ্গীশ ঋষি? স্বয়ং শিব যাহাকে দুইটি দণ্ড দিয়াছিলেন। যে দণ্ড তক্ষক নাগের হাত ঘুরিয়া আবার ভৃঙ্গীশ ঋষির নিকট যায়। যে দণ্ড লইয়া হাজার হাজার বৎসর যাবৎ সাধু সন্যাসী আজ শ্রাবণী পূর্নিমায় স্নান যাইতেছেন? দশনামী আখাড়ার মোহন্ত মহারাজ মোহন্ত কৃষ্ণানন্দজী স্বয়ং বলিয়াছে "রাম-লক্ষ্মণের জন্মের জন্য যে যজ্ঞ হইয়াছিল, তিনি সে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।"

মোহন্ত মহারাজের কথায় অবিশ্বাস করিব অতবড় ধৃষ্টতা আমার নাই। মোহন্ত কৃষ্ণানন্দজী কথায় মনে সন্দেহের ছায়াপাত করিলেও কেহ কেহ নিজেকে পাপী মনে করিবেন। পাপবোধে কম্পিত হইবেন।

কিন্তু যতখানি জানি বিভান্তক মুনির পুত্র ঋষ্য শৃঙ্গকে আনিয়া রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করান। তাই ধরিয়া লইতেছি একই ব্যক্তি ভৃঙ্গীশ ও ঋষ্যশৃঙ্গ এই দুই নামে সমাজে পরিচিত ছিলেন। এখন ঋষ্যশৃঙ্গ কিংবা ভৃঙ্গীশ ঋষিকে একই ব্যক্তি ধরিয়া রাজা দশরথে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের দিতেছি স্বামী অপূর্বানন্দ কর্তৃক প্রধান পুরোহিত সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা রচিত "দিব্য রামায়ণ" এর ২০-২৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "বাল্মীকি রামায়ণ মতে রাজা দশরথের সাড়ে তিনশত পত্নী ছিল।" আমার ব্যাক্তিগত ধারনা এই পত্নীগণের মধ্যে মাত্র তিন পত্নী—কৈশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা পাট রাণী ছিলেন। বাদবাকী ৩৪৭ জন ছিলেন দশরথের কাচ্ছা বা কাছুয়া রাণী। দিব্য রামায়ণ পড়িয়া একটি নূতন কথা জানিয়াছি, "এ ছাড়াও রাজার (দশরথের) একটি কন্যা জন্মেছিল। দশরথ এই কন্যাকে অপুত্রক লোমপাদকে দান করেন।"

রাজা দশরথ স্বয়ং লোমপাদের রাজ্যে আসিয়া কয়েকদিন বাস করার পর লোমপাদকে বলিলেন, "আমি পুত্র কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্কল্প করেছি। তা নির্বাহের জন্য আপনার জামাতাকে সেখানে যদি পাঠান তো বিশেষ অনুগৃহীত হব।" লোমপাদ সানন্দে ঋষ্যশৃঙ্গকে সস্ত্রীক অযোধ্যায় যাবার জন্য অনুরোধ করে বললেন, "যে শান্তার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছে সে কন্যা জন্মেছিল এঁরই ঘরে, তুমি এঁর জামাতা। ইনি এক দিক থেকে তোমার শ্বশুর। ইনি অপুত্রক, এর এ তাপ দূর কর।"

রাজা লোমপাদ আবার নিজের রাজ্যের বিপদ দূর করবার জন্য কৌশলে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিজ রাজ্যে আনাইয়া যজ্ঞ করাইয়া ছিলেন। সেই যজ্ঞে রাজ্যের বিপদ দূর হইলে পর দত্তক কন্যা শান্তার সহিত বিবাহ দিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে নিজ রাজ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

রাজা লোমপাদ কি কৌশলে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিজ রাজ্যে আনাইয়া ছিলেন—সে সে কাহিনী পাঠকদের উপহার দেওয়ার জন্য এত বড় ভূমিকা। দশরথ, লোমপাদ, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ইত্যাদি। আমার জ্ঞানের সূত্র ঐ দিব্য রামায়ণ। কাহিনীটি নিম্নরূপ—

"লোমপাদ বিনীতভাবে পুরোহিতদের ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে আনার অনুরোধ জানালেন। মন্ত্রিগণও পরামর্শ করে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা রূপবতী গণিকাদের বিবিধ উপঢৌকন ও বিলাস দ্রব্যসহ ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলোভিত করে আনার জন্য পাঠালেন। রাজার কাছে সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু ও ধন রত্নাদি পেয়ে এক বৃদ্ধা গণিকা একটি নৌকায় কৃত্রিম বৃক্ষ, গুল্ম, লতা ও ফুলপুষ্প দিয়ে সাজিয়ে রমণীয় আশ্রম রচনা করে কয়েকজন রূপযৌবনসম্পন্না গণিকাকে নিয়ে বিভাণ্ডকের আশ্রমের অদূরে এসে নৌকা বাঁধলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মাবধি পিতার স্নেহেই বর্ধিত হয়েছিলেন, আশ্রমের বাইরে কোথাও যাননি, জনপদ, নগর বা গ্রামের স্ত্রী পুরুষ কিছুই দেখেন নি। তিনি নিবিড় বনে তপশ্চর্যা করতেন। মন্ত্রিদের প্রেরিত গণিকাগণ আশ্রমের কাছেই গুপ্তভাবে অবস্থান করেছিল। ঋষ্যশৃঙ্গ একদিন বেড়াতে বেড়াতে সেখানে এলেন। বিচিত্র বেশে সুসজ্জিতা যুবতীগণ মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে নৃত্য করতে করতে ঋষিপুত্রের কাছে এসে বললেন, "ব্রাহ্মণ! আপনি কে, কি করেন, একাকী এই নির্জন বনে কেন বেড়াচ্ছেন?" সেই সুন্দরীদের দেখে মোহিত ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, "আমি বিভ্রান্তক ঋষির ঔরসপুত্র। আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। তোমরা কে? তোমাদের কর্ম বা তপঃ সাধনাই বা কি? যে শুভাননাগণ, নিকটেই

আমাদের আশ্রম, চল, সেখানে পাদ্য, ফলমূল দিয়ে তোমাদের যথাবিধি সৎকার করব।"

তারা আশ্রমে আসতে আসতে ঋষিকুমার পাদ্য অর্ঘ্য ও ফলমূল দিয়ে সমাদর করতে বারাঙ্গণরা হৃষ্ট চিত্তে বলল, "আমাদের স্বধর্ম এই যে, আমরা পাদ্য জল গ্রহণ করিতে পারি না। আপনি আমাদের অভিবাদন করবেন না—আমরাই তা করব। আমাদের ব্রতানুসারে আপনাকে আলিঙ্গন করব।" বারাঙ্গণাগণ মুনি-পুত্রের সৎকার গ্রহণ করে উত্তম ফল, সুমিষ্ট ও সুগন্ধ পানীয়, মহামূল্য বিচিত্র বসন, সুগন্ধ মাল্যাদি দিয়ে মুনিকুমারকে বলল, "এসব ফল ও পানীয় শীঘ্র খেয়ে ফেলুন। আপনার ভাল হবে।" ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন—আমি তোমাদের পক্ক ভল্লতক, আমলক করূষক, প্রিয়লম প্রভৃতি ফল দিচ্ছি এবং কৃষ্ণাজিনাবৃত সুখাসনে তোমরা বস। তোমাদের আশ্রম কোথায়?

তারা কলহাস্য করতে করতে মুনিপুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করল। লতার মত বক্র হয়ে মুনিপুত্রের গায়ে গা দিয়ে বারবার স্পর্শ করল। এবং নানাভাবে প্রলোভিত করে মুনিকুমারকে বিকারগ্রস্ত দেখে অগ্নিহোত্র হোম করার ছলে বিভাণ্ডক ঋষির আগমন ভয়ে তারা শীঘ্র আশ্রম থেকে চলে গেল। ঋষ্যশৃঙ্গ মদনাবিষ্ট হয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ক্ষণকাল পরে বিভাণ্ডক মুনি আশ্রমে ফিরে এলেন।

আশ্রমে বেদধ্বনি হচ্ছে না এবং পুত্রকে বিহ্বল দেখে তিনি বললেন, "বৎস! চিন্তামগ্ন ও কাতর দেখছি কেন? এখানে কে এসেছিলেন?" ঋষ্যশৃঙ্গ উত্তর দিলেন, "কয়েকজন জটাধারী ব্রহ্মচারী এসেছিলেন। তারা আকারে তত দীর্ঘ নয়, বর্ণ সুবর্ণের মত, আয়তলোচন ও দেবদূতের মত সুন্দর। তাদের জটা সুদীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ সুগন্ধ ও স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত। আকাশের বিদ্যুতের মত তাদের কণ্ঠে কি যেন দুলছিল। আমার এই জপমালার মত তাদের পায়ে ও হাতে শব্দকারী আশ্চর্য্য মালা আছে। তাদের পরিধেয় অতি অদ্ভুত, আমার চীর বসনের মত নয়। তাদের মুখ কেমন সুন্দর, লোমহীন! কণ্ঠস্বর কোকিলের মত মধুর, তাদের কথা শুনলে আনন্দ হয়। ঐ দেবকুমারদের উপর আমার গাঢ় অনুরাগ হয়েছে। তারা আমায় আলিঙ্গন করে আমার জটা ধরে মুখে মুখ লাগিয়ে মধুর শব্দ করল। তাতে আমার রোমাঞ্চ হল। তারা যেসব ফল আমায় খেতে দিয়েছিল তার বীজ বা খোসা নেই, কী মধুর! তাদের দেওয়া সুস্বাদু সুগন্ধি জল পান করে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। মনে হয় যেন পৃথিবী ঘুরছে। এইসব সুগন্ধি বিবিধ মালা তারা ফেলে গিয়েছে, তাদের বিরহে আমি মৃতপ্রায়

হয়েছি, আমার গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। পিতা! আমি তাদের কাছে যেতে চাই। তাদের সঙ্গে তপস্যা করব।" বিভাণ্ডক বললেন, "ওরা মায়াবী—রাক্ষস, তপস্যায় বিঘ্ন জন্মায়—ওদের দিকে তাকালেও তপস্বিদের উচিৎ নয়। পুত্র! অসৎ লোকই সুরাপান করে, মুনিদের তা পান করা উচিৎ নয়। তারা তোমায় সুরাপান করিয়েছিল, আর এসব মালাও আমরা ব্যবহার করিতে পারি না।"

পুত্রকে নানাভাবে নিবৃত করে বিভাণ্ডক গণিকাদের সন্ধানে বের হয়ে তিন দিন সারা বনে খুঁজেও তাদের সন্ধান না পেয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। তার পরদিন তিনি যখন তপস্যার জন্য বনে গেলেন তখন গণিকারা আবার আশ্রমে এল। ঋষ্যশৃঙ্গ তাদের দেখে হৃষ্ট চিত্তে বললেন, "তোমাদের আশ্রম কত দূরে, কোথায়? বারাঙ্গণারা বলল, "এই তিন যোজনব্যাপী পাহাড়ের অপর পারেই আমাদের রমণীয় আশ্রম।"

"পিতা ফিরে আসবার আগেই তোমাদের আশ্রমে যাই চল।"

বারাঙ্গণাগণ তাকে নৌকায় নিয়ে গেল এবং নানা উপায়ে প্রলোভিত করে দেশাভিমুখে যাত্রা করল!

এখন আমার বক্তব্য ঋষ্যশৃঙ্গ ও ভৃঙ্গীশ ঋষি যদি এক ব্যাক্তি হন তবে এ কাহিনী ভৃঙ্গীশ ঋষির তপোবন হইতে লোকালয়ে আসার বা আনানোর কাহিনী। ভৃঙ্গীশ ঋষি যাহাকে স্বয়ং শিব দুইটি ছড়ি দিয়াছিলেন। সে ছড়িসহ প্রতি বৎসর সন্ন্যাসীগণের ছড়ি মিছিল চলিতেছে। মোহন্ত মহারাজ কৃষ্ণ-নন্দজীর নিকট শোনা কাহিনীটিকেও আমি যথারীতি খাতায় সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। পরদিন মনের অন্তস্থল হইতে একটি ইচ্ছা বারে বারে আমাকে বিব্রত করিতেছিল। যাহা লিখিয়াছি তাহা সবটা ঠিকমত লিখিতে পারিলাম কিনা কে জানে? মোহন্ত মহারাজকে যদি সবটা শুনাইতে পারিতাম তবে কাহিনীটি সম্বন্ধে অনেক বেশী নিশ্চিন্ত হইতাম।

হিমালয়ের নিজস্ব মাহাত্ম্য। ইচ্ছাটাই শুধু জোরালো হওয়া চাই। দেখিয়াছি ইচ্ছা ঠিক পূরণ হইয়া যায়।

পরদিন সন্ধ্যার সময় কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মোহন্ত মহারাজের নিকট অমরনাথের কাহিনী শুনিতে চান। তাহারা পূর্বেই শুনিয়াছিলেন গতকাল মোহন্ত মহারাজ স্বয়ং অমরনাথের ও ছড়ির কাহিনী বলিয়াছিলেন। এমন সময় আমি মোহন্ত মহারাজের তাঁবুর সম্মুখ দিয়া কোথায় যেন যাইতেছিলাম তিনি হাত দিয়া আমাকে তাঁবুর ভিতরে যাইতে ঈশারা করিলেন। মুখে বলিলেন, "অন্দার আও", আমি তাঁবুর ভিতরে গিয়া মোহন্ত মহারাজকে প্রণাম

করার পর তিনি বলিলেন, "তোমাকে কাল অমরনাথের ও ছড়ির যে কাহিনী বলিয়াছি সে কাহিনী এঁদের বল।"

আমি আজও নিঃসন্দেহ হইয়া বলিতে পারি না—আমার উপর মোহন্ত মহারাজের এ আদেশের কারণ কি? ভদ্রলোকদিগকে অমরনাথের কাহিনী সংশোধন করার সুযোগ সৃষ্টি করা। অমরনাথের বা ছড়ির কাহিনী আমার মনে গাঁথিয়া রহিয়াছে। মাত্র তিন চার বার আমার লেখার দিকে তাকাইয়াছি বাকী সময় মন হইতে বলিয়াছি।

কাহিনী শেষ হওয়ার পর ভদ্রলোকদিগকে বলি, "দেখুন, মোহন্ত মহারাজ আমাকে কাহিনীটি হিন্দীতে বলিয়াছিলেন – আমি একদিকে শুনিতেছিলাম, অন্য দিকে সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় সংক্ষিপ্তসার খাতায় লিখিয়াছিলাম, এখন বাংলায় লেখা সংক্ষিপ্তসার দেখিয়া আপনাদিগকে ইংরেজীতে বলিলাম।

এ কথা যখন বলি তখন সত্যি সত্যি কোন বিনয় করিতেছিলাম না। আমার যথেষ্ট ভয় ছিল—কী শুনিতে কি শুনিতেছি, কী লিখিতে কি লিখিতেছি, আর এখন ইংরেজীতে কী বলিতে কি বলিতেছি।

শ্রোতাগণের মধ্যে বয়স্ক কয়েকজন বলিলেন, "আপনি সুন্দর বলিয়াছেন। কাহিনীটি আমরা খুব ভাল বুঝিয়াছি। আপনার বাচনভঙ্গীও খুব চমৎকার।"

মোহন্ত মহারাজ স্মিত হাসিসহ জানাইলেন, "সুন্দর! ঠিক আছে"।

তৃপ্ত আমি। জীবনে এত তৃপ্তি খুব বেশী পাই নাই। সেদিন মোহন্ত মহারাজের ছোট্ট একটি শব্দ আজও আমার কানে বাজে। সেক্ষণটি স্মরণ করিলে আমি এখনও আনন্দ পাই, তৃপ্ত হই মোহন্ত মহারাজকে প্রণাম করিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিলাম।

ইহা সন্ন্যাসীগণের দুর্বলতা বলুন আর যাই বলুন আমার পরীক্ষিত সত্য সব সন্ন্যাসীই নিজেকে দশনামী বলিয়া পরিচয় দেন। তবে যতটা বোকা বা অজ্ঞ সাজিয়া প্রশ্নাদি করি বাস্তবে হয়ত আমি ততটা বোকা নই। আমার সীমিত জ্ঞানেও ধরিতে পারি কে দশনামী আর কে দশনামী নয়। অবধূতে "নীলকণ্ঠ হিমালয়" পড়িয়া জানিয়াছি—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী এই দশটি দশনামীগণের উপাধি। সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে দশনামীগণের দুইরকম পরিচয়।

দ্বারকার সারদা মঠ ভুক্ত সন্ন্যাসীগণ নিজেদের তীর্থ ও আশ্রম নামে পরিচয় দেন। যোশী মঠভুক্ত সন্ন্যাসীগণ নিজেদের গিরি, পর্বত ও সাগর বলিয়া পরিচয় দেন।

[illegible] শৃঙ্গেরী মঠভুক্ত সন্ন্যাসীগণ নিজেদের সরস্বতী, ভারতী ও পুরী বলিয়া পরিচয় দেন। পুরীর গোবর্ধন মঠভুক্ত সন্ন্যাসীগণ নিজেদের বন ও অরণ্য এই দুই নামে পরিচয় দেন।

প্রতি মঠভুক্ত সন্ন্যাসীগণের স্থূল পরিচয়ে আশ্রম, মঠ, ক্ষেত্র, তীর্থ, দেবতা, দেবী, আচার্য, ব্রহ্মচারী, সম্প্রদায়, বেদ ও গোত্র কিংবা সূক্ষ্ম পরিচয়ে গুরু, ঋষি, উপদেশ, গম্য, যোগ, সত্ত্বিক কারণ, রাজসিক কারণ, চক্র, মূর্তি, ব্রহ্মা ও অনুভূতি। আলাদা অদলাদা দশনামীগণের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিচয়ের পদসমূহ হইতে মাত্র ১টি করিয়া পদ যথাক্রমে আচার্য্য ও চক্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

দ্বারকার সারদা মঠভুক্ত আশ্রম ও তীর্থ উপাধিধারী সন্ন্যাসীর 'আচার্য্য'—বিশ্বরূপ বা হস্তামালক 'চক্র'—মূলাধার। এরূপ পুরীর গোবর্ধন মঠভুক্ত বন ও অরণ্যের আচার্য্য 'বলভদ্র' (তুজ, পদ্মপাদ) চক্র স্বাধিষ্ঠান। যোশীমঠভুক্ত গিরি, পর্বত ও সাগরের আচার্য্য—নবটক বা ত্রোটক। চক্র মনিপুর। শৃঙ্গেরী মঠভুক্ত সরস্বতী, পুরী, ভারতীর আচার্য্য পৃথীবর বা সুরেশ্বর। চক্র-অনাহত।

গৌরীশঙ্কর মঠের ময়দানে একব্যক্তিকে খালিগায়ে আট হাত নোংরা ধুতি পরা অর্দ্ধশোয়া অর্ধবসা অবস্থায় রোদ পোহাইতে দেখিয়া আলাপ শুরু করি।

আমার প্রশ্নের উত্তরে জানাইলেন—তিনিও সন্ন্যাসী।

- দশনামী ?
- দশনামী।
- নাম ?
- প্রকাশ গিরি।
- যদি দশনামী হন, তবে বলুন আপনার স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিচয়।

এক মুহূর্তে তিনি সোজা হইয়া বসিলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। চোখে বিরক্তি না বিস্ময় বুঝিতে-পারিতেছিনা।

বলিলাম—গেরুয়া পরিলেই হইল। সবাই নিজেকে সাধু বলিয়া দাবী করেন। উপরন্তু বলেন কিনা দশনামী সন্ন্যাসী আপনি দশনামী হইয়া থাকিলে আপনার স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিচয় দিতেছেন না কেন ? আপনার আশ্রম, মঠ, ক্ষেত্র, তীর্থ, দেবতা, দেবী ইত্যাদি কি কি ?

"শুনুন"। এবার আমি যথার্থই অবাক হইলাম। 'শুনুন' কথাটি তিনি বাংলায় বলিলেন। এতক্ষন আমাদের কথাবার্তা হিন্দিতে চলিতেছিল এঁর হিন্দী শুনিয়া একবারও সন্দেহ হয় নাই তিনি বাঙালী, হিন্দী এঁর মাতৃভাষা নয়।

বলিলেন—"আমার সূক্ষ্ম পরিচয় আমার কাছেই থাকুক। স্থূল পরিচয়

'আশ্রম' বদ্রী ধরম গাও, গৌরীশঙ্কর মঠ, রায়বেরিলী, 'মঠ' যোশী, 'আখড়া' আহ্বান 'গোত্র'—ভৃগু। আপনি এত কথা কি করিয়া জানিলেন ?"

আমার প্রশ্নের উত্তর জানাইলেন—'আগে পশ্চিম বাংলায় শিক্ষক ছিলাম।'

• শিক্ষক ? 'বেশ তো শিক্ষক বলিলে বুঝা যায় আগে শিক্ষকতা করিতেন। আর এখন আপনি সাধু। 'সাধু' বলিতে কিছুই বুঝা যায়না। এখন আপনি কি করেন ?

• 'মানে' ?

• মানে খুব সোজা। শিক্ষক বলিলে বুঝি শিক্ষকতা, ডাক্তার বলিলে বুঝি চিকিৎসা করেন, কেনারী বলিলে, দারোয়ান বলিলে বুঝি তাহারা কি করেন। কিন্তু "সাধু" বলিলে কি বুঝিব ? আপনি বা আপনার মত অন্য সাধু কি করেন ? তাহা জানিতে চাই। 'সাধু' বলিলে ঠিক ঠিক করে বা কি কাজ কিছুই বুঝি না।

সোজা কথা সরলভাবে বলেন না কেন ? আপনি সাধুর মানে জানতে চান ? যে কোন কিছুর সাধনা করে সেই সাধু। এমনকি যিনি সংসার করেন তিনিও সাধু।

আমার প্রশ্নের উত্তরে জানাইলেন—তিনি গত তের বৎসর যাবৎ সন্ন্যাসী। গতবার অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে ১৪ দিন গুহায় থাকিয়া ছিলেন আবার 'ছড়ি-'র সঙ্গে গিয়াছিলে।

• আচ্ছা মহারাজ ! আপনাদের 'গণভোজনের' সময় এত 'রাম' 'রাম' কি করে ? ভোজনরত কোন সন্ন্যাসী কোন রূপ 'রাম' চাহিলে দেখিয়াছি তাহাকে 'রাম' দেওয়া, আবার ঐ সন্ন্যাসী পাতে 'রাম' পারিলে রাম খায়ও। এত 'রাম'ই বা কোথা হইতে আসে ? 'রাম' কি ?

তিনি আমার উপর খুব সদয় হইয়াছে বুঝা। হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, বুঝেছি। আপনি কি বলিতে চান। বুঝেছি। আমরা সাধু সন্ন্যাসীরা সব খাবার জিনিষকে একান্ত আমাদের ভাষায় বলা বলি করি। আপনি লিখতে চান ? বেশ লিখুন। চাউল বা ভাতকে বলি 'রাম', রুটি—'ফুলকারাম' লবন—'রামরস', মরিচ—'রাম তাড়কা', ডাল—'বৈকুণ্ঠি', জল—'বরুন', হলুদ 'রং বদল' ইত্যাদি।

সাধু প্রকাশ গিরিকে নমস্কার জানাইয়া অন্য দিকে গেলাম।

যেদিকে ইচ্ছা ঘুরিতেছি। যাহার সাথে ইচ্ছা কথা বলিতেছি। প্রকাশ গিরির পর সাধু মেলায় বানিজ্য করার মত অনেকক্ষন কিছুই পাই নাই। এবার

মনের মত একজনকে পাইলাম, "আরে! আরে! শুনুন, শুনুন। আপনাকেই খুঁজিতেছি।

- আমাকে!
- হ্যাঁ, আপনাকে।
- কি বলুন?
- আপনার একটু সময় থাকলে আসুননা এখানে একটু বসি।

তিনি আমার অনুরোধে আমার সঙ্গে বসিলেন। "বেশ এখন বলুন. আপনার কি কথা?

- আপনি ত জঙ্গম?
- হ্যাঁ।
- আপনাদের নেতা কে?
- কেন? আমি!
- আপনি? আপনি এ জঙ্গমদের নেতা? জানেন আমি শ্রীনগরের লালচকে প্রথম আপনাদিগকে দেখি। আপনাদের মাথায় মুকুট দেখিয়া অবাক হই। তারপর গতকাল সকালে এখানে আপনাদিগকে গান গাইতে দেখিয়া অনেক ক্ষণ আপনাদের পিছনে থাকিয়া গান শুনিয়াছি। আপনাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু জঙ্গম কি আমি জানিনা। যদি অনুগ্রহ করিয়া জঙ্গম সম্বন্ধে আমাকে সংক্ষেপে বলেন তবে কৃতার্থ হই। এখন ও মাথায় মুকুট না থাকিলে বুঝিতামনা আপনি জঙ্গম।

আপনি জঙ্গম সম্বন্ধে কিছু জানেন না? কিছু শোনেনও নাই আশ্চর্য! আমরা দশনামীর পুরোহিত।

- দশনামীর পুরোহিত?
- হ্যাঁ কোন শাস্ত্রেও আমাদের অর্থাৎ জঙ্গম সম্বন্ধে কিছু পড়েন নাই? আশ্চর্য্য!

দেখুন এমন করিয়া হইবেন। আমি প্রশ্ন করি, আপনি জবাব দিতে থাকুন।

- আপনার নাম?
- রোশন লাল।
- ঠিকানা?
- রোশনলাল। ভিলেজ ও পোষ্টাপিস—মার্থাল, জিলা—সোনিপথ, হরিয়ানা।

আপনাদের পোষাক আষাক তো এমনিতে সাধারন, ধুতি, গেরুয়া পাঞ্জাবী, তবে কিনা প্রত্যেকের গলায় গামছা, মাথায় অদ্ভুত পাগড়ী।

◦ মাথায় শঙ্করজী মুকুট।

◦ কি আছে আপনাদের মুকুটকে ?

◦ এইত লাল কাপড়ে তৈরী পাগড়ী। তার মধ্যে পিতলের তৈরী 'লিঙ্গ', ময়ূরের পালক—'গঙ্গা' এই হইল পিতলের তৈরী 'শেষনাগ'। কানের উভয় পার্শ্বে পিতলের তৈরী ফুল—'কুন্তল'।

তারপর সে সকালে কথায় কথায় রোশনলালের নিকট হইতে জঙ্গম সম্বন্ধে সব কাহিনী উদ্ধার করি এবং পরে এখানে আসিয়া বিশ্বকোষ—৬ষ্ঠ ভাগ, ৬১১ পৃষ্ঠায় জঙ্গম সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে দেখি। বিশ্বকোষে লেখা ও রোশন লালের বলা কাহিনী একরূপ নয়। তাই বাধ্য হইয়া পাঠকের সুবিধার জন্য দুই বক্তব্যই তুলিয়া ধরিতেছি। বিশ্বকোষে আছে—'জঙ্গম' অর্থাৎ লিঙ্গাধিকারী মানব। দাক্ষিণাত্যবাসী লিঙ্গায়ত পুরোহিত। অপর নাম অয্যাবাবীর শৈব। সমস্ত দাক্ষিনাত্যে প্রায় লক্ষাধিক জঙ্গমের বাস আছে। ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার উপাধি নাই, তবে যে যে নগরে বা গ্রামে বাস করে সেই স্থলের নামানুসারে পরিচয় দিয়া থাকেন।

জঙ্গমেরা বলিয়া থাকে যে, এই সম্প্রদায় পূর্ব হইতেই ছিল, কিন্তু কালবশে অবনতি হইলে শৈব ধর্ম প্রচারার্থে—শিব নন্দীকে আদেশ করে। নন্দী শ্রীশৈলের পশ্চিমস্থ হিঙ্গুলেশ্বর পার্বতী নামক অগ্রহাকে মাগিদ রায় নামে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও মহম্বা বা মহাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম হইল বাসব বা বাসবন্ন। বাসব পুরানে ইহার বিবরণ বর্নিত আছে। কিন্তু তৎপাঠে বোধ হয়, এই বাসব হইতেই জঙ্গম সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

জঙ্গমেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ধতস্থল ও গুরুস্থল। ধতস্থল জঙ্গমেরা বিবাহ করিতে পারেনা, উদাসীন, বৈরাগীদের ন্যায় সংসারে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করেন। শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রোপদেশ প্রদানই ইহাদের কর্তব্য কর্ম।

গুরুস্থলেরা বিবাহ করেন। অপরাপর লিঙ্গায়তদিগের উপর গুরুগিরি করিয়া থাকে বলিয়া গুরুস্থল নাম হইয়াছে। জঙ্গমদিগের একটি আখড়া বা মঠ আছে, তথায় একজন গুরু থাকেন। তাঁহার নাম পদট্‌দয়। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহে পট্‌দয় ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। পট্‌দয়গণ কখনো নিজেদের মঠ পরিত্যাগ করেনা, তাঁহাদের কয়েকজন সহকারী থাকে, তাঁহাদের নাম চরন্তি। এই চরন্তিরাই

ধর্মভীরু লিঙ্গায়তদের গৃহে গিয়া অর্থাদি আদায় করে ও মঠে অপরাপর সকল কর্ম নির্বাহ করিয়া থাকে।

জঙ্গমেরা আহারে বড় পটু। পেঁয়াজ রশুন প্রভৃতি খাইতেও ইহাদের আপত্তি নাই তবে কেহ মদ্য, মাংস আহার করেনা।

জঙ্গম পুরুষ মাত্রেই গায়ে বিভূতি, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও চৌকা রূপাম ডিবা এবং লিঙ্গ রাখিবার একটি গুন্দগুর্দগী বা গোলাকার রূপার কৌটা ধারণ করে। স্ত্রী-লোকেরা সকল প্রকার অলংকার পরে। জঙ্গমেরা সাধারনতঃ নম্র, সৎপ্রকৃতি ও অতিথেয়।

জঙ্গমেরা হিন্দু হইলেও বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অপরাপর দেবতার উপসনা করেনা অথবা অপর কোন ব্রাহ্মণকে সম্মান করে না। উল্‌বী ও শ্রীশৈলই ইহাদের প্রধান পুন্যক্ষেত্র।

বিবাহের সময় ইহাদের মধ্যে হলুদের ছড়াছড়ি খুব বেশী। বিবাহের পূর্ব দিন কন্যাকর্তা বরের বাড়ীতে ৫টি পান, ৫টি সুপারী, ৫সের চাউল, ৫টি লেবু, ৫টি হলুদ ও ৫টি চাপ গুড় পাঠাইয়া দেয়। বিবাহের দিন বর ও কন্যা উভয়ের বাড়ীতেই লিঙ্গপূজা ও লিঙ্গায়ত মন্দিরে মাটী দীপ দিয়া 'গুগল' নামক উৎসব করেন।……বর সুন্দর পোশাক পরিয়া কপালে বিভূতি মাখিয়া বৃষভে চড়িয়া মন্দিরে গিয়া পূজা করে। তৎপর বিবাহ করার জন্য শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হয়। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করেন, কন্যা বরের ডান হাত ধরিয়া রাখেন।

বিবাহের পরদিন বরকন্যা বরের গৃহে আসে। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় বরের ভগিনী, ভগিনী যদি না থাকে তবে অপর কোন বালিকা দ্বার আটকাই দাঁড়ায়, আর বলে যে, "তোমাদের মেয়ে হইলে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিবে বল, তবে ছাড়িয়া দিব। বর কন্যা স্বীকার করিলে পথ ছাড়িয়া দেয়।

এদিকে অন্তঃপুরে বরের মাতা ষাঁড়ে জিনের উপর কোল পাতিয়া বসিয়া থাকেন, বর মাতার ডান কোলে ও কন্যা বাম কোলে আসিয়া বসে। বসিয়াই আবার উভয়ে কোল পরিবর্তন করে। তখন পাঁচজন সধবা মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন, "দুটি ফুলের মধ্যে কোন্‌টি ভারী?" মাতা উত্তর করেন, "আমার দুটি ফুলই সমান। আমি চিরদিন সমান ভাবে দুটীকে যত্ন করিব।"

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পুরোহিত মুমূর্ষুর সর্বাঙ্গে বিভূতি ও গোময় লেপন করিয়া কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা পরাইয়া দেয়। মৃত্যু হইলে আমার পুরোহিত আসিয়া পদধূলি দেয়। মৃত ব্যাক্তিকে বসাইয়া একটি থলির মধ্যে পুরিয়া তাহার কণ্ঠস্থ লিঙ্গসহ মাটির মধ্যে পুঁতিয়া ফেলে। জঙ্গমদের মধ্যে তেমন জাতবিচার

নাই। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। বালক ও অবিবাহিতকে লম্বালম্বি শোয়াইয়া পুঁতিয়া ফেলে।

বিশ্বকোষে লেখা, "বাসব পুরানে ইহার বিবরণ বর্ণিত আছে। কিন্তু তৎপাঠে বোধ হয়, এই বাসব হইতেই জঙ্গম সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে।" আর জঙ্গম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে রোশনলালের সেদিনের বক্তব্যের মধ্যে কোন মিল নাই।

সেদিন রোশনলাল আমাকে প্রশ্ন করেন, "জানেনত হিমালয় দুহিতা পার্বতীর সহিত শিবের বিবাহকালে গোলমাল হয়।"

হ্যাঁ রোশনলালজী. বিবাহকালে শিবের গোত্র লইয়া পুরোহিতগণের মধ্যে কি যেন একটা গোলমাল হইয়া ছিল। স্কন্দপুরাণে পড়িয়াছিলাম, এখন যতখানি মনে আছে কাহিনীটি নিম্নরূপ—

বিবাহের কাজ প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। দেবতাগণের আদি দেব শিব। "দেবাদিদেব"। সৃষ্টির আদি অবস্থায় ব্রহ্মা; বিষ্ণু, মহেশ্বর। মহেশ্বরের পূর্বে কাহারও অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে না সত্য, কিন্তু এদিকে আবার গোত্র না জানিয়া শাস্ত্রানুগ পথে বিবাহ কার্যও বা কি করিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। বিবাহের এরূপ অচল অবস্থায় নারদ ঋষি সমস্যার সমাধান করেন। ঝগড়া সৃষ্টি করিতেই উস্তাদ বলিয়া নারদ ঋষির যে চিত্রই অঙ্কিত করা হউক না কেন, যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই আমরা পরিচিত হই না কেন শিব-বিবাহে, এ গোত্র বিষয়ক গোলমাল হইতে নারদঋষি পরিত্রাণ করেন। নারদঋষি শিবের গোত্র জানাইতে গিয়া তাহার বীণাতে 'রাগ' বাজান। পুরোহিতগণ মানিয়া লন শিবের গোত্র 'নাদ', বলিলাম, "রোশনলালজী, শিব-বিবাহে আর কোন কোন গোলমালমাল সম্বন্ধে ত কিছু জানি না।"

আমার নিকট হইতে এই কাহিনী শুনিয়া রোশনলাল বলিলেন, "কি জানি গোত্র লইয়া কোন গোলমাল হইলেও হইতে পারে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। যে কোন শাস্ত্রীয় কার্যের পরই 'দান' করিতে হয়; আর তাহা না হইলে ঐ কার্যটি শুদ্ধ হয় না। ভগবান শঙ্করও বিবাহের শাস্ত্রীয় কার্যের পর পুরোহিতকে 'দান' গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। কিন্তু ভৃগুঋষি শিবের দান গ্রহণ করিতে স্রেফ অস্বীকার করিয়া বসিলেন। একে একে উপস্থিত সব ঋষিই শিবের দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। শিব সর্বপ্রকার নিয়মবিধি মানিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু এখন 'দান' দিতে পারিতেছেন না বলিয়া বিবাহ কার্য সুষ্ঠু সমাধান হইতেছে না। তখন স্বয়ং ভগবান শঙ্কর জং বা থাই হইতে এক মানুষ

সৃষ্টি করেন। সৃষ্ট হওয়ার পর সে মানুষ যখন জানল শিবের দান গ্রহণ করার জন্য স্বয়ং শিব তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তবু সে শুধু হাতে শিবের দান গ্রহণ করিতে সাহস পায় নাই। নন্দী নিকটে দাঁড়ানো ছিল, শিব সৃষ্ট সে মানুষ নন্দীর ঘন্টিতে শিবহস্ত হইতে দান গ্রহণ করেন। শিবের জং হইতে সৃষ্ট মানুষই আমাদের আদি পুরুষ, আমাদের পরিচয় জঙ্গম। আজও আমরা সাধুর দান গ্রহণ করি, তবে হাতে নয়, ঘন্টিতে। আমরা শিবপার্বতী বিবাহ বিষয়ক ও দশনামীর গান গাই।"

রোশনলালের নিকট হইতে জানিলাম তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। তাঁহারা দশজন ছড়ি মিছিলে আসিয়াছেন। তাঁহারা একই পরিবারেব, তবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে থাকেন।

সেদিন সকালে আমি জঙ্গম দলের সঙ্গে. তাঁহারা প্রথম যে সন্ন্যাসী দলেব নিকটে গান গাহিয়াছিলেন সে সময় ছিলাম। সন্ন্যাসী দলের প্রধান বা মোহন্ত গাছের ডালে দোলনার কায়দায় বাঁধা একটি পিড়িতে দেহের অনেকখানি ভর রাখিয়া একপায়ে দাঁড়ানো ছিলেন। এ সন্ন্যাসীকে আমি সব সময় দিন রাত একপ অবস্থায় এক পায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখিয়াছি। দোলনার কায়দায় বাঁধা ভাজ করিয়া কম্বল, ছালার চট বিছানো ছিল। এই এক পায়ে দাঁড়ানো সন্ন্যাসীকে দেখিয়া খুব অনুপ্রাণিত হওয়ার মত কোন কারণ আমার দৃষ্টিতে আসে নাই। দেখিলাম, সন্ন্যাসীর খালি গা, গাছটার মত কি যেন একটা দিয়া কোমবে বেড দেওয়া, কাপড হাঁটু পর্যন্ত। সাধুর শরীরের হাঁটু হইতে কোমর অংশ বাদ দিলে শরীরের কোন অংশেই কোন আবরণ নাই। এ সাধুকে প্রথম দর্শনে আমার মনে কোন ভাল ধারণা হয় নাই। সাধুর এক পায়ে দাঁড়ানো দেখিয়া কিরূপ যেন ধারণা হইয়াছিল—ভক্তের পয়সা আদায়ের ফিকির। কিন্তু দেখিলাম জঙ্গমেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সাধুর সম্মুখে গান গাহিল। এ দলের সাধুরা যে সবাই মনোযোগের সহিত হাতের কাজ বন্ধ করিয়া গান শুনিতেছে এমত নহে, যে যার কাজ করিতেছেন, আবার কাজ করিতে করিতে গানও শুনিতেছেন। আমরা ১০/১৫ জন দর্শক, কেহ বসা, কেহ দাঁড়ানো অবস্থায় গান শুনিতেছি আমার দৃষ্টি ছিল গান শেষে এই আপাত দৃশ্য অতি সাধারণ, সাধু বিদায় বাবদ কত দেয় লক্ষ্য করা। জঙ্গমের গান শেষে ঝুলন্ত পিড়িতে বিছানো ভাজ করা কম্বলের নীচে হাতাইতে হাতাইতে যাহা উঠিয়াছে সবই জঙ্গমের ঘন্টিতে দিলেন। দেখিলাম, মুঠ ভর্তি খুচরা ও এক টাকা, পাঁচ টাকার নোট। সত্যি কথা বলিতে কি এক সাধুর দান বাবদ পয়সা দেখিয়া অবাক হই। কিন্তু আমার অবাক হওয়ার আরও

বাকী ছিল। এক পায়ে দাঁড়ানো সাধু পয়সা দেওয়ার পর জঙ্গমদিগকে জানান—"যাও, সে দিয়ে মহাত্মাদিগকে গান শোনাও।" বিনীতভাবে জঙ্গম জানাইল, "আজ সকালে এখানেই তাঁহার প্রথম গাহিত। সকালের খাওয়াটাও তাঁহারা এখানেই খাইতে চায়।" সাধু হাসিয়া "অবশ্য, অবশ্য" বলিলেন, আমাদিগকে একটু থাকিয়া প্রসাদ লইয়া যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। এক শিষ্যকে নিকটে ডাকিলেন। আমি সব কিছু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিতেছি। সাধু কোমরের ভাঁজ হইতে একটি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া শিষ্যের হাতে দিয়া বাজারে পাঠাইলেন। বলিলেন, "তাড়াতাড়ি আসিবে"। আমাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, "সবকে প্রসাদ দিবে"।

যে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রথমে সন্দেহ হইয়াছিল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য, দুটি পয়সা বেশী পাওয়ার জন্য একপায়ে দাঁড়ানোর ছলনাব আশ্রয় লইয়াছে, সে সন্ন্যাসীকে গান শুনিয়া আট দশ টাকা দান করিতে দেখিয়া, আর সে সমস্ত পরিস্থিতিতে পড়িলে আমরা কয়েক কাপ চা বিস্কিটে কাজ সারিতাম—সেরূপ পরিস্থিতিতে ১০০ ্টাকার নোট দিয়া বাজারে পাঠাইতে দেখিয়া নিজেকে অনেক ছোট মনে হইল। আগের চিন্তার জন্য নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হইলাম। জঙ্গম ও অন্যান্য দর্শকের সাথে প্রসাদ পাইয়া আমি অন্য দিকে পা বাড়াইলাম।

সাধু মেলায় কিছু ইউনিফর্ম পরা লোককে রাস্তা ঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন রাখিতে দেখি। কাঁধে ব্যাচ্ N. A. C. তাহাদের প্রধানের নিকট হইতে জানিলাম N. A. C. মানে Notified Area Committee কর্মক্ষেত্র পাহালগ্রাম টোল হইতে চন্দনবাড়ী পর্যন্ত।

সাধুদের সঙ্গে আলাপ করার পর আমার সন্দেহ হইতে লাগিল। হয়ত সাধুরা একটি ঘটনা বা সাধুদের ভাষায় দুর্ঘটনা গোপন করিতেছেন। নানা ভাবে প্রশ্ন করিয়া দেখিয়াছি, এমন একটা ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহারাও শুনিয়াছে, এইটুকু মাত্র বলেন। মোহন্ত কৃষ্ণানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করি নাই। যে কয়েকবার মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, সে সময় হয় ঘটনাটি জানিতামনা, আর না হয়, আলাপের সময় এই ঘটনার কথা মনে আসে নাই। ঘটনাটি সম্বন্ধে আমি শতকরা ৯৯ ভাগ নিঃসন্দেহ। যদি আমার চার আনি বা শতকরা ২৫ ভাগ সন্দেহ থাকিত তবে এই ঘটনাটি আদৌ উল্লেখ করিতাম না।

ছড়ি মিছিল। হাজার হাজার বৎসর যাবৎ চলিতেছে। সব সময় দশনামী সন্ন্যাসী কাঁধে ছড়ি বহন করিয়া পদব্রজে গুহায় গিয়াছেন। গুহায় প্রজা—ভজনের পর আবার পদব্রজে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এবার সন্ন্যাসীর ভাষায় "কাশ্মীরে

গড়বড়ের" জন্য এই বিপত্তি। কিন্তু এবার অর্থাৎ ১৯৮০ সালের ছাড়ীমিছিল সবটা পদব্রজে হয় নাই। অনন্তনাগ হইতে মার্তণ্ড এর পথে ছড়ি মাত্র তিন কিলো-মিটার পথ পুলিশ বাসে করিয়া আসিয়াছে। এই দুর্ঘটনা হয়ত ১৮ই আগষ্ট সোমবার শুক্লাসপ্তমীর সকালে ঘটিয়া থাকিবে। সেদিন ছড়ি—যাত্রার সূচী অনুযায়ী ছড়ি ভোর (শেষ রাত) ৪টায় বীজবিহারা হইতে যাত্রা করিয়া অনন্ত-নাগ গোতমনাগ হইয়া মার্তণ্ডে আসার কথা। "কাশ্মীরে গড়বর" মানে সাম্প্র-দায়িক দাঙ্গা। মোরাদাবাদে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া দেশের অন্য অনেক স্থানের ন্যায় কাশ্মীরে ও হয়। এই সাপ্রদায়িক দাঙ্গার কারণেই ছড়ি মিছিলে বিপত্তি। পদব্রজের বদলে পুলিশ বাস। হউক না মাত্র তিন কিলো-মিটার পথ, তবু একটা বড খুঁত।

আমি এক সন্নাসীর নিকট হইতে কোন তথ্য পাইলে অন্য সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই তথ্যের যাচাই করিতাম। দেখিয়াছি, যাচাই করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিয়াও আবার নূতন তথ্য পাইতাম। এক সন্ন্যাসীর নিকট "কাশ্মীরে গডবর" বা দাঙ্গার কাহিনী যাচাই করিতে গিয়া নূতন কথা শুনিলাম। কথাটি আমার মনে দাগ কাটিয়াছে। হয়ত সন্ন্যাসী কথাই সত্য। দাঙ্গার কারণ হিন্দু-মুসলমান ভেদজ্ঞান নয়, কারণ অন্য। সে সন্ন্যাসী বলিলেন "অমরনাথ কাশ্মীরে, গুহা বা বাবার তুষার লিঙ্গের আবিষ্কারক মুসলমান। লিঙ্গের পূজারী মার্তণ্ডের ব্রাহ্মণ। ছড়ি বা ঝাণ্ডা বাবা অমরনাথের। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ ও মুসলমানেরা মিলিতভাবে নিজেদের কব্জায় ঝাণ্ডা পাইতে চায়। কিন্তু কৌশলে বা গায়ের জোরে দশনামী হইতে ঝাণ্ডা দখল করা অসম্ভব। তাই এই গোলমাল।" আমি চিন্তা করিলাম ঝাণ্ডার আয়ত্ত কম নয়। পাহালগ্রামে দেখিতেছি ঝাণ্ডা ও ছড়ির বেদীতে ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ ছয়শত টাকা প্রণামী বাবদ পডিতেছে। গুহায় অনেকে সোনার ত্রিশূল রূপার চাঁদ দিয়া লিঙ্গ পূজা করেন। সেখানে কি পরিমাণ আয়।

এক সন্ন্যাসী কথায় অদ্ভুদ দাবী করিলেন। শুনিয়া চমকিয়া উঠি। অবি-শ্বাসের দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকি। কিন্তু তিনি গভীর আত্মবিশ্বাসে দৃঢ়স্বরে কথা বলিতেছিলেন। তাঁহার বলার ধরনেই আর অন্য কোন কারণেই হউক, এত বড় কথাটা ও সে সময় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করি নাই। আজও সন্দেহের দোলায় দোলিতেছি। সন্নাসীর সঙ্গে সাধারণভাবে আলাপ আরম্ভ করিয়া-ছিলাম। বলিয়াছিলাম "এ সমাজ ব্যবস্থা যতদিন আছে, ততদিন বেশ চালাইয়া যান। কোন কাজকর্মে নাই বেশ আছেন। দুবেলা শুধু খাওয়াই নয় বেশ গাঁজার পয়সাও জুটিতেছে।" সে কৌপীন ধারী সেদি মার্ক্স কমিউনিজম নক্সাল এমনকি চারু মজুমদার সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিলেন।

• শোন, নক্সাল বা কমিউনিষ্টরা অন্যকে উন্নত করিতে চায়, এ অসম্ভব, হয়না। কাহারো ভাগ্য বানানো যায়না, যতখানি কপালে থাকে, যতখানি পূর্বজন্মে বাটিয়া দিয়াছে ততখানি হয়। অন্যকে উন্নত করার সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে এমন সমাজ ব্যবস্থা চাই যে সমাজ ব্যবস্থায় সে নিজেকে উন্নত করিতে পারে"। শেষ কথা কয়টি গভীর আত্মবিশ্বাসের সুরে নিজের ভিতর হইতে বলিয়াছেন, "অভিজ্ঞতায় বলিতেছি, কাহাকেও কোটিপতি বানাইয়া দেখিয়াছি, সে আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়াছে।" "কাহাকেও কোটিপতি বানাইয়া দেখিয়াছি" কথা কয়টি আমাকে যথার্থ চমকাইয়া দিয়াছিল। "যতখানি কপালে থাকে, যতখানি পূর্বজন্মে বাটিয়া দিয়াছে" এর দুইটি উদাহরণ সন্ন্যাসী আমাকে দিয়াছিলেন। প্রথমটি এক আদিবাসী সর্দারে। রাঁচীর সন্নিকটে হাতিয়া। হাতিয়াতে বিদেশী সহযোগিতায় হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ কারখানার জন্য জমি দখলের সময় জনৈক নেংটি ধারী আদিবাসী ওঁরাও জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ সরকারের নিকট হইতে লক্ষ টাকা পায়।

নেংটিধারী ওরাও এর আর্থিক অবস্থা অসম্ভব ভাল হয়। কিন্তু কপালে থাকিতে হইবে ত? এখনও সে ওরাও জীবনে ফিরিয়া আসিয়াছে। তবে এখনও তার দুইটি ট্রাক আছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "চিন্তা করিয়া দেখ কোথায় সাত লাখ টাকা, সেও আবার কোন সময়ের টাকা। আর কোথায় ২টি ট্রাক।"

দ্বিতীয় উদাহরণটি বিশ্লেষণ করিয়া 'ভাগ্যের খেলা' এ কথা কি করিয়া অস্বীকার করি। তিনি বলিলেন, "আমাদের রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি ত চরণ সিংকে প্রধান মন্ত্রী বানাইয়া—ছিলেন। চরণ সিং ভারতের প্রধান মন্ত্রী থাকুক তিনি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু চরণ সিং এর কপালে থাকিতে হইবেত? সন্ন্যাসী এবার হাসিয়া বলিলেন "তুমি এখন চরণ সিং এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তুমি কি করিয়া প্রধান মন্ত্রী হইলে আর কি করিয়াই বা মন্ত্রীত্ব হারালে? বেচারা নিজেও বলিতে পারিবে।" এ সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

মেলায় ঘুরিতে এক সাধুকে দেখিয়া এমনি কথা শুরু করার জন্য বলিলাম, "আচ্ছা মহারাজ! শিবের মাথায় চাঁদ কেন?

• শোন বেটা! শিবের মাথায় কেন চাঁদ এসম্বন্ধে আমার একটি নিজস্ব থিয়োরি আঁছে।

খুব উৎসাহিত হইয়া বলিলাম, বেশ বেশ আপনার নিজস্ব থিয়োরিটি বলুন।"

• ভগবান শঙ্কর নৃত্য আবিষ্কার করেন, তুই জানিস?

• ভগবান শঙ্করের আর এক নাম নটরাজ। আমি এইটুকু মাত্র জানি। আর বলিতে পারি দক্ষিণ ভারতে নটরাজের মূর্তি বেশী।

• শোন, শোন, ভগবান শঙ্কর মানুষকে কথা বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা ছাড়াও অন্য মাধ্যমে অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা দেন। অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আমরা হর্ষ, দুঃখ ইত্যাদি প্রকাশ করাই নৃত্য। মনের ভাব অঙ্গভঙ্গি মাধ্যমে ফোটাইয়া তোল, এ সৃষ্টির ও আদি পুরুষ ভগবান শঙ্কর। গঙ্গার জন্ম ত জানিস্ ?

• জানি, মহাদেবের জটা হইতে।

• মহাদেবের জটায় গঙ্গা মাঈ কোথা হইতে আসিলেন।

• জানিনা।

• শোন বেটা, ভগবান শঙ্কর শুধু নৃত্য স্রষ্টাই নন। তিনি খুব বড় গায়ক ছিলেন। গানের সৃষ্টি তাঁরই। একমাত্র নারদ ঋষি জানিতেন যে ভগবান শঙ্কর খুব গান জানেন। একবার নারদ ঋষির ভগবান শঙ্করের গান শুনিতে খুব ইচ্ছা হয়। তিনি শঙ্করকে গান গাওয়ার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভগবান শঙ্কর জানাইলেন যে উপযুক্ত শ্রোতা পাইলে তিনি গান গাইতে প্রস্তুত আছেন। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ঘুরিয়া ভগবান শঙ্করের গান শোনার মাত্র একজন, উপযুক্ত শ্রোতা পাওয়া গেল। তিনি স্বয়ং নারায়ণ। তাঁর গানের উপযুক্ত শ্রোতা না হইয়াও সঙ্গীত আসরে উপস্থিত হওয়ার সাহস দেখাইলেন ব্রহ্মা। শঙ্কর গান শুরু করিলেন। উপযুক্ত শ্রোতা নারায়ণ। আসরে উপস্থিত ব্রহ্মা, এক ধারে নারদ ঋষি আছেন। শঙ্করের গান শুনিতে শুনিতে নারায়ণ ঘামিতে লাগিলেন। সে ঘামে নারায়ণের গা বাহিয়া শ্রীচরনযুগল ধৌত করিতে করিতে নীচে আসি-তেছে। কি মনে করিয়া যেন ব্রহ্মা সে সময় নারায়ণের পদধৌত সে ঘাম তার নিজের কমুণ্ডলে রাখিয়া দেন। এই গঙ্গার জন্ম কাহিনী। গঙ্গার জন্মের কারণ নারায়ণের ঘাম। ঘামের কারণ ভগবান শঙ্করের গান, আগে ত নৃত্যের কথা শুনিয়াছিস। এখন সঙ্গীতের—এসবের প্রথম বা আদি পুরুষ শঙ্কর।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা জানিস ত ? তার প্রথম স্রষ্টা ভগবান শঙ্কর। আমরা যে গ্রহ শান্তির জন্য পাথর ব্যবহারকরি তার গুণাগুণ ও প্রথম ভগবান শঙ্কর পার্ব্বতী-কে জানান। যোগ জানিস ? তারও প্রথম স্রষ্টা ভগবান শঙ্কর। এইরকম। ভগবান শঙ্করের বিদ্যার শেষ নাই। যে বিদ্যায় ভগবান শঙ্করের বিদ্যার একজীবনে অর্জন করিতে পারেনা। এবার শোন আমার থিয়োরী। জ্ঞানী ব্যাক্তকে সর্ব দেশে, সর্বকালে বিদ্বত—সমাজ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। শঙ্করের কালেও এরূপ হইয়া থাকিবে। তথনকার বিদ্বত-সমাজ শিবকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া

থাকিবে। এরূপ সম্বর্দ্ধনায় উপহার দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। এখন চাঁদের কথা। চাঁদ শুক্লপক্ষে এককলা এককলা করিয়া বড় হইতে হইতে পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র দেখা যায়। কিন্তু পূর্ণিমাতেও আমরা সম্পূর্ণ চন্দ্র দেখিনা। চাঁদের এককলা আন্দাজ অংশ আমাদের দৃষ্টির বাইরে থাকিয়া যায়। বিদ্বত-সমাজ চাঁদের সে অদৃশ্য অংশটির এক প্রতিকৃতি তাঁহাদের উপহার হিসাবে শিবকে দেন। তাঁহারা উপহারের মাধ্যমে জানাইতে চান যে স্থানে আমাদের দৃষ্টি পড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব সে স্থানও আপনি দেখেন অর্থাৎ যে জ্ঞান জীবের আয়ত্বের বাহিরে সে জ্ঞানও আপনার অনায়াস আয়ত্বে। ভগবান শঙ্কর বিদ্বত-সামজের শ্রদ্ধার সে অর্ঘ,-চাঁদের এককলার প্রতিমূর্তি নতমস্তকে গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারন করিয়াছেন। তাই শিবের মাথায় চাঁদ। "যা বেটা, এখন যা, আমার কাজ আছে"। এ সাধুর সঙ্গে আরও সময় কাটানোর, আরও কথাবার্তা বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু "যা বেটা, এখন যা," বলার পর আর কি করি প্রণাম করিয়া উঠিয়া অন্য দিকে গেলাম।

২২ শে আগষ্ট বিকাল ৫-২০ মিঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (পর্যটন) ছড়ি প্রণাম করিতে আসিয়াছেন তিনি ছড়ি প্রণামের পর বেদীতে ৮ মিনিট ছিলেন। তিনি মোহন্ত কৃষ্ণানন্দজী সহ বেদীতে উঠিয়াছেন! অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া মন্ত্রী মহোদয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্ন করিতেছেন। মোহন্ত মহারাজ জবাব দিতেছেন। বেদী হইতে প্রসাদ লইয়া নীচে আসিলেন। দশনামী সাধুদের তাঁবু দেখিলেন। কতক্ষণ সাধু সঙ্গ করিয়া একসময় দলবল সহ চলিয়া গেলেন।

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি সাধুদের প্রদত্ত তথ্য আমি অন্য সাধুদের নিকট যাচাই করিয়াছি। কিন্তু সব তথ্য যাচাই করা সম্ভব হয় নাই। এক সাধু বলিলেন, "এখন গরম কাল, তুমি গুহার আগে খুব লম্বা বরফের চাঁই দেখিয়াছ, শীতের দিনের কথা চিন্তা কর। সমস্ত অমরগঙ্গা উপত্যকায় বরফ। কয়েকশ হাত উঁচু হইয়া বরফ জমিয়া থাকে। এমনকি গুহা মুখ পর্যন্ত বরফে ঢাকিয়া যায়। তখন অথাৎ শীতকালেও গুহার ভিতর তিথি অনুযায়ী তুষার লিঙ্গের হার বৃদ্ধি হয়। শীতকালেও চারিদিকে বরফের মধ্যে গুহার ভিতর তুষার লিঙ্গের হ্রাস বৃদ্ধির কাহিনীটি ভালভাবে যাচাই করিতে পারি নাই।

মোহন্ত কৃষ্ণানন্দজী নিকট হইতে শোনা অমর নাথের কাহিনী তুষার লিঙ্গের হ্রাসবৃদ্ধির কাহিনী আমাকে এতবেশী হ্রাস বৃদ্ধি করিয়াছিল যে কাহিনীটি যাচাই-এর প্রশ্ন আসেনা। দ্বিতীয়তঃ আমার বিচারে মোহন্ত মহারাজ হইতে বা উচ্চ-কোটির সন্ন্যাসী এ মেলায় নাই। তাই মোহন্ত মহারাজের কথা বা কাহিনী কাহার নিকট যাচাই করিবে ? তৃতীয়ত যদি কোন সন্ন্যাসী জানিতে পারেন আমি

মোহন্ত মহারাজের কথা যাচাই করিতে আসিয়াছি, তবে আমার কর্মফলতে। সবচেয়ে বড় কথা মোহন্ত মহারাজের বলা কাহিনী যাচাই করার কোন প্রয়োজনই আমি বোধ করি নাই। দু-চার কথা পর যখন এক সন্ন্যাসী, "বেটা অমরনাথের কাহিনী শোন" বলিয়া অমরনাথে কাহিনী বলিতে প্রস্তুতি নিলেন, তখন আমি যে মোহন্ত মহারাজের নিকট হইতে কাহিনী শুনিয়াছি তাহা গোপন করিয়াছি মাত্র। অর্থাৎ আমি আগবাড়াইয়া বলি নাই, সে কাহিনী আগেই মোহন্ত মহা-রাজের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। আমার মনোভাব অনেকটা 'এরূপ, "কাহিনীটি আমার জানা আছে, তবে আপনি বলিতে চান," বেশ ত বলুন। আমি না হয় আর একবার শুনি। তিনি বলিলেন, "এই গুহায় শিবসতীকে অমরকথা শুনায়।"

° অমরকথা? সে আবার কি?

° এমনি কিছু যাহা শুনিলে সৃষ্টির সব রহস্য শ্রোতার নিকট পরিষ্কার হইয়া যায়। শ্রোতা জন্ম-মৃত্যুর উর্দ্ধে উঠিয়া অমর হন। ত্রিজগতে একমাত্র শিবই অমর কথা জানিতেন। এবং শিব যে অমর কথা জানেন এতথ্য শুধু সতী জানিতেন। একদিন কথায় কথায় সতী আবদারের সুরে স্বামীর নিকট অমরকথা শোননোর আবেদন করেন। প্রথমতঃ শিব অমর কথা বলিতে কিছুতেই রাজী হইতেছিলেন না। শ্রীধর্ম কোথায় যাইবে? অমরকথা শুনাইতে শিব যতই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন, ততই যেন অমরকথা শুনার জন্য সতীর জিদ্ চাপিতেছিল। স্বামীর অনিচ্ছা ও স্ত্রীর জিদ্ এসমস্ত ক্ষেত্রে সর্বকালে, সব দেশে যাহা হইয়া থাকে, স্বয়ং ভগবান শঙ্কর তাহার ব্যতিক্রম নন। স্ত্রীর বা সতীর জিদ্ বজায় রহিল, তবে শিব ত, আধুনিক স্বামীদের ন্যায় নিঃস্বত্বে স্ত্রী জিদের নিকট হার স্বীকার করেন নাই কিছু শর্ত সাপেক্ষে সতীকে অমর কথা শুনাইতে রাজী হইলেন। শিবের প্রথম শর্ত, এমন স্থানে তিনি অমরকথা শুনাইবেন সে স্থান সত্যি নির্জন। দ্বিতীয়তঃ আশেপাশে চারিদিকে কোন প্রাণী থাকিতে পারিবেনা। শর্ত দুইটির কারণ ব্যাখ্যায় শিব জানাইলেন অমরকথা যে শুনিবে সে অমর হইয়া যাইবে, তাই ভুলেও যদি কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখী, গাছ-গাড়া, জন্তু-জানোয়ার মানুষ, দৈত্য রাক্ষস ইত্যাদি কোন জীবের মধ্যে কেহ অমরকথা শুনিয়া ফেলে তবে সে অমর হইয়া যাইবে। কোন বিশেষ জাতের পশু বা পাখী, কিংবা মানুষ অমরকথা শুনার পর অমর হইয়া গেলে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এর স্বাভাবিক ধারায় গোলমাল হইয়া যাইবে। বহু অনুসন্ধানে জগতে নির্জনতম স্থান, আবিষ্কৃত হয় একটি গুহা, যে গুহার নিকট কোন জীবের অস্তিত্ব নাই, সে গুহার নিকট কোন জীবের অস্তিত্ব নাই, সে গুহার শিবসতীকে অমরকথা শুনান। সেই গুহাটি অমরনাথ গুহা।

° তা যা বলিয়াছেন মহারাজ। এখন গরমের দিন, এখনও গুহার নিকটে পাথর আর বরফ ছাড়া এমনকি ঘাসও নাই। আর শীতের দিনেত বুঝা যাইতেছে পাথরও থাকিবেনা, সব বরফের নীচে পরিবে। স্বীকার করিতেছি গাছ লতা-পাতা পশু পাখী কিছুই নাই, কিন্তু কীট থাকিতে পারে ত, এমন কীটও আছে যে গুলি খালি চোখে দেখা যায় না।

° বেটা! তোর আমার চোখ আর ভগবানের চোখ, তোর আমার দৃষ্টি আর ভগবানের দৃষ্টিতে তফাৎ আছে। তাছাড়াও ভগবান শঙ্কর শুধু নিজের দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া তৃতীয় নয়নের বহ্নি দিয়া দৃশ্য, অদৃশ্য সমস্ত জীবকে দাহ করেন। কোন জীবেরঅস্তিত্বের ঝুঁকি নেন নাই। প্রাণীবিহীন স্থান সেই গুহায় শিব সতীকে অমর কথা শুনান।

° মহারাজ কিছু মনে করিবেন না। আমার যেন কিরূপ সন্দেহ হইতেছে। যেখানে একান্ত নির্জনে শিব শুধু সতীকে অমর কথা শুননি সে কথা আপনি কি করিয়া জানিলেন?

সন্ন্যাসী আমার সন্দেহের কথা শুনিয়া কতক্ষণ কিছু বলেন নাই। তিনি বসা অবস্থায় ছিলেন। ডান হাঁটুর উপর ডান হাতের কনুই ভর দিয়া চিবুকের নীচে বুড়ো আঙ্গুল ও ঠোঁটে মধ্যমা দিযা মৃদু মৃদু আঘাত করিতে করিতে বলিলেনে, "হ্যঁম, বেটা, হ্যঁম।" দেখিয়া বুঝিলাম তিনি রাগ করেন নাই। তাহাকে কিরূপ যেন চিন্তান্বিত দেখাইতেছিল। হঠাৎ যেন ঘুম হইতে উঠিলেন, 'শোন, শোন বেটা শোন্, সর্বপ্রকার প্রস্তুতি লইয়া শিবসতীসহ গুহায় আসিয়া অমরকথা শুনানোর জন্য স্বীয় বাঘছাল আসনে বসিলেন। একেবারে শেষ সময় অর্থাৎ অমর কথা শুরু করার আগের মুহূর্তে শিব তৃতীয় নয়নের বহ্নি দ্বারা প্রাণীদিগকে ভয় দেখাইয়া দূরে সরাইয়া দেন। একটি তোতা পাখী শিবের আসনের সাথেই বসা ছিল।"

আমার জিব পিছলা কথা, বলিলাম, "মহারাজ, তোতা নয়, ময়না।"

° "না, না, ময়না নয়। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তোতা।" সাধুর মুখ হইতে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া অবাক হইলাম। তোতা সম্বন্ধে সাধুর আত্মবিশ্বাস দেখিয়া মনে মনে সংকুচিত হইলাম, সাধুর সঙ্গে কথোপকথন আমার মুখে হইতে আর কোন ফাজিল কথা বাহির হয় নাই, আমার শিক্ষা হইয়া গিয়াছিল।

° হ্যঁম, যাহা বলিতেছিলাম, শোন তোতা শিবের আসনের নিকটে থাকায় তোতার গায়ে ততটা আগুনের তাপ লাগিতেছিল না। কিন্তু তাপের তীব্রতা

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তোতারও এস্থানে থাকা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। আসলে তোতাটি তার ডিমে তা দিতেছিল। ডিমের মায়ায় তীব্র আগুনের তাপ সহ্য করিয়াও তোতা কোনরূপে ছিল। যখন এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল, এ তাপে আর থাকা যায় না তখন বাধ্য হইয়া তোতা সর্বশেষে ফুরুৎ করিয়া উড়িয়া গুহার বাহিরে যায়। তোতাকে উড়িয়া গুহার বাহির হইতে দেখিয়া শিবও নিঃসন্দেহ হন। যাক্, শেষ প্রাণীটিও চলিয়া গিয়াছে, এখন পার্বতীকে অমর কথা শুনানো যায়। এদিকে ডিম, প্রাণী না জড়? ডিমের উপর এতক্ষণ তোতা থাকায় শিবসৃষ্ট আগুনের তাপ ডিমের উপর পড়ে নাই। আবার সর্বশেষে তোতা উড়িয়া যাইতে দেখিয়া শিবও প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তৃতীয় নয়ন স্বাভাবিক করিলেন। অলক্ষ্যে ডিম শিবের আসনের নিকটে রহিয়া গেল। ডিমকে প্রাণী ধরিলেও আগুনের তাপে বাহিরে যাওয়ার কোন ক্ষমতা ডিমের নাই। ডিম চলৎশক্তিহীন, শিবের দৃষ্টিতে পড়িলে হয়ত ডিমকে জায়গায় থাকিয়া অসহায়ভাবে পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইতে হইত।

শিব অমর কথা শুরু করিলেন। কিন্তু এদিকে মায়ার প্রভাবে সতী ঘুমাইয়া পড়িলেন। আবার তাপের প্রভাবে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। তোতার বাচ্চা ডিমের খোলসের ভিতর হইতেই শিবের শ্রীমুখ নিসৃত অমর কথা শুনিতে থাকে। তোতার বাচ্চা সেয়ানা হয়। শিবের প্রতি কথায় তোতার বাচ্চা 'হুঁম, হুঁম' করিতে থাকে। এই আওয়াজে ভগবান শঙ্কর মনে করেন সতী সব শুনিতেছেন। বেশ কিছুদিন এরূপ কাহিনী বলা ও তোতার বাচ্চার শোনার পর হঠাৎ কি করিয়া যেন তোতার বাচ্চা ভগবান শঙ্করের নজরে পড়ে। ভগবান শঙ্কর বুঝিলেন তোতার বাচ্চা অমর হইয়া যাইতেছে। তাহাতে অর্থাৎ তোতার অমরত্ব লাভ হইলে সৃষ্টির ধারা বদল হইয়া যাইবে। সৃষ্টির ধারা অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে এ বাচ্চাকে এখনই ধ্বংস করিতে হয়। কিন্তু তোতার বাচ্চা যতখানি অমরকথা শুনিয়াছে তাহাতেই ত্রিজগতে একমাত্র ভগবান শঙ্কর নিজে তাহাকে ধ্বংস করিতে সক্ষম। অন্য কেহ তোতার এ বাচ্চাকে মারিতে পারিবে না। সৃষ্টির ধারা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ভগবান শঙ্কর তোতার বাচ্চাকে মারিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি অমরকথা বলা বন্ধ রাখিয়া ত্রিশূল খুঁজিতেছেন দেখিয়া সবটা ব্যাপার বুঝিতে তোতার বাচ্চায় মুহূর্তমাত্র সময় লাগে নাই। চক্ষের পলকে তোতার বাচ্চা উড়িয়া গুহার বাহিরে গেল। এবং উড়িয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। ভগবান ত্রিশূল ছুড়িলেন। তোতার বাচ্চা প্রানপণ জোরে উড়িতেছে। পিছন পিছন শিবের ত্রিশূল শূন্যে ধাওয়া করিয়া আসিতেছে। ধীরে ধীরে তোতার বাচ্চার ও ত্রিশূলের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়া আসিতেছে ;

অর্থাৎ যে গতিতে তোতার বাচ্চা উড়িতেছে, তার চেয়ে বেশী গতিতে ত্রিশূল আসিতেছে। তোতার বাচ্চা প্রাণ রক্ষার জন্য বদ্রীনারায়ণের পথে উড়িতেছিল। হয়ত চিন্তা করিয়া থাকিবে, শিবের হাত হইতে যদি কেহ রক্ষা করিতে পারেন, তবে সে নারায়ণ স্বয়ং। পথে এক সময়ে তোতার বাচ্চা লক্ষ্য করিল যে গতিতে ত্রিশূল আগাইয়া আসিতেছে তাহাতে বদ্রীনারায়ণ পৌঁছার আগেই শিবের ত্রিশূলে প্রাণ যাইবে। প্রাণ রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে তোতার বাচ্চা উড়িতেছে। বদ্রীপথে ব্যাস মুনির আশ্রম। ব্যাস মুনির আশ্রমের নিকট ত্রিশূল প্রায় তোতার বাচ্চাকে স্পর্শ করে করে অবস্থা। মৃত্যু শিয়রে, এমন সময় তোতার বাচ্চা দেখিল মুনিপত্নী নদীতে স্নান শেষে যে উর্দ্ধমুখে সূর্যের দিকে চাহিয়া সূর্যের স্তবরতা। প্রাণের দায়ে তোতার বাচ্চা এই সুযোগে মুনিপত্নীর মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়া সোজা জঠরে আশ্রয় লইল। যার তায় ত্রিশূল নয়, স্বয়ং ভগবান শঙ্করের ত্রিশূল। যথেষ্ঠ কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন। কিন্তু তোতার বাচ্চার একি ব্যবহার। মুনিপত্নীর জঠরে আশ্রয় লওয়া? ত্রিশূল চিন্তা করিতেছে, "আমার উপরে আদেশ তোতার বাচ্চাকে মারার জন্য। মানুষ! বিশেষতঃ স্ত্রীলোক। তদুপরি মুনিপত্নী। কি করিয়া হত্যা করি?" ত্রিশূল চিন্তা করিতেছে, চিন্তা করিতেছে কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারিতেছেনা। আবার তোতার বাচ্চা না মারিয়া গুহায়ও ফিরিতে পারিতেছেনা।

এদিকে যে সময় তোতার বাচ্চাকে মারিয়া গুহায় ফিরিয়া আসার কথা সে সময় অনেক আগেই উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ত্রিশূল ফিরিতেছেনা দেখিয়া সবটা বিষয় বুঝার জন্য শিব ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানের মাধ্যমে শিব ত্রিশূলের দূরবস্থার কথা জানিতে পারিলেন। ত্রিশূল অচল হইয়া রহিয়াছে। তখন স্বয়ং শঙ্কর গুহা হইতে ত্রিশূলের নিকট আসেন এবং সাধারণ সাধুর ছদ্মবেশে বেদব্যাসের কুটীরের নিকট ধূনি জ্বালাইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। শিব চিন্তা করিলেন তোতার বাচ্চা যেহেতু মুনিপত্নীর গর্ভস্থ হইয়াছে অতএব প্রসবের একটা ব্যাপার অবশ্যই থাকিবে। বেশী হয়ত তোতার বাচ্চা দশ মাস দশ দিন ব্যাস-পত্নীর গর্ভে থাকিবে তারপর তাকে অবশ্যই বাহির হইতে হইবে। তোতার বাচ্চাকে আর বিশ্বাস নাই। আমার ত্রিশূলকে কলা দেখাইয়াছে। সব সময় চোখে না রাখিলে তোতার বাচ্চা আমাকেও কলা দেখাইয়া কোনদিকে সটকাইয়া পড়িবে কে জানে মুনিপত্নীর গর্ভধারণ কাল এখানেই সাধারণ সাধুর ছদ্মবেশে ধূনি জ্বালাইয়া অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। এদিকে দশ মাস দশ দিন দূরের কথা,

বহু বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। মুনিপত্নী গর্ভে সন্তান ধারণ করিয়া আছেন কিন্তু প্রসব হইতেছে না। দীর্ঘ ১৬ বৎসর যাবৎ স্বীয় পত্নীকে গর্ভধারণ জনিত অসুবিধা ভোগ করিতে দেখিয়া শেষমেষ বেদব্যাস পত্নীর গর্ভস্থ সন্তানকে মিনতি জানায়, "বাবা! তুমি যেই হও, একটু কৃপা কর। আমার পত্নীকে, তোমার গর্ভধারিণী মাকে আর কষ্ট দিও না। অনুগ্রহ করিয়া বাহির হও।" গর্ভস্থ সন্তান নিজের দুরবস্থার কথা জানায়। মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুটীরের সামনে ধ্যানের আছিলায় বসা ঐ সাধু তাহাকে হত্যা করিবে। "কী? সদ্যোজাত কোন ঋষি সন্তানকে হত্যা করিবে এক সাধু! এ অসম্ভব। নিশ্চয় এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। "রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ব্যাসমুনি ধ্যানে বসেন। ধ্যানে সব পরিষ্কার হয়। তারপর বেদব্যাস গর্ভস্থ সন্তানের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সন্তান রক্ষার জন্য তপস্যা দ্বারা শিবকে তুষ্ট করেন। শুকদেব ঋষির আবির্ভাব হয়। মুনিপত্নী গর্ভ-বহন জনিত কষ্ট হইতে মুক্ত হন।" কথিত আছে, শিব কিছু শর্ত আরোপ করিয়াছেন। শর্তগুলির অন্যতম এ জাতক কোথায় ও একস্থানে থাকিতে পারিবে না। সব সময় তাহাকে চলিতে হইবে। প্রয়োজন বোধে বেশী হয়ত এক গাভী দোহন কাল পর্যন্ত কোন স্থানে থাকিতে হইবে।

এ সন্ন্যাসীকে প্রণাম করার পর আর কোন গল্প করার মত কথোপকথম কোন সাধু সন্ন্যাসির সহিত হয় নাই। আমারও তৃপ্তি আসিয়াছিল, মনে হইতে লাগিল ছড়িমিছিল দেখার জন্য শ্রীধগরে গিয়া আরমে বিশ্রাম করার পরিবর্তে কষ্ট করিয়া পাহালগ্রামে থাকা সর্বাংশে সার্থক হইয়াছে।

২৩শে আগষ্ট ভোর কি শেষ রাত ৪টায় ছড়ি মিছিল এখান হইতে চন্দন বাড়ী উদ্দেশ্য রওয়ানা হইতেছে। এখন ২২শে আগষ্টের সন্ধ্যা। প্রায় সাড়ে সাতটা বাজিতেছে। আর বড় জোর এক ঘণ্টা, আমার সাধু সঙ্গ করার সুযোগ আছে। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ দশনামীদের তাঁবু সমূহ নিঝুম হইয়া যায়। মেলার অন্যদিকেও লোক চলাচল কমিয়া আসে। তীর্থ যাত্র, সাধু ও দোকানদার ব্যতিন অন্যান্য গ্রাম বাসী যে যার গ্রামের উদ্দেশ্যে চলিয়া যায়।

আমার মনে আপসোস হইতে লাগিল। আর ত মোটে একঘণ্টা। তারপর মেলা আস্তে আস্তে নিঝুম হইতে থাকিবে এই এক ঘণ্টার মধ্যে সাধুদের সঙ্গে আলাপের শেষ সুযোগ। কাল শেষরাতে সব সাধুসন্ন্যাসী ছড়ি মিছিলের সামিল হইয়া চন্দনবাড়ী রওয়ানা হইয়া যাইবেন।

এরূপ অবস্থায় মনে হইল, তাহত, শেষনাগ! শেষনাগ হ্রদে শেষনাগের

সশরীরে অবস্থিতি সম্বন্ধে আমি হোটেলওয়ালা, হোটেলের চাকুরে, ঘোড়াওয়ালা কুলী সবার মতামত নিয়াছি। এ সুযোগে সাধুদের মতামত লই না কেন? এতক্ষণ পর্যন্ত সাধুর স্তর বিচারে নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়াছিলাম। এখন চিন্তা করিলাম, হাতে সময় কম, কয়েকজন 'উচ্চস্তরের সাধুর শেষনাগ সম্বন্ধে মতামত লই। প্রথমে দশনামীগণের কারবারীকে, তিনিও সাধু। খুঁজিয়া বাহির করিলাম, তাহাকে আমার উদ্দেশ্য জানাইয়া কয়েকজন উচ্চস্তরের সাধুর নিকট লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি কয়েকজন সাধুর নিকট লইয়া গেলেন এবং আশ্চর্য এ মহাত্মগণও বলিলেন শেষনাগ হ্রদে শেষনাগ থাকেন, তাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমার কথা বলার ধরণে কেহ যেন মনে না করেন, এ মহাত্মগণ একসঙ্গে ছিলেন। কারবারী সাধু আমাকে একজন মহাত্মার পর অন্য আরেকজন মহাত্মার নিকট লইয়া যাইতেছিলেন, আমি হিন্দীতে মহাত্মাদিগকে প্রশ্ন করিতাম, তাহারা হিন্দীতে জবাব দিতেন; কিন্তু কোন কোন সময় 'কারবারী মহারাজ' আমার হিন্দী বক্তব্যটি হিন্দীতে মহাত্মাকে বুঝাইয়াছেন। আবার কোন কোন সময় মহাত্মার হিন্দী বুঝিতে 'কারবারী মহারাজের' সাহায্য লইয়াছি। 'কারবারী মহারাজ আমাদের কথোপকথনের সময় প্রয়োজনবোধের দ্বিভাষীর ন্যায় 'উচ্চারণান্তর' করিয়াছেন।

তবু শেষনাগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছিলাম না। তখন রাত আটটা দশ। হঠাৎ কারবারী মহারাজ বলিলেন, "চল, তোমাকে এক মহাত্মার কাছে লইয়া যাই। তিনি কোন গৃহে থাকেন না, এখন এখানে আছেন। আমাদের সঙ্গে থাকিয়াও তাঁবুর ভিতর থাকেন না। দিনেরও বেলায় ত কথাই নাই, রাতেও তাঁবুর ভিতরে যান না। আমি জানি তিন বৎসর শেষনাগ হ্রদের পাড়ে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছেন।" 'কারবারী মহারাজ' কিরূপ যেন নির্বিকার ছিলেন। যেন শেষনাগ সে হ্রদে আছে কি নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন মাথা ব্যাথা নাই। আমি সাহায্য চাহিয়াছি, তিনি যথাশক্তি সাহায্য করিতেছেন মাত্র। নির্বিকার ভাব। আমরা মহাত্মার নিকট গেলাম। দেখিলাম এই মহাত্মা অন্য আর দশজন সাধুর মতই। ইনি যে উচ্চস্তরের সন্ন্যাসী আমার দ্বারা বাহির করা অসম্ভব ছিল। দেখিলাম, তিনি আর অন্য দশ জন সাধু সাধুর মতই ভাঁজ করা কম্বলের উপর বসা অবস্থায় আছেন। মাঠে, ঘাসের উপর বসা। এমন কত সন্ন্যাসীই ত আছেন। ইনি যে রাতে, প্রচণ্ড শীতেও তাঁবুর ভিতরে যান না, অন্য কেহ বলিয়া না দিলে সে কথা জানা অসম্ভব। আমি মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া মহাত্মার সম্মুখে ঘাসের উপর বসিলাম। 'কারবারী মহারাজ' মহাত্মাকে আমার আসার উদ্দেশ্য নিবেদন

করিলেন। মহাত্মা জানাইলেন তিনি একটানা তিন বৎসর শেষনাগ হ্রদের নিকটে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "বেটা! হ্রদে শেষনাগ থাকেন এ বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। আমি শেষনাগ দেখিয়াছি বলিলে সবটা বলা হয় না। আমি বহুদিন শেষনাগকে খাওয়াইয়াছি। আমি শেষনাগের উদ্দেশ্যে খাবার রাখিয়াদিতাম। দেখিতাম কোন সময় যেন আমার অলক্ষ্যে শেষনাগ আসিয়া খাইয়া যাইতেন।" আমি মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া 'কারবারী সাধু'সহ চলিয়া আসিলাম। রাত প্রায় সাড়ে আটটা হইতে চলিয়াছে। 'কারবারী সাধু' আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজের তাঁবুর দিকে রওয়ানা হইলেন।

আমার মাথা ভার-ভার ঠেকিতেছে। "চিন্তায় জর্জ্জরিত" বলিয়া একটি কথা জানি। চিন্তায় জর্জ্জরিত বলিতে কি বুঝায় হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছি। সমস্ত চিন্তা জুড়িয়া আছে একমাত্র শেষনাগ।

মোহন্ত মহারাজের তাঁবুর সম্মুখে আসিলাম। মোহন্ত মহারাজের তাঁবুও প্রায় ফাকা। মাত্র তিন চার জন গৃহী, একজন সন্ন্যাসী। সম্ভবতঃ এই সন্ন্যাসীই নরেন্দ্র গিরি, ছড়ির দায়িত্বে আছেন। তবে সন্ন্যাসী যে এখানকার পাঁচ ছয় শত দশনামীয় দ্বিতীয় ব্যক্তি, এ ধারণা আমার আগেই হইয়াছিল। প্রথম ব্যক্তি মোহন্ত কৃষ্ণানন্দজী স্বয়ং দ্বিতীয় ব্যক্তি এই মহাত্মা।

দুপুরে একবার মোহন্ত মহারাজের তাঁবু দেখিয়াছিলাম। তখন তাঁবুটি ভক্ত মহিলাগণ সম্পূর্ণ দখল করিয়াছিলেন, তখন মহিলা ছাড়া অন্য কোন পুরুষের পক্ষ মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে আলাপ করা প্রায় একরূপ অসম্ভব ছিল। সন্ধ্যায় দেখিলাম এখানকার মুসলমান কুলী, ঘোড়াওয়ালারা মোহন্তমহারাজের তাঁবু সম্পূর্ণ দখল করিয়াছে। কাশ্মীরী ভাষায় মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। কাশ্মীরী ভাষা বুঝিনা সত্য, তবে সে সময় প্রতি কথায় প্রত্যেককে হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে দেখিয়া বুঝিলাম খুব অন্তরঙ্গ পরিবেশে তাহারা মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা বলিতেছে। বুঝা যাইতেছিল মোহন্ত মহারাজ আলোচনার নেতৃত্ব করিতেছেন না, তিনিও তাহাদের একজন হইয়া তাহাদের সম্মিলিত-সৃষ্ট আনন্দের ভাগ লইতেছেন মাত্র। এ পরিবেশ দেখিয়া কে বলিবে মোহন্ত মহারাজ এই মুসলমান কুলী ঘোড়াওয়ালাদের একজন নন? এখন মোহন্ত মহারাজের ফাঁকা তাঁবু দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি আজকের মত দর্শনার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎদান শেষ করিয়াছেন। তবু শেষ চেষ্টা হিসাবে তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া নীচু স্বরে মোহন্ত নরেন্দ্র গিরিকে অনুরোধ করিলাম, "মহারাজ! আপনি আমার

তরফে মোহন্ত মহারাজাকে প্রশ্ন করুণ না, শেষনাগ হ্রদে শেষনাগ আছে কি নাই ? আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি সোজা হাত দিয়া আমাকে মোহন্ত কৃষ্ণানন্দজীকে দেখাইয়া দিলেন। মোহন্ত কৃষ্ণানন্দজী খাটিয়ার উপর বসা ছিলেন। মোহন্ত নরেন্দ্র গিরি তাঁবুর মেঝেতে খাটিয়ার সঙ্গে বসা ছিলেন। দুই মহাত্মার মধ্যে দূরত্ব বড় জোর তিন হাত মাত্র। আমি আর একটু আগাইয়া মোহন্ত কৃষ্ণানন্দজীকে প্রণাম করিয়া খাটিয়ার নিকটে মেঝেতে বসিলাম। মৃদু হাসিয়া মোহন্ত মহারাজ বলিলেন, তুমি আবার কি ঝামেলায় পড়িয়াছ ?" আমি ধীর লয়ে বলিলাম, "বাবা !" তারপর ছোটরা যেমন দ্রুত গতিতে মুখস্থ পড়া বলে অনেকটা সেইরূপ দ্রুতগতিতে বলিতে লাগিলাম। "বাবা ! আমি আগের তলায় শান্তিদার মুখে শুনিয়াছি শেষনাগ হ্রদে শেষনাগ থাকেন। নিজে শেষনাগে গিয়া হোটেলওয়ালা চরণ সিংকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে বলিয়াছে, সে তিনবার শেষনাগ দর্শন করিয়াছে, শেষনাগে খালসা-জনতা হোটেলের কর্মচারী কর্ণেল সিং বলিয়াছে সে কম করিয়াও দশবার শেষনাগ দর্শন করিয়াছে। শেষনাগের অন্য আরেক হোটেল কর্মচারী গরীব সিং দাবী করিয়াছে সে তিনবার শেষনাগ দর্শন করিয়াছে। আমি সেখানে কুলী ঘোড়াওয়ালা অনেককে প্রশ্ন করিয়াছি সবাই বলিয়াছেন যে তাহারা শেষনাগ দর্শন করিয়াছে। এখন এখানে এই ছড়ি মিছিলেও বহু মাহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি সবাই বলিয়াছে তাঁহারা স্বচক্ষে শেষনাগ দর্শন করিয়াছেন। এমন মহাত্মার সঙ্গেও আলাপ হইয়াছে যিনি শেষনাগ হ্রদের ধারে থাকিয়া দীর্ঘ তিন বৎসর তপস্যা করিয়াছেন। সে মহাত্মা বলিয়াছেন, তিনি নিজে শেষনাগকে খাওয়াইয়াছেন !"

এতক্ষণ একটানা দ্রুত কথা বলিয়া চুপ করিলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তারপর ? তারপর কি ? হয়ত নিজের অজ্ঞাতেই নিজের মাথা হাতাইতে ছিলাম। তিনি আবার মৃদু হাসিসহ বলিলেন, "মাথা হাতাইতেছিস কেন ? তারপর ? তারপর কি হইল ?" বলিলাম, "বাবা ! এখন আপনি বলুন ভগবান শঙ্করের গলায় যে নাগ থাকে, সে নাগকে আমরা শেষনাগ বলিয়া জানি। সে নাগ শেষনাগ হ্রদে থাকে। পঞ্চ মস্তক বিশিষ্ট নাগ মাঝে মধ্যে শেষনাগ হ্রদের জল হইতে ভক্তকে দর্শন দেন।"

ঃ দূর বোকা ! তোকে কে বলেছে ভগবান শঙ্করের গলায় সাপের পাঁচ মাথা ? ভগবান শঙ্করের সে নাগের সহস্র মুণ্ড, শোন, আমি বহুদিন শেষনাগ হ্রদের পাড়ে ছিলাম। সেখানে তপস্যা করিয়াছি, স্নান করিয়াছি, সাঁতার কাটিয়াছি, জলে ডুবও দিয়াছি। আমি ভাল করিয়া দেখিয়াছি। এমন কি হ্রদের

পাড়ে দাঁড়াইয়া দূরবীন দিয়াও অনেকবার দেখিয়াছি। সব জলমুর্গী। একজাতের ছোট ছোট চিড়িয়া, হিমালয়ের বরফ অঞ্চলে থাকে। সব সময় বরফের নীচে দিয়া যে জল চলে সে জলে দৌড়াদৌড়ি করে। এ সমস্ত জলমুর্গী ছোট ছোট দলে দলবদ্ধভাবে থাকে। কোন দলে পাঁচটা, কোন দলে হয়ত সাতটা। বুঝলি, জলমুর্গীর দেহটি ছোট কিন্তু ঘাড় বেশ লম্বা। প্রায় হাত খানেক। জলমুর্গী দলের একটা চিড়িয়া যখন জল হইতে উপরে মাথা তোলে তখনও দেহটি জলের মধ্যেই থাকে কিন্তু লম্বা ঘাড়ের জন্য একহাত উচুতে মাথাটি দেখা যায়। এদের বিশেষত্ব হইল, একটু উপরে মাথা তুলিলেই এক পলকে দলের অন্য সব কয়টি জলমুর্গী উপরে মাথা তোলে। একটি চিড়িয়া ডানদিকে তাকাইলে অন্য সব কয়টি পলকে ডানদিকে তাকায়। একটি বাঁদিকে ঘাড় বাঁকাইলে অন্য সব কয়টি পলকে পলকে বাঁদিকে ঘাড় বাঁকায়। একটি ডুব দিলে পলকে অন্য সব কয়টি জলে ডুব দেয়। এখন চিন্তা কর। শেষনাগ হ্রদের জল। মনে হয় সব সময় জল হইতে কেন ধোঁয়া উঠিতেছে। তার উপর কুয়াশা, মেঘ ত আছেই। আবার সবাইকে বেশ উচু হইতে হ্রদ দেখিতে হয়। এখন এই জলমুর্গীগুলি যখন পাশাপাশি থাকিয়া প্রায় একসঙ্গে জল হইতে উপরে মাথা তোলে তখন তাদের লম্বা ঘাড়ের জন্য মনে হয় যেন কোন একটি জীবের কয়েকটি মাথা। যখন জলমুর্গীগুলি সোজা পথে চলে তখন মনে হয় জীবটি কয়েকটি মাথাসহ সম্মুখদিকে যাইতেছে। চক্ষের পলকে সবগুলি জলমুর্গী ডানদিকে কি বামদিকে ঘুরিলে মনে হয় জীবটি তার সবকয়টি মুণ্ডই একসঙ্গে ডানদিকে বা বাঁদিকে ঘুরাইতেছে। আবার প্রায় একই সঙ্গে সবগুলি জলে ডুব দেয়। তখন মনে হয় জীবটি এতক্ষণ দর্শন দিতেছিল এখন জলের তলায় আশ্রয় লইয়াছে। একারণে লোকমুখে মুখে প্রচার হইয়া গিয়াছে। এখানে অর্থাৎ শেষনাগ হ্রদের জলে ভগবান শঙ্করের গলার নাগ শেষনাগ থাকেন। মানুষ আসলে যাহা দেখে সব জলমুর্গী।"

মোহন্ত মহারাজ কৃষ্ণানন্দজীর কথায় মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান হইয়া গিয়াছে। আমি আনন্দিত। আমি তৃপ্ত, তাঁবুর মেঝেতে বসিয়া দেখিলাম দশনামীর অন্য সব তাঁবুর বাতি কোন্ সময় নিভিয়া গিয়াছে। সব নীরব। প্রায় সব সাধু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আগামীকাল শেষরাতে তাহারা আবার চন্দন-বাড়ীর পথে রওয়ানা হইবেন। আমি কথা আরম্ভ না করিলে, মোহন্ত মহারাজকে জাগাইয়া না রাখিলে হয়ত এর মধ্যে তিনি নিদ্রা যাইতেন। আমার জন্য মোহন্ত মহারাজের বিশ্রামে ব্যাঘাত হইল চিন্তা করিয়া খারাপ লাগিতেছিল। আমি মুখে কিছু বলি নাই, মহারাজকে প্রণাম করিয়া বিদায় নেওয়ার সময় আমার মনে

ঐরূপ চিন্তা ছিল। আমি সজ্ঞানে বলিতেছি, আমার তখন কার চিন্তা ও চিন্তার জন্য মন খারাপ হওয়া সবটা তাঁহার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ছিল। তাহা না হইলে আমার প্রণামের পর আমাকে আশীর্ব্বাদ করার সময়ে তিনি কি করিয়া বলেন ? আমার বিশ্রামে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। আমি ছড়ি-মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে শেষরাত চারটায় রওয়ানা হইতেছিন।। ছড়ি-মিছিল রওয়ানা হওয়ার অনেক পরে আমি সকাল প্রায় সাতটায় এখান হইতে চন্দনবাড়ীর উদ্দেশ্যে যাইতেছি।"

আমি নিজের কথা আর কি বলিব ? কোনরূপে যেন স্বাভাবিকভাব বজায় রাখিয়া মোহন্ত মহারাজের তাঁবু হইতে বাহির হইতেছি। তারপর বাকী পথটা আমার বিশ্রামস্থল শিখ গুরু দোয়ারার দোতালায় নিজের বিছানায়—আনন্দে হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে আর মনে মনে চিৎকার করিতে করিতে আসিলাম। আমি যেন চিৎকার করিয়া যাহাকে সামনে পাই তাহাকেই বলিতেছি, "শুনুন মহারাজ! আপনি দশনামী ? বেশ, শুনুন। মোহন্ত কৃষ্ণানন্দজী এইমাত্র আমাকে বলিয়াছেন শেষনাগ হ্রদে শিবের শেষনাগ থাকেন বলিয়া আপনারা যে দাবী করেন তাহা কোন নাগ-ফাগ নয়, নেহাৎ জলমুর্গী।

শুনুন মহারাজ! আপনি দশনামী ? দশনামী নন ? বেশ শুনুন, আমাকে দশনামীগণের মোহন্ত মহরোজ কৃষ্ণানন্দজী বলিয়াছেন, শেষনাগ হ্রদের জলে মধ্যে মধ্যে যাহা দেখা যায় তাহা শিবের গলায় নাগ নয়, নেহাৎ জলমুর্গী।

শুনুন, আপনি কে ? তীর্থযাত্রী ? গুহায় যাইতেছেন ? শেষনাগ হ্রদের জলে শেষনাগের দর্শন আকাঙ্ক্ষা রাখেন ? জানিয়া রাখুন, সেখানে কোন নাগ নাই, সব জলমুর্গী।

শুনুন, আপনি ? আপনি কে ? তীর্থযাত্রী ? গুহা হইতে ফিরিতেছেন ? শেষনাগ হ্রদে স্বচক্ষে শেষনাগ দর্শন করিয়াছেন, তাই না ? এখন জানিয়া রাখুন, আপনি শেষনাগ দর্শন করেন নাই। নেহাৎ জলমুর্গী দেখিয়াছেন। দশনামী আখড়ার মোহন্ত মহারাজ কৃষ্ণানন্দজী এইমাত্র আমাকে বলিয়াছেন সব জলমুর্গী।

এমন ভাবেই মনে মনে চিৎকার করিয়া হাত-পা ছুড়িতে ছুড়িতে একই সঙ্গে আনন্দের আতিশয্যে হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে নিজের বিছানায় আসিয়া শুইলাম।

চারিদিকের গোলমালে ঘুমের আশায় বিছানায় শুই নাই। সময় কাটানোর জন্য শুইয়াছি। শেষরাত চারটার সময় উঠিতে হইবে। ছড়ি-যাত্রা দেখিব। ছড়ি-মিছিল, সাধুমিছিল দেখিব। কত কিছু চিন্তা করিতেছি আবার একই সঙ্গে মনে মনে চিৎকার করিতেছি, "ওহে! ঘোড়াওয়ালা, ওহে কুলী, শোন।

এতদিন শেষনাগ হ্রদের জলে যে জীবকে দেখিয়া পাঁচ মথাসহ শিবের নাগ জানিয়াছ এবং সরল বিশ্বাসে শেষনাগ হ্রদের জলে শেষনাগের অবস্থিতি সম্বন্ধে তীর্থযাত্রীকে বলিয়াছ, কোন নাগই নয়। দশনামী আখড়ার মোহন্ত মহারাজ কৃষ্ণানন্দজী বলিয়াছেন, সব জলমুর্গী। তোমরা একত্রে কয়েকটি জলমুর্গীর মাথা দেখিয়া মনে করিয়াছ একটি সাপের পাঁচ মাথা।

শেষনাগ হ্রদে শেষনাগ নয় নেহাৎ জলমুর্গী। মনে মনে চিৎকার করিতে করিতে রাত ২টা—২-৩০টায় কোন্ সময় যেন ঘুমাইয়া পড়ি। চারিদিকের অস্বাভাবিক কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। হাত ঘড়িতে দেখিলাম রাত পৌনে চারটা। বিছানা ছাড়িয়া ঘরের বাহিরে দোতলার সিঁড়িতে আসিলাম। গুরুদোয়ারার সিঁড়ি হইতে দেখিলাম এরইমধ্যে বাবা অমরনাথের ঝাণ্ডা ও ছড়ি বেদী হইতে তুলিয়া বড় রাস্তায় আনা হইয়াছে। আবার ঘড়ি দেখিলাম। ৩-৯৫ মিনিট। ৪টায় ছড়ি মিছিল শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগেই ছড়ি যাত্রা শুরু হইয়া গিয়াছে। বহু সাধু-সন্ন্যাসী উল্লাসে লাফাইতেছেন। চিৎকার করিতেছেন। জয় শ্রীস্বামী অমরনাথজী। জয় ছড়ি-মুবারিক যাত্রা। জয় শঙ্কর।

ইচ্ছা ছিল ছড়ি-মিছিলের শুরু দেখিব। এখন দূর হইতে দেখিতেছি নির্ধারিত সময়ের আগেই ছড়ি-মিছিল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কি আর করা? কতক্ষণ সিঁড়ি হইতে ছড়ি-মিছিল যতখানি দেখা যায় দেখিয়া আবার নিজের বিছানায় আসিয়া শুইলাম। কম করিয়া আরও দুই ঘণ্টা রাত আছে।

২৩শে আগষ্ট শনিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ একেবারে শ্রীনগরের জন্য প্রস্তুত হইয়া পাহালগ্রামে বাস আড্ডায় আসিলাম। ছড়ি মিছিল চন্দনবাড়ী রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। এখন পাহালগ্রামের অবস্থা ভাঙ্গা হাটের মত। সবাই ফিরিতে চায়। যে সমস্ত বাস এখানে হইতে ছাড়িতেছে তার প্রত্যেকটিতে পাঁচশ যাত্রী উঠিতে চায়। এত যাত্রী বহন করা কোন বাসের পক্ষেই সম্ভব নয়। আবার এপথে পুলিশের কড়াকড়িও যথেষ্ঠ। বাসে নির্দিষ্ট আসন হইতে বেশী যাত্রী উঠিতেছে না এনন নয়, তবে অতিরিক্ত যাত্রীর একটা ভদ্রগোছের সীমা আছে। বাস ছাড়ার নির্দিষ্ট সময়ে, নির্ধারিত স্থানে বাস আসিলে দেখা যায় অনেক আসনের টিকিটই অগ্রীম বিক্রয় হইয়া রহিয়াছে। তাই কয়েক হাজার যাত্রী একবার এ বাসে আবার সে বাসে আসনের জন্য ঢু-মারিয়া নিরাশ হইতেছেন।

আমার আন্দাজের দৌড় এত লম্বা না হইলেও, বাসে আসনের জন্য কয়েক সহস্র যাত্রী এবাস সে বাস করিবে, ধরনা·করিতে না পারিলেও আজ সকালে

পাহালগ্রাম হইতে ফিরা যাত্রী যে অনেক বেশী হইবে, বাস-টিকিটের কাড়াকাড়ি পড়িবে তাহা আগেই আন্দাজ করিতে পারিয়াছিলাম। সে অনুযায়ী কাল এ ব্যস্ততা'র মধ্যে, এত সাধুসঙ্গের মধ্যেও সময় করিয়া এক ফাঁকে পাহাল গ্রামের অপর প্রান্তে আসিয়া বাসের অগ্রিম টিকিট কাটিয়া রাখিয়াছি। আমার বাস সাড়ে নয়টায় ছাড়িবে। হাতে প্রচুর সময়। ফুটপাতে নিজের মালের উপর বসিয়া গরম চা-এ মৃদু মৃদু চুমুক দিতে দিতে ভবসংসারের খেলা দেখিতে বেশ লাগিতেছিল।

উপরে মালপত্র বাঁধিয়া কুলী হয়ত গাড়ী হইতে নামিয়া যার মাল তাহার কাছে পয়সা চাহিল। তিনি জানাইলেন, "আমি ত কুলীকে পয়সা দিয়া দিয়াছি। তুমি ?

: বাবুজী! আপনি দেখিলেন না আমি আপনার মাল উপরে বাঁধিয়া এইমাত্র নামিলাম।

: তবে পয়সা দিলাম কাকে ?

আরেক যাত্রী জানিতে চাহিলেন, "আমার কুলী ? কুলী কোথায় গেল ? কোন সময় গাড়ীতে মালপত্র বাঁধা হইয়া গিয়াছে। কুলীকে পয়সা দিব বলিয়া তখন হইতে দাঁড়াইয়া আছি। আপনি আমার কুলীকে পয়সা দিন নাই ত ? ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি আপনার কুলীকে পয়সা দিয়া দিতেছি। এক গাড়ীতেই ত আমরা যাইতেছি। কি বলেন ?"

দেখা গেল, যাত্রী ভুল করিতেছে কুলী। কুলী ভুল করিতেছে যাত্রী, বাস-আড্ডায় এমন পরিস্থিতি।

যে সমস্ত যাত্রী অগ্রিম টিকিটের জন্য বাসে বসার আসন পাইয়াছেন, তাহাদের একজন যাত্রী উঠিয়া উপরে রড্ ধরিয়া দাঁড়াইলেও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেছেন। বাসে দাঁড়ানো যাত্রী থাকিলে তাহাদের অসুবিধা হয়। যে সমস্ত যাত্রী এর মধ্যে মোটামুটি ভালভাবে দাঁড়াইয়াছেন, তাহারা অন্যের উপস্থিতিতে অসন্তোষ্ট হইতেছেন। রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিতেছেন, "গায়ের উপর পড়িবেন না কি ?" উপদেশের আছিলায় বলিতেছেন, "পরের বাসে আসিতে পারেন না ?"

যাহারা কোনরূপে একটু স্থান পাইয়াছেন তাহারা অসন্তোষ্ট। ভাড়াত সমানই দিতেছি, একটু দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নাই।

মনে হইতে লাগিল যেন বহুদিন পর মানুষের অসন্তোষ্টি প্রত্যক্ষ করিলাম। এত কোলাহল, এত হৈ-হল্লার মধ্যেও আমার মন অন্তর্মুখী হইল। চিন্তায় আসিল শুধু বাসে বসা-দাঁড়ানোর ব্যাপার নয়, বর্তমান জগতে সব ব্যাপারেই

আমরা অসন্তোষ্ট। অসন্তোষ্ট কাহারও বেশী, কাহারও কম। কি জগতে আছি। কপর্দকহীন ব্যক্তি ও অসন্তোষ্ট, আবার দেখি কোটিপতিও অসন্তোষ্ট। বেকার যুবক বেকারত্বের জ্বালায় অসন্তোষ্ট, চাকুরীজীবি স্বল্প বেতনের জন্য অসন্তোষ্ট। দায়িত্বশীল কর্তারা আরও ক্ষমতা পাওয়ার লালসায় অসন্তোষ্ট। বাহির হইতে দেখিয়া যখন আমরা মনে মনে চিন্তা করি এ ব্যক্তির সন্তোষ্ট থাকা উচিৎ। ভগবান তাহার প্রত্যেকটি চাহিদা পর্যাপ্ত পূর্ণ করিয়াছেন। তাহার সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশিলে জানা যায় তাহার দুঃখ অন্য কাহারও চেয়ে কম নয়। অতএব সন্তোষ্ট হওয়ার প্রশ্ন আসেনা।

মনে মনে তুষার লিঙ্গের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। হে শঙ্কর! তোমার নামে ৮ তারিখ বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি। পথে ঠিকমত স্নান, থাকা, খাওয়া হয় নাই। ১৬ তারিখ হইতে আজ পর্যন্ত শরীরের উপর কত অত্যাচার করিয়াছি। শরীরের উপর দিয়া যে কি পরিমাণ ঝড়-ঝাপ্টা গিয়াছে, কত কষ্ট সহিতে হইয়াছে তুমিই জান। তোমার পায়ে হাঁটা পথে, অন্য সব বাদ দিলেও না ছিল রেডিও, না সংবাদপত্র। তবু শান্তি ছিল, সে শান্তি আসিয়াছে নিজেরই অন্তর হইতে। শারিরীক দুঃখ ছিল, কিন্তু তার জন্য কোন মানসিক অশান্তি ছিল না। আমি সন্তোষ্ট, আমি তৃপ্ত। আমি জানি আমার এ আনন্দে মাতাল অবস্থা আরও কিছুদিন থাকিবে।

হে শঙ্কর, তুমি সতত সাগর পরিমাণ সন্তোষ্টি দু-হাত উজাড় করিয়া নির্বিকারভাবে বিতরণ করিয়া দিতেছ। কিন্তু আমি কতটুকু আধার? একটি সূচ-এর অগ্রভাগে যতটুকু জল ধরে তার বেশী ত নয়? এতটুকু, এই অনু-পরিমাণ আধার হইয়া আমার এই অবস্থা। জগতের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া সন্তোষ্ট আছি, তৃপ্ত আছি, আর যে সমস্ত মহাত্মা সত্যিকারের আধার তাঁহারা না জানি তোমার দর্শনে কত আনন্দ পান, কত সন্তোষ্ট হন, কত তৃপ্ত হন। মহাত্মাগণের আনন্দ, সন্তোষ্টি, তৃপ্তি আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণ ব্যক্তিরা ধারণায়ও আনিতে পারিনা।

আমি গাড়ীতে আমার নির্দিষ্ট আসনে বসিলাম। আওয়াজে বুঝিলাম গাড়ীর মেসিন চালু হইয়াছে। এখনই চলিতে শুরু করিবে। আবার তুষার লিঙ্গের উদ্দেশ্যে দুই হাত একত্রিত করিয়া প্রণাম করিতে করিতে সজোরে বলিলাম "জয় শঙ্কর"।

—সমাপ্ত—